ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা
(Islamic Culture & Western Culture : A Comparative Study)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

আবরার আহমদ

এম. ফিল. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন নং- ৪৮/ ২০০৯ - ২০১০

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার নামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক **ড. মুহাম্মদ ইউসুফ,** অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যলয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

(আবরার আহমদ)
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আবরার আহমদ, এম. ফিল. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত "ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছে। আমি এর পান্ডুলিপিগুলো আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা লাভের জন্য অথবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং, গবেষককে এম. ফিল. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে অবশেষে **"ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা"** শীর্ষক এম.ফিল. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। যথাসময়ে বিধি মুতাবিক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের শানে শুকরিয়া আদায় করছি এবং মানবতার মহান শিক্ষক নবী কারীম (স.) এর পাক শানে দরূদ ও সালাম পেশ করছি। যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ ইউসুফ, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতি। কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তন উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনিদের্শনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। সে সাথে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমার বিভাগের অন্যসব শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ তাঁরা বিভিন্ন সময় আমার গবেষণায় পরামর্শ দিয়েছেন এবং আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এ সময়ে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় বাবা মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা আবদুর রহমান ফারুকী যার দোয়া আজ আমার জীবন চলার একমাত্র পাথেয় এবং যার কর্মচাঞ্চল্য আমার প্রেরণা। সাথে সাথে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয়া মা জনাবা আলিমা বেগমকে যিনি আজীবন আমাদের সুখের জন্য নিজের সুখকে কুরবানী করেছেন। আমাদের মানুষ করার জন্য যিনি ছিলেন অকৃপণ।

সন্তানের সুখ-সম্মৃদ্ধি কামনায় তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তাদের অপরিসীম আত্মত্যাগ এবং একান্ত দোয়ার কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার বাবার পবিত্র আত্মার শান্তি ও মুক্তি এবং মায়ের সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করছি।

আমি গভীর ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জনাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর আলহাজ্ব মাওলানা নূর মোহাম্মদ এবং শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ী জনাবা নূরজাহান বেগমকে যাঁরা নিজেরা অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও আমার এ গবেষণাকর্মের সময় আমার ছোট্ট সোনামনি আফিফার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং বিভিন্ন সময় আমাকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে সক্রিয় রেখেছেন।

বিশেষভাবে আমি কৃতজ্ঞ আমার সহধর্মিনী জনাবা মোবাস্বেরা আখতার মুন্নির কাছে তার অপরিসীম ত্যাগ ও প্রেরণা আমাকে এ গবেষণা কাজে সাহস যুগিয়েছেন। আমি বার বার হতাশ হলেও সে আমার মনে আশার আলো জ্বেলেছে।

এছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের এবং আমার শশুড়ের সকল সদস্য-সদস্যাকে যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষভাবে আমার স্নেহের ভাগিনা ফয়সাল আহমেদকে যে কম্পোজ করা ও প্রুফ দেখা সহ নানান কাজে আমাকে সাহায্য করেছে। আমার বন্ধু এ.কে. এম. এমদাদুল হক মামুনকে কৃতজ্ঞতা জানাই তিনি আমাকে অনেক তথ্য ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আমার একান্ত স্নেহের ছোট ভাই ইফতেখার হাছান, এহতেশামুল হক তারেক ও শামীমকে ধন্যবাদ ও শোকর জানাই। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আমার এ কাজকে সহজ করে দিয়েছে।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশী-বিদেশী লিখকদের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব লিখকের নাম ও তাঁদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবুও এখানে আরেকবার লিখকদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

স.	=	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আ.	=	‘আলাইহিস সালাম
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু
র.	=	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
ইং	=	ইংরেজি
বাং	=	বাংলা
হি.	=	হিজরী
খ্রী	=	খৃষ্টাব্দ
ড.	=	ডক্টর
খ.	=	খন্ড
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
অনু.	=	অনুবাদ
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
p.	=	page
Ibid	=	(Ibidem) in the same place; from the same source.
Op.cit	=	Operac-citrae
Ed.	=	Edited/ Editor

Dhaka University Institutional Repository

আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

আরবী	=	বাংলা
ا	=	অ/আ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	স
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ/য
ط	=	ত
ظ	=	য
ع	=	‘
غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	ক্ব/ক্
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ও/ব
ه	=	হ
ء	=	’
ى	=	য়

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা
(Islamic Culture & Western Culture : A Comparative Study)

ভূমিকা.....০৮

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী জীবন দর্শন ও সংস্কৃতি..... ১১

১ম পরিচ্ছেদ : ইসলামী জীবন দর্শনের পরিচয়.....১১

২য় পরিচ্ছেদ : সংস্কৃতি শব্দটির পরিচয় ও তাৎপর্য..... ১৪

৩য় পরিচ্ছেদ : সংস্কৃতির মূল কথা.....২১

৪র্থ পরিচ্ছেদ : মানব জবিনে সংস্কৃতির ভূমিকা.....২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী সংস্কৃতি ও তার বৈশিষ্ট্য.....৩১

১ম পরিচ্ছেদ : ইসলামী সংস্কৃতির ধারণা ও মূলকথা.....৩১

২য় পরিচ্ছেদ : ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়.....৪২

৩য় পরিচ্ছেদ : ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য.....৪৫

৪র্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামী সংস্কৃতির মৌল উপাদান.....৬২

৫ম পরিচ্ছেদ : ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক..... ৬৩

তৃতীয় অধ্যায়

চিত্তবিনোদন ও ইসলামী সংস্কৃতি.....৭২

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য.....৯৯

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্বজনীন সংস্কৃতি.....১১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন.....১২১

সপ্তম অধ্যায়

সংস্কৃতি ও সভ্যতা বা তামাদ্দুন.....১৩৭

১ম পরিচ্ছেদ : সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য.....১৩৯

২য় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ও ধ্যান.....১৪৬

৪র্থ পরিচ্ছেদ : গণসংস্কৃতি.....১৪৮

৫ম পরিচ্ছেদ : মানবতা বিরোধী প্রগতি.....১৫০

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সংস্কৃতি ও ইতিহাস.....১৫৪

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা.....১৫৮

১ম পরিচ্ছেদ : পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারণা.....১৫৮

২য় পরিচ্ছেদ : ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো.....১৬০

৩য় পরিচ্ছেদ : ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনা.....১৬৩

৪র্থ পরিচ্ছেদ : সংস্কৃতির মূল্যায়ন.....১৯২

৫ম পরিচ্ছেদ : বিকাশমান দুনিয়ার সংস্কৃতি.....১৯৫

উপসংহার.....১৯৮

গ্রন্থপঞ্জি.....২০২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলাম পৃথিবীর এক মহোত্তম আদর্শের উদ্ধোধক, প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও পরিপূর্ণ জীবন বিধানের নাম। বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভূখন্ডের কৃত্রিম ভেদ-রেখার উর্ধ্বে এটি এক বিশ্বজনীন চেতনা। মহান আল্লাহ্‌র অকৃত্রিম বন্দেগী ও অখন্ড মানবিক সমতা হচ্ছে এ আদর্শের ভিত্তিভূমি। আর এটাই হচ্ছে মুসলিম জাতিসত্তার মূল উপাদান। মহান আল্লাহ আকাশ-যমীন তথা এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার একচ্ছত্র অধিপতি ও সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক। তিনি তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ সৃষ্টি মানুষের জীবনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার একমাত্র পাথেয় হিসেবে ইসলাম নামক এ বিধানকে মনোনীত করেছেন। তাঁর ভাষায় :

ورضيت لكم الاسلام دينا -

"দ্বীন হিসেবে ইসলামকে আমি তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি।"(আল কুর'আন, ০৫: ০৩) এবং পার্থিব জীবনে মানবজাতির প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্যাদি পরিচালনা করতে গিয়ে নিয়ম-নীতি হিসেবে একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন :

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه-

"যে কেউ জীবন পদ্ধতি হিসেবে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু অনুসন্ধান করলে কখনও তা গৃহীত হবে না।"(আল-কুর'আন, ০৩: ৮৫) বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে ইসলাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলাম শব্দটির মধ্য দিয়েই এ ধর্মের প্রাণশক্তি স্পন্দিত, এর মহিমা বিচ্ছুরিত। মুসলিম জাতির জীবনধারা অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও সংস্কৃতিসহ প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগেই এর সাফল্যজনক, কল্যাণময় ও সার্বজনীন প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়। তাইতো বলা হয়, "Islam is the complete code of life." মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য ও সর্বাধুনিক জীবন ব্যবস্থাই হচ্ছে ইসলাম। স্বয়ং আল্লাহ্‌র ভাষায় :

ان الدين عندالله الاسلام-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র জীবন পদ্ধতি।"(আল কুর'আন, ০৩: ১৯)

হযরত আদম (আ.) ইসলাম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। তারপর আবির্ভূত হয়েছেন অসংখ্য নবী-রাসূল। তাঁরা সবাই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে স্বীয় উম্মতগণকে আহবান জানিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) প্রমূখ নবীগণ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এ জীবন ব্যবস্থায় পূর্ণতা এনেছেন। তাঁর সময়ে ইসলাম সর্বকালীন, সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে সম্পর্কে ইসলাম বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিধান দেয়নি। ইসলামে আছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও সুনীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের আছে সুনির্ধারিত পদ্ধতি। ইসলামের এ সকল রীতি-নীতি, বিধি-বিধান ও পদ্ধতি জানার জন্য ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকল্প নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি । ইসলামের পূর্ণতার মতই এ সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাও পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র।

আমরা জানি শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি জাতির স্বরুপ অন্বেষায় অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের জাতিসমূহের দরবারে একটি বিশেষ জাতির অবস্থান কোথায়, তা নিশ্চিত করা যায় তার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আলোকসম্পাত করে। কারণ, শিক্ষা একটি জাতির অবয়ব নির্মাণ করে, সাহিত্যে সে অবয়বের প্রতিফলন ঘটে, আর সংস্কৃতি তাকে পূর্ণতা দান করে। এভাবেই একটি জাতির পরিচয় বিধৃত হয় তার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। তাই যে কোন জাতির বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার সাথে এ তিনটি বিষয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বলা বাহুল্য যে, মুসলিম জাতির বেলায়ও কথাটি হুবহু প্রযোজ্য।

দুনিয়ায় সাধারণত বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা ভূখন্ডকে কেন্দ্র করে এক একটি জাতির অবয়ব নির্মিত হয়। তাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও তাই এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এগুলোকে কেন্দ্র করেই তাদের জীবন চক্র আবর্তিত হয়। ফলে, তাদের স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা উপলব্ধি করতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবয়ব ও অভিব্যক্তি রেখেই তাদের জাতিসত্তার প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একটু ভিন্নতর। কারণ, একটি আদর্শবাদী মুসলিম জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে ইসলামী চিন্তা-দর্শনের ভিত্তিতে। তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় ইসলামী ভাবাদর্শের সার-নির্যাস আর তার সংস্কৃতিতে বাঙময় হয়ে উঠে ইসলামের সূক্ষ্ম নান্দিকতা। এ কারণে মুসলিম জাতিসত্তা দুনিয়ার অন্যান্য জাতিসত্তা থেকে গুণগতভাবে পৃথক, স্বতন্ত্র ভাবাদর্শে সমুজ্জল।

ইসলামের সোনালী যুগে মুসলিম জাতিসত্তার এটাই ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই দুনিয়ার জাতিসমূহের দরবারে মুসলিম জাতির অবস্থান ছিল আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর। জ্ঞানচর্চা, জীবন-সাধনা, রাষ্ট্র-শাসন সর্বত্রই মুসলিমদের হাতে ছিল আলাদীনের যাদুর চেরাগ। তাদের নির্মিত নতুন সমাজ ও সভ্যতার স্পর্শে মাত্র চার দশকের মধ্যেই এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিরাট অঞ্চলে মানবতার নব-জাগৃতি ঘটেছিল এবং যুগ-যুগান্ত কালের অজ্ঞতার যবনিকা অপসৃত হয়েছিল। কোন বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা অঞ্চলের কারণে নয় শুধুমাত্র ইসলামের যাদু স্পর্শেই এই অভাবনীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। এমনকি প্রথম তিন দশকের সংক্ষিপ্ত সময়-পরিসরে তৎকালীন দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশাহ এবং রোম ও পারস্যের ন্যায় দু'দুটি পরাশক্তি তাঁদের পদতলে এসে লুটে পড়েছিল। আজ সেই মুসলিম জাতি শুধু নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তিই হারায়নি, অমুসলিম জাতিগুলোর কাছে সে করুণার পাত্রেও পরিণত হয়েছে।

সময়ের বিবর্তনে তার আকার-আকৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, কিন্তু তার আদর্শিক বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক গুণাবলী বহুলাংশে লোপ পেয়েছে। কারণ, ইসলামের সুমহান আদর্শের পরিবর্তে মুসলিমগণ আজ বর্ণ, ভাষা ও অঞ্চলের ভিত্তিতে খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়েছে যা তাদের জাতি সওাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। তারা ইসলামী শিক্ষা-দর্শন ও সংস্কৃতি পরিহার করে পাশ্চাত্যের জড়বাদী শিক্ষা দর্শনকে গ্রহণ করেছে; তাদের সাহিত্যে মূল্যবোধের পরিবর্তে ভোগবাদী চিন্তা-দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে নির্মল সৌন্দর্য-বোধের পরিবর্তে উৎকট নগ্নতা ও অশ্লীলতা

ছায়াপাত করেছে। এর ফলে আজকের মুসলিম জনগোষ্ঠি নৈতিক ও আদর্শিক-মূল্যবোধ হারিয়ে কার্যত এক বিশৃংখল জনারণ্যে পরিণত হয়েছে।

এই চরম বিপর্যয় থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করার জন্যে আজকে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তার প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষার; তার হারানো বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তাকে ফিরিয়ে এনে তাকে নতুন ভাবে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করার। বলা বাহুল্য যে, এ সুমহান দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই এ গবেষণার মাধ্যমে সারা বিশ্বের সকল মানবের বিশেষ করে বাংলাদেশী সকল নাগরিকের সম্মূখে ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রত্যেকটি দিক বিভাগের নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ উপস্থাপন করে কল্যাণময় সংস্কৃতিতে বিভূষীত করার চিন্তা করা হয়েছে। উভয় সংস্কৃতির কল্যাণ ও অকল্যাণকর দিক সমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে সুষ্ঠু দিক নির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

সর্বোপরি বিজাতীয় ভাবধারার প্রভাবে পংকিলময় মুসলিম সংস্কৃতিকে বিজাতীয় উপাদান ও ভাবধারা থেকে মুক্ত করে ইসলামী আদর্শের মানে উত্তীর্ণ এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বের জনসমুদ্রে ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হবে। যেহেতু বর্তমান বিশ্ব এমনি এক ভারসাম্যপূর্ণ মানবতাবাদী ও সর্বমানুষের জন্য কল্যাণকর এক সংস্কৃতির প্রতিক্ষায় উদগ্রীব।

মানুষের জীবন যেমন ব্যাপক তাদের জীবন বিধানের পরিসরও বিরাট। তাই সমগ্র জীবন-নিয়ে ইসলামী ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিধি। তবে মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা হচ্ছে- "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছি।"(আল কুর'আন, ৭৭: ২০) সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরী মানুষের সম্ভাবনাও অপরিসীম। কাজেই তার সংস্কৃতিও অপরিসীম। জগতে যা কিছু সুন্দর, চিরন্তন, কল্যাণকর এবং তাওহীদে বিশ্বাস সঞ্জিবীত ভাবধারায় উন্নীত, তা সবই ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে গণ্য। ইসলামী সংস্কৃতি কোন জাতীয় বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঠিক অর্থে এটি মানবীয় সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী এমন এক উদার জাতীয়তা গঠন করে যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হবার মতো অনন্য যোগ্যতা।

এ জন্য বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের যে কোন ভাষার এবং যে কোন বর্ণের যে কোন ধর্মের লোক হোক না কেন সে ইসলামী সংস্কৃতির আওতায় আসতে পারে। এ সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সঙ্গে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–এর প্রচন্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী বন্ধন। এ সংস্কৃতি নিজের অনুগামীদেরকে ব্যাক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইন-কানূন ও নিয়ম-নীতির অনুসারী করে তোলে।

কাজেই অন্য সংস্কৃতির গ্রহণ কখনও তা অনুমোদন করে না। তাই বিশ্বজুড়ে ইসলামের সার্বজনীনতা, প্রসারতা ও প্রয়োজনীয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে বিধায়, উল্লেখিত বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা আন্তরিকভাবে অনুভব করে ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে একটি তুলনামূলক পার্থক্য বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী জীবন দর্শন ও সংস্কৃতি

১ম পরিচ্ছেদ

ইসলামী জীবন দর্শনের পরিচয়

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলণামূলক পার্থক্য জানার পূর্বে ইসলামী জীবনদর্শন সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন বিধায়, এ সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো:

বস্তুত সংস্কৃতি ও জীবন এক অখন্ড ও অবিচ্ছেদ্য সত্য। এর একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পুর্ণ ভিন্ন রূপে চিন্তা ও বিবেচনা করার কোন উপায় নেই। একটি জাতির সংস্কৃতি সংক্রান্ত মতাদর্শ ও মূলনীতি তাই, যা তার জাতীয় জীবন-দর্শন ও জাতীয় জীবন আদর্শ। জীবনদর্শন এবং সংস্কৃতিদর্শন এ দুটিই মূলের দিক থেকে এক ও অভিন্ন। সংস্কৃতিবিদ ও সংস্কৃতি পারদর্শিদের সংস্কৃতি সম্পর্কিত মত-পার্থক্য মূলত জীবন দর্শনেরই পার্থক্য। জীবন দর্শন বিভিন্ন হওয়ার কারণেই সংস্কৃতি দর্শনও বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী হতে বাধ্য। প্রত্যেক জাতিই তাদের সন্তানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যবস্থা করে সে পন্থা ও পদ্ধতিতে, যা তার জীবনাদর্শ ও জীবন লক্ষ্য বাস্তবায়নের অনুকূল এবং পরিপূরক।

যে পথে চলে শিক্ষার্থীর জীবন তাদের জাতীয় লক্ষ্যের দৃষ্টিতে সফল ও চরিতার্থ হতে পারে, সে পথটিই হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাংখিত পথ ও পন্থা। কাজেই যে জাতির জীবন লক্ষ্য নিছক বৈষয়িক বা বস্তুগত এই নশ্বর জীবনের জন্যে সূখ-স্বাচ্ছন্দ ও উন্নতি বিধানই যাদের উদ্দেশ্য, তাদের সংস্কৃতি ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্য বিষয় এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষাদাতা, শিক্ষালয় ও সংস্কৃতির পরিবেশ ঠিক তাই হবে,যা তাদের এ দৃষ্টিকোনকে চরিতার্থ ও পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে যে জাতির দৃষ্টিতে এই জীবনটা লক্ষ্যপথের একটা মান্যিল ও স্তর মাত্র এবং অবিনশ্বর ও চিরন্তন জীবনের সাফল্য ও স্বার্থকতাই যাদের চরম লক্ষ্য তাদের সমগ্র সংস্কৃতি পদ্ধতি এমন ভংগিতে তৈরি হতে হবে, যার সামান্য পর্যবেক্ষণেও পরকালীন লক্ষ্যাদর্শ ও উদ্দেশ্য পরায়ণতা অনুভূত হতে পারবে। অনুরূপভাবে যে জাতির লক্ষ্য শুধুমাত্র দৈহিক ও মানসিক শক্তিনিচয়ের উন্নতি ও পূর্ণত্ব বিধান, তাদের সংস্কৃতি ব্যবস্থায় অনুরূপ দৃষ্টিকোণেরই পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে।

জাতীয়তাবাদী কিংবা দেশমাতৃকাবাদী, বস্তুবাদী কিংবা বৈরাগ্যবাদী–যাই হোক না কেন, প্রত্যেক জাতিই নিজস্ব দৃষ্টিকোন ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ীই সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং এসব ব্যবস্থায়ই তাদের জীবন দর্শনের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে অনিবার্য ভাবে। তাদের জীবন দর্শন কি ? তা ভালো কি মন্দ, ত্রুটিপূর্ণ কি নিখুঁত যা-ই হোক না কেন-এসব ব্যবস্থাপনাই হয় তার নির্মল দর্পণ বিশেষ। এ দর্পণে তার সবকিছু প্রতিবিম্বিত হয় এবং তা দেখে তার অন্তঃস্থল পর্যন্ত এক দৃষ্টিতে দেখে নেয়া ও সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা খুবই সহজ। মোট কথা মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব ভূমিকা এবং তার ইচ্ছামূলক কার্যক্রমের পথ ও পন্থা থেকেই সুনির্দিষ্ট হয় তার জীবন লক্ষ্য ও জীবনাদর্শ।

বস্তুত সংস্কৃতি জীবনের জন্যে প্রস্তুতি বিশেষ জীবনের প্রস্তুতিরই অপর নাম হচ্ছে সংস্কৃতি। এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিবিদই সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু এ জীবনটার উদ্দেশ্য কি? কোন কাজে ও তৎপরতায় নিয়োজিত এই জীবনটা? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজলে দেখা যাবে যে, জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মতৎপরতা নিয়েই দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে আকাশ পাতালের মত বৈষম্য। এ মত-বৈষম্য সত্ত্বেও জীবন উদ্দেশ্যের অবিচল প্রত্যয় অনুযায়ীই সাধিত হয় মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও হৃদয়াবেগের প্রশিক্ষণ এবং চিন্তা-বিশ্বাস ও মতামতের লালন ও বিকাশ। এই হৃদয়াবেগ ও চিন্তা-চেতনা থেকেই বাস্তব কর্মগত ভূমিকা স্বতঃস্ফুর্তভাবে উৎসারিত হয়।

এই মানস-প্রকৃতি ও মানস-পরিবেশই মূলত মানুষের সমগ্র চিন্তা চেতনা ও হৃদয়াবেগের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু এবং তার সমস্ত কর্মতৎপরতা ও গতিবিধির উৎসমূখ, হাদীস শরীফে এ মর্মস্থলের নাম দেয়া হয়েছে "ক্বলব" বা হৃদয়-মন। হাদীস অনুযায়ী মানুষের সকল কর্মতৎপরতার যথার্থতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এরই সুস্থতা ও রুগ্নতার উপর নির্ভরশীল। আল-হাদীসের ভাষায় :

ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هى القلب-

"জেনে রেখ মানবদেহে এমন একটা মাংসপিন্ড রয়েছে, যা সুস্থ হলে সমস্ত দেহ সুস্থ থাকে। আর তা রোগাক্রান্ত হলে সমস্ত দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর তা হলো ক্বলব বা হৃদয়।"[১]

মানুষের বাস্তব কর্মতৎপরতায় তার মানসিক অবস্থা, অন্তর্গত ভাবধারা ও মৌল বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের প্রভাব কতটা এবং বাস্তব কর্মের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব কতখানি, সংস্কৃতিবান ও মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ তা বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বিষয়টির উপর যথেষ্ঠ গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা তা মানবীয় শক্তি সামর্থের পথিকৃত শুধু নয়; তা মানুষের শাসক ও নিয়ন্ত্রকও। মানুষ তারই নির্দেশ বাস্তবায়নে ও পরিপূরণে স্বীয় ধন-সম্পদ ও সর্বাধিক প্রিয় জিনিস নিজের জীবনটাও অকাতরে বিলিয়ে দিতে কুন্ঠিত হয় না।

দুনিয়ার কঠোরতম সমাজ ব্যবস্থায়ও এসব চুম্বক শক্তি অধিক সক্রিয় হয়ে থাকে। কমিউনিজম কিংবা সমাজতন্ত্র সকল ক্ষেত্রে হৃদয় মনের গভীরতর গহনে লুকায়িত এসব ভাবধারার হাতেই থাকে সমস্ত কর্তৃত্ব নিবদ্ধ। এগুলোই জাতির প্রকৃত নেতা এবং তাদের প্রকৃত চালিকা শক্তি। জাতীয় নেতৃত্ব সুপথগামী হলে গোটা জাতিই নির্ভূল পথযাত্রী হবে। আর তা যদি ভ্রান্ত পথের পথিক হয়, তাহলে জাতির প্রতিটি মানুষেই ভুল পন্থি হবে।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিতে ও গোত্রে বিরাজমান পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মূলত জাতীয় ও সামষ্টিক জীবনাদর্শের বিভিন্নতারই সংঘাত। এক ব্যক্তি বা একটি দলের দৃঢ়তা ও স্থিতি এ চুম্বক শক্তির উপরই একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। আর এ শক্তির দূর্বলতা হচ্ছে এক ব্যাক্তি, একটি দল ও একটি জাতির ধ্বংসের উৎসমুখ। দীর্ঘকালব্যাপী আদর্শহীন সংস্কৃতি-সভ্যতা ও

---

১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাাইল আল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, হাদীস নং- ৫৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশের ফলেই মুসলিম জাতির ঈমান ও প্রত্যয়ে দূর্বলতার এই নৈরাশ্যজনক বাস্তবতা দৃশ্যমান। এই প্রেক্ষিতে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য সভ্যতাগর্বী দেশের উন্নততর সংস্কৃতি ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে একটি সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠে। এসব ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান যে সব মৌলিক ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তা হলো এই বাস্তব ও নশ্বর, ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়ার উন্নতি ও প্রাধান্য লাভ। এ ছাড়া তাদের সামনে আর কোন মহৎ লক্ষ্য নেই। এটাই তাদের জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং তাদের সামগ্রিক ভাবনা-চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী জীবন দর্শনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ, নশ্বর ও বস্তু জীবনের চাকচিক্য জাকজমক আনন্দ ফুর্তি স্বাদ আস্বাদন পরিত্যাগ করে আকাশ যমিনের একমাত্র ও একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করণ।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতি শব্দটির পরিচয় ও তাৎপর্য

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী প্রায় সর্বত্রই সংস্কৃতির কথা বললেই সাধারণভাবে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অংকন বা চিত্রশিল্প, কাব্য ও সাহিত্যচর্চা বা নৃত্যকলা, সংগীত, নাট্যাভিনয় এবং অন্যান্য ললিত কলার কথা আপনা থেকেই মনের পটে ভেসে উঠে। 'সংস্কৃতির' কথা বললেই লোকেরা এসবই মনে করে বসে। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে সত্যিই কি বুঝায় কিংবা অধুনা যেসব জিনিসকে সংস্কৃতি বলে মনে করা হচ্ছে, সেগুলো সত্যই সংস্কৃতি নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য কিনা এবং এগুলো ছাড়া আর কোন অর্থ আছে কি না, তা সাধারণত কারোর মনেই জাগে না। এর ফলে আমরা দেখতে পাই, এগুলোকেই সাংস্কৃতিক কাজ বলে ধরে নেয়া হচ্ছে এবং এ পর্যায়ের এক-একটা কাজকে 'সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠান বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে বরং বর্তমানে তো কেবল মাত্র নৃত্য-সংগীত ও নাট্যাভিনয়ই সংস্কৃতি চর্চা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলে পরিচিতি লাভ করছে।

তবে এসবের জন্যে এ শব্দটির ব্যবহার যুক্তি সংগত কিনা, তা এ কালের লোকেরা বর্তমানে কেউ একবার ভেবে দেখাবারও অবকাশ পাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, সংস্কৃতির নামে প্রচলিত এসব জিনিসকে ইসলামী বলে চালিয়ে দিতেও অনেকেই দ্বিধাবোধ করছে না। কিন্তু আমার মনে হয়, সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃতির নামে সমাজে যা কিছু চলছে, অবলিলাক্রমে তাকে সংস্কৃতি বা Culture[১] বলে মেনে নেওয়া অন্তত চিন্তাশীল ও বিদগ্ধজনের পক্ষে কিছুতেই শোভন হতে পারে না। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আবশ্যক। নিম্নে তা বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

'সংস্কৃতি' শব্দের অর্থ, বিশোধন, সংশোধন, শুদ্ধিকরণ, পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করণ, পরিস্কার বা নির্মল করণ, উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতি বিধান। অনুশীলনের মাধ্যমে বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতি-নীতি ও মার্জিত আচার আচরণ ইত্যাদির উৎকর্ষতাই হচ্ছে কৃষ্টি বা Culture। জার্মান শব্দ 'Kullura' থেকে এসেছে ইংরেজী Culture শব্দটি। যার অর্থ হচ্ছে কর্ষন করা। যেমন অমসৃন জমিকে কর্ষন বা আবর্জনা মুক্ত করার মাধ্যমে যখন মসৃণ ও ফসল উৎপাদনের উপযোগী করে তোলা হয়, তখন বলা হয় Cultured land তেমনি সদাচরণের কর্ষন ও অনুশীলনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বা জাতি যখন পরিশীলিত, মার্জিত, উন্নত ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হয়ে সংস্কৃতিবান হয় তখন তাকে Cultured man বা Cultured nation বলা হয়।[২]

'সংস্কৃতি' শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'সাক্বাফাহ' যার অর্থ–সফল হওয়া, শিক্ষন, প্রশিক্ষণ পাওয়া মার্জিত আকর্ষনীয় চরিত্রের অধিকারী সৌন্দর্যমন্ডিত মানুষকে বলা হয় মুসাক্কাফ। এছাড়াও আরবী 'তাহযীব' এবং উর্দু 'তামাদ্দুন' শব্দ দুটোও একত্রে সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব, সভ্য-ভদ্র ও মার্জিত নন্দিত জীবনকে তাহযীব তামাদ্দুন বা সংস্কৃতি বলা হয়। মোটকথা

---

১. কথাটিকে উর্দূতে 'তাহযীব' এবং আরবীতে 'সাক্বাফাত' বলা হয়। আমাদের এতদাঞ্চলে 'তামাদ্দুন' শব্দটিকেও সংস্কৃতির সমার্থক মনে করা হয়। কিন্তু শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সভ্যতা, সংস্কৃতি নয়। উদ্ধৃত, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রী.), পৃ. ২৫০

২. ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা* (ঢাকা: সোনালী সোপান প্রকাশন, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশীলিত, মার্জিত, সজ্জিত, উন্নত রুচিসমৃদ্ধ জীবনবোধ ও জীবনাচরণকে সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বলা হয়।[১]

এমনিভাবে কোন জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা–চেতনার বিশেষ গুণান্বিত আংঙ্গিকের পরিশীলিত ব্যবহারিক বহিঃ প্রকাশকেও সংস্কৃতি বলা হয়। সুতরাং গোটা জাতির শিক্ষা, সাহিত্য, আচার পদ্ধতির বিকাশ ও উৎকর্ষের পরিচায়ক সংস্কৃতি যখন বাস্তবে রূপায়িত হয় তখন তাকে সভ্যতা বলে। প্রত্যেক জাতি বা জনগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক সংস্কৃতি বা কৃষ্টি রয়েছে। সে সংস্কৃতি ভাষা, পেশা, জীবনযাত্রা, ধর্ম, ভৌগলিক সীমরেখা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। হিন্দুদের জন্য হিন্দু সংস্কৃতি, খৃষ্টানদের জন্য খৃষ্টান সংস্কৃতি, ইয়াহুদীদের জন্য ইয়াহুদী সংস্কৃতি, আরবদের জন্য আরবী সংস্কৃতি, পারসিকদের জন্য পারসিক সংস্কৃতি এবং মুসলমিদের জন্য ইসলামী সংস্কৃতি।

নৃ-বিজ্ঞানী Taylor সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :

Culture is the complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by men as a member of society.

"সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত আচার, জ্ঞান, বিশ্বাস, কথা, নীতি, আইন, প্রথা, সংস্কার এবং অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতা ও অভ্যাসের জটিল সমাবেশ–সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষ যা অর্জন করে।"[২]

অধ্যাপক আবুল হাশিম সংস্কৃতির সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন :

Culture is development of the faculties of man both external and internal and is its manifestation in his behaviour and in his immediate material environment.

"মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং তার ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে তার ফলিত রূপকেই সংস্কৃতি বলে।"[৩]

ড. আহমদ শরীফ সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : "সংস্কৃতি হচ্ছে একটি পরিশ্রুত জীবন চেতনা। ব্যক্তি চিত্তেই এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এটি কখনো সামগ্রিক বা সমবায় সৃষ্টি হতে পারে না। এজন্য দেশ, কাল ও জাতে এর প্রসার রয়েছে কিন্তু বিকাশ নেই। অর্থাৎ এটি জাতীয় কিংবা দেশীয় সম্পদ হতে পারে কিন্তু ফসল হবে ব্যক্তি চিত্তের। কেননা সংস্কৃতি ও কাব্য, চিত্র ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো স্রষ্টার সৃষ্টি। কৃতিত্ব স্রষ্টার বা উদ্ভাবকের। তা অনুকৃত বা অনুশীলিত হয়ে দেশে পরিব্যাপ্ত ও জাতে সংক্রমিত হতে পারে এবং হয়ও। তখন Culture হয় সাধারণের

---

১. ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত

২. ড.এ.আর.এম.আলী হায়দার, *ইসলাম শিক্ষা* (ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, ২০০২ খ্রী.), পৃ. ১৬

৩. ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ ঐতিহ্য এবং পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে। যেমন হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনে ও বাণীতে যে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে তাই ইসলামী বা মুসলিম সংস্কৃতি নামে পরিচিত।"[১]

ওয়াকিল আহমদ এর ভাষায়, "জীবন ছাড়া সংস্কৃতি নেই। এ জীবন অচল, অবাক, অক্ষম হলে চলে না– সজীব, সবাক ও সক্ষম হওয়া অবশ্যক। প্রাণহীন জড় প্রকৃতির সংস্কৃতি নেই। মোট কথা সংস্কৃতি জীবন-সম্পৃক্ত, বস্তুসংলগ্ন এবং মানসসম্ভুত।"[২]

ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালে মেক্সিকো সম্মেলনে সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে ঘোষণা করা হয়–ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক, আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা ও কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত এক মাত্র বিষয় নয়। মানুষের জীবন ধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ, মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ। ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও প্রগতিশীল শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা, তাই স্বভাবতই ইসলামী অনুশাসনের প্রভাবে এতে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরীয়ত নির্দেশিত মুসলিম জাতির জীবন পদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।[৩]

নতুন বাংলা অভিধানে লিখা হয়েছে সংস্কৃতি শব্দটি বাংলা শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture। অপর এক গ্রন্থাকারের ভাষায় বলা যায় : সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসগত উৎকর্ষ। সংস্কৃতিকে ইংরেজীতে বলা হয় Culture এ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ। 'CALTURE' থেকে গৃহীত। যার অর্থ হচ্ছে কৃষিকার্য বা চাষাবাদ। তার মানে জমিতে উপযুক্তভাবে বীজ বপন ও পানি সিঞ্চন করা; বীজের রক্ষনাবেক্ষণ, লালন–পালন ও বিকাশ–বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।[৪]

সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ Culture শব্দের অনেকগুলো অর্থ উল্লেখ করেছেন বটে; কিন্তু এ শব্দটি সাধারণত উত্তম স্বভাব–চরিত্র এবং ভদ্রজনোচিত আচার–ব্যবহার ও আচরণ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। লালিত কথাকেও Culture বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অশিক্ষিত ও অমার্জিত স্বভাবের লোকদেরকে Uncultured এবং সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, সুরুচিসম্পন্ন ও ভদ্র আচরণবিশিষ্ট মানুষকে Cultured man বলা হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, Culture বা সংস্কৃতি বলতে একদিকে মানুষের জাগতিক, বৈষয়িক ও তামাদ্দুনিক উন্নতি বুঝায় আর অপরদিকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকেও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়।[৫]

---

১. ড. আহমদ শরীফ, *সংস্কৃতি ভাবনা* (ঢাকা: উত্তরণ, তা. বি.), পৃ. ১৫

২. আসাদ ইবন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, পৃ. ২৫; উদ্ধৃত, ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম, ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি ও স্বরূপ (ঢাকা: ইউনিভার্সাল ইসলামিক থ্যট, ২০১৪ খ্রী.), পৃ. ১৮

৩. ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০ খ্রী.), পৃ. ২৫০

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের জনৈক চিন্তাবিদ কলম–নিবিশের মতে : সংস্কৃতি শব্দটি সংস্কার থেকে গঠিত। অভিধানে এর অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসের দোষ–ত্রুটি বা ময়লা আবর্জনা দূর করে তাকে ঠিক–ঠাক করে দেয়া । অর্থাৎ সংশোধন ও পরিশুদ্ধকরণ তথা মন-মগজ, ঝোঁক-প্রবনতা এবং চরিত্র ও কার্যকলাপকে উচ্চতর মানে উন্নীত করণের কাজকে 'সংস্কৃতি' বলা হয়। খনি থেকে উত্তোলিত কাঁচা সোনাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করণ এবং পরে তা দিয়ে অলঙ্কার বানানোও সংস্কৃতির মূল কাজ । ইংরেজী শব্দ culture এর বাংলা অর্থ করা হয় সংস্কৃতি। মূলত 'সংস্কৃতি' সংস্কৃত ভাষার শব্দ। তার সাধারণ বোধগম্য অর্থ হচ্ছে, উত্তম বা উন্নত মানের চরিত্র ।[১]

অধ্যাপক MURRAY তাঁর লিখিত ইংরেজী ডিকশনারিতে বলেছেন: Civilization বা সভ্যতা বলতে একটি জতির উন্নত সমাজব্যবস্থা বুঝায়, যাতে রাষ্ট্র সরকার, নাগরিক অধিকার, ধর্মমত, ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীন ও আর্ন্তজাতিক আইন বিধান এবং সুসংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান রয়েছে । আর Culture বা সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতা বা Civilization এরই মানসিক ও রুচিগত ব্যাপার। তাতে থাকা–খাওয়ার নিয়ম–নীতি, সামাজিক–সামষ্টিক আচার-অনুষ্ঠান , স্বভাব-চরিত্র এবং আনন্দ–স্ফুর্তি লাভের উপকরণ, আনন্দ-উৎসব , ললিত কলা , শিল্পচর্চা , সামষ্টিক আদত-অভ্যাস , পারস্পারিক আলাপ ব্যবহার ও আচরণবিধি শামিল রয়েছে । এসবের মাধ্যমে এক একটা জাতি অপরাপর জাতি থেকে আলাদা ও বিশিষ্ট রুপে পরিচিতি লাভ করে ।[২]

প্রখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক Will Duran তার এক নিবন্ধে Culture বা সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে: 'সংস্কৃতি সভ্যতার অভ্যন্তর ও অন্ত:স্থল থেকে আপনা থেকেই উপচে উঠে, যে সময় ফুলবনে ফুল আপনা থেকেই ফুটে বের হয়ে আসে।' তাঁর মতে সংস্কৃতিতে Regimentation বা কঠোর বিধিবদ্ধতা চলে না। জাতীয় সভ্যতার প্রভাবে যে সব আদত-অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্র আপনা থেকে গোটা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে তাই সংস্কৃতি। জাতীয় সংস্কৃতি বলে কোন জিনিসকে জোর করে চালু করা যায় না । তা পয়দা করা হয় না বরং আপনা থেকেই পয়দা হয়ে উঠে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ চিন্তা বিশ্বাসের প্রভাবে তাতে পরিবর্তন আসা সম্ভব ।[৩]

প্রখ্যাত দার্শনিক কবি T.S.Eliot সংস্কৃতি বা Culture সম্পর্কে বলেন : 'সংস্কৃতির দুটি বড় চিহ্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একটি ভাবগত ঐক্য আর দ্বিতীয়টি তার প্রকাশ ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের কোন রূপ বা দিক।' তাঁর মতে সংস্কৃতি ও ধর্ম সমার্থবোধক না হলেও ধর্ম সংস্কৃতিরই উৎস। সংস্কৃতি রাষ্ট্র-শাসন পদ্ধতি, ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দর্শন মূলক আন্দোলন-অভিযানেও প্রভাবিত হতে পারে ।[৪]

Oswald spengler –এর মতানুসারে, একটি সমাজের সংস্কৃতি প্রথমে উৎকর্ষ লাভ করে। তারই ব্যাপকতা ও উৎকর্ষের ফলে গড়ে ওঠে সভ্যতা, যা তার প্রাথমিক ক্ষেত্র পযন্তই সীমাবদ্ধ

---

১. প্রাগুক্ত

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

থাকেনা, তা ছড়িয়ে পড়ে ও সম্প্রসারিত হয়ে অপরাপর দেশগুলোর উপরও প্রভাব বিস্তার করে বসে ।[১]

বিখ্যাত সংস্কৃতিবিদ ও দার্শনিক Durant এর মতে, প্রথমে রাষ্ট্র ও রাজ্য এবং পরে সভ্যতা গড়ে উঠে, আর এর ব্যবস্থাধীনে সংস্কৃতি আপনা থেকেই ফুটে উঠে। আর রুচিগত, মানসিক ও সৃজনশীল প্রকশনার অবাধ বিকাশের মাধ্যমে সৌন্দর্যের একটা রূপ গড়ে উঠে। তাতে গোটা জাতির প্রভাবশালী ধারণা-বিশ্বাস ও মূল্যমানের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। এ পর্যায়ে আরবী শব্দ 'সাক্বাফাহ' এর ব্যাখ্যাও আমাদের সামনে আসা প্রয়োজন। তাতে সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরো অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায় ইংরেজীতে তাই Culture এবং আরবীতে সাক্বাফাহ। আরবী তাহযীব শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয় । সাক্বাফাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- চতুর, তীব্র সচেতন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ও সতেজ সক্রীয় মেধাশীল হওয়া। আরবী 'সাক্বাফাহ' অর্থ সোজা করা সুসভ্য করা ও শিক্ষা দেয়া। আর 'আস-সাক্বাফাহ' বলতে বুঝায় তাকে, যে বল্লম সোজাভাবে ধারণ করে। আরবি 'হায্যাবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল গাছের শাখা-প্রশাখা কেটে ঠিকঠাক করা, পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে তোলা, পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করা। আর ইংরেজিতে culture শব্দের অর্থ হচ্ছে - কৃষিজাত করা, ভূমি কর্ষন করা ও লালন পালন করা। Oxford Dictionry তে এর আর একটি অর্থ লিখা হয়েছে Intellectul Development, Improvement by (mental or physial Training) অর্থাৎ মানসিক ও দৈহিক ট্রেনিং এর সাহায্যে মানসিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন।[২]

উল্লেখিত এ তিনটি শব্দের মধ্যেই ঠিকঠাক করা ও সংশোধন করার অর্থ নিহিত রয়েছে। এর পারিভাষিক সংজ্ঞাতেও এই অর্থটি পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে। রাগেব আলি বৈরুতি তাঁর 'আস সাক্বাফাহ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন - "সাক্বাফাহ মানে মানসিকতার সঠিক ও পূর্ণ সংশোধন এমনভাবে যে, সংস্কৃতিবান ব্যক্তির সত্তা পরিপূর্ণতা ও অধিক গুণ বৈশিষ্ট্যের দর্পণ হবে। খারাবীর সংশোধন এবং বক্রতাকে সোজা করাই হলো সাক্বাফাহ বা সংস্কৃতি" ইংরেজী 'কালচার' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য পুরোপুরি সুনির্ধারিত হতে পারেনি। বিশেষজ্ঞরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। সে সংজ্ঞাগুলো পরস্পরের সাথে সমাঞ্জস্যশীল যেমন, তেমনি পরস্পর বিরোধীও বটে।[৩]

Philip Baghy তাঁর Culture and History নামক গ্রন্থে Concept of culture শীর্ষক এক নিবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন: সর্বপ্রথম ফরাসী লেখক ভলটেয়ার ও ভ্যানভেনার্গাস (Voltair and Vanvenargues) এ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তাদের মতে, মানসিক লালন ও পরিশুদ্ধকরণেরই নাম হচ্ছে কালচার। অনতিবিলম্বে

১. প্রাগুক্ত

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত সমাজের চাল-চলন, রীতি-নীতি, শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদিও এ শব্দের আওতায় গণ্য হতে লাগল।[১]

Oxford Dictionary এর সংজ্ঞা মতে বলা যায়, ১৮০৫ সন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় এ শব্দটির কোন ব্যবহার দেখা যায় না। সম্ভবত ম্যাথু অর্ণল্ড তার লিখিত Culture and Anarchy গ্রন্থে 'কালচার' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছেন। সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত এ শব্দটি অস্পষ্টই রয়ে গেছে। এর অনেকগুলো সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থকার A.L Krochs and Kluck Halm এর সূত্র উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এর একশত একষট্টিটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।[২] এই গ্রন্থকারের মতে এ শব্দটির এমন সংজ্ঞা হওয়া উচিৎ, যা মানব জীবনের সর্বদিক পরিশুদ্ধ হবে। ধর্ম, রাজনীতি, রাষ্ট্রক্ষমতা, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, ভাষা, প্রথা-প্রচলন ইত্যাদিকে এর মধ্যে শামিল মনে করতে হবে। বরং মানবীয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা তো মতাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মীয় বিশ্বাস, ক্ষমতা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিসকেও এর মধ্যে শামিল মনে করেছেন। টি, এস ইলিয়ট 'কালচার' শব্দটির তাৎপর্য এভাবে বর্ণনা করেছেন– "চালচলন ও আদব কায়দার পরিশুদ্ধতাকেই কালচার বা সংস্কৃতি বলে" পরে তিনি বিষয়টির আরো বিশ্লেষণ করেছেন এ ভাষায়, কালচার (সংস্কৃতি) বলতে আমি সর্বপ্রথম তাই বুঝি যা ভাষা বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেছেন; অথার্ৎ এক বিশেষ স্থানে বসবাসকারী বিশেষ লোকদের জীবন ধারা ও পদ্ধতি।[৩]

ম্যাথু আর্ণল্ড তার Cultuer a Anarchy গ্রন্থে শব্দটির অর্থ এভাবে লিখেছেন– "কালচার হলো মানুষকে পূর্ণ বানাবার নির্মল প্রচেষ্টা। অন্যকথায় কালচার হল পূর্ণত্ব অর্জন"। কালচার এর বিভিন্ন সংজ্ঞার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, এগুলোকে ভালো ভালো ও চমৎকার শব্দ তো বলা যায়, কিন্তু এগুলো কালচার বা সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যকে যথাযর্থভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। তবে তিনি Montesqueu এবং B. Wilson –এর দেয়া সংজ্ঞাকে অতীব উত্তম বলে মনে করেন আর তা হলো এক বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষকে অধিকতর বুদ্ধিমান ও সচেতন বানানো এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির উৎকর্ষ ও আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য অব্যাহত চেষ্টা করা। কিন্তু তাঁর মতে কালচারের এ সংজ্ঞা সঠিক নয়। তিনি মনে করেন, কালচার ধর্ম হতেও ব্যাপক অর্থবোধক। তাঁর গ্রন্থের বিশেষ ভূমিকা লেখক মুহসীন মেহদী কালচার শব্দের উল্লেখ করেছেন এভাবে:

'এ কালচার মানুষের সাধারণ জীবনধারা থেকে উচ্ছসিত হয়ে উঠে। কালচারের অর্থ হলো মানবীয় আত্মার সাধারণ জমিনকে পরিচ্ছন্ন করা, তাকে কর্ষনের যোগ্য করে তোলা।'[৪]

মুহসীন মেহদী কালচার শব্দ সম্পর্কে এমনিভাবে আরো বলেছেন– সংস্কৃতি না যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতাকে বলা যায়, না মানুষের সত্তার অন্তর্নিহিত কামনা-বাসনাকে; বরং সত্যি কথা এই যে, তা হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বৈষয়িক সৃজনশীলতার অভ্যস্ত ও প্রচলিত রুপ।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

২. Culture, Critical Review of concept and defination. উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৩. T. S. Eliot, *Towards the Defination of Culture*, P. 13, উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

৪. Mohsin Mehdi, *Ibne Khaldun's Philosophy of History*, P.181, উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, , পৃ. ২৬৭

চিন্তাবিদ ফায়জী কালচার শব্দের দুটো সংজ্ঞা দিয়েছেন: একটি সমাজকেন্দ্রিক, অপরটি মানবিক। একটি সংজ্ঞার দৃষ্টিতে কালচার 'তামাদ্দুন' শব্দ থেকেও ব্যাপকতর আর অপরটির দৃষ্টিতে কালচার হচ্ছে মানবীয় আত্মার পূর্ণতা বিধান। সংজ্ঞা দুটি নিম্নরূপ :-

১. কালচার হচ্ছে এমন একটি পূর্ণরূপ যাতে জ্ঞান-বিশ্বাস, শিল্প-কলা নৈতিক আইন-বিধান, রসম-রেওয়াজ এবং আরো অনেক যোগ্যতা ও অভ্যাস–যা মানুষ সমাজের একজন হিসেবে অর্জন করেছে–শামিল রয়েছে।

২. 'মানবীয় কালচার' হচ্ছে মানবাত্মার পরিপূর্ণ মুক্তির দিকে ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন।[১]

কালচার শব্দের এ নানা সংজ্ঞাকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি। (Philip Bagby) প্রদত্ত সংজ্ঞা অপেক্ষাকৃত উত্তম। তিনি 'কালচার' এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন:

আসুন আমরা এ বিষয়ে একমত হই যে, 'কালচার' বলতে যেমন চিন্তা অনুভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি তা কর্মনীতি-পদ্ধতি ও চরিত্রের সবগুলো দিককেও পরিব্যাপ্ত করে।[২]

গ্রন্থকার সমাজ জীবন, মনস্তত্ত্ব ও তামাদ্দুনকে সামনে রেখে 'কালচার' শব্দের খুবই ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

সমাজ সদস্যদের অভ্যন্তরীন ও স্থায়ী কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির নিয়মানুবর্তিতা ও নিরবচ্ছিন্নতাকে বলা হয় সংস্কৃতি। সুস্পষ্ট বংশানুক্রমের ভিত্তিতে যে ধারাবাহিকতা, তা-ও এর মধ্যে শামিল। তিনি আরো বলেছেন:
'কোন বিশেষ কাল বা দেশের সাধারণ জ্ঞান-উপযোগী মানকেই বলা হয় কালচার বা সংস্কৃতি।'

কালচার শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করায় সবচাইতে বেশী অসুবিধে দেখা দেয় এই যে, তার পূর্ণ চিত্রটা উদঘাটিত করার জন্য মন ঐকান্তিক বাসনা বোধ করে বটে। কিন্তু তার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিশেষজ্ঞরা খুব বেশী ডিগবাজি খেয়েছেন। এ কারণে অনেক স্থানেই সংস্কৃতির বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাকে নাম দেয়া হয়েছে 'কালচার' বা সংস্কৃতি। টি. এস. এলিয়ট যথার্থ বলেছেন :

'লোকেরা শিল্পকলা, সামাজিক ব্যবস্থায় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকে কালচার মনে করে, অথচ এ জিনিসগুলো কালচার নয়; বরং তা এমন জিনিস যা থেকে কালচার সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায় মাত্র।'[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

২. Philip Bagby, *Culture and History*, P. 80, উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৫

৩. T.S. Eliot, *Notes Towards the defination of culture*, P. 120, উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতির মূল কথা

জীবনের কুল-কিনারাহীন মহাসমুদ্রে মানুষের অস্তিত্ব এক ক্ষুদ্র তৃণখন্ড সদৃশ মনে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য ও সামাজিক উত্তরাধিকারের পার্থক্যের দৃষ্টিতে বহুতর মহাসমুদ্রের ব্যাপকতা ও বিশালতা রয়েছে মানুষের সত্তায়। মানুষ শুধু নিজের আকার-আকৃতি ও সামাজিক উত্তরাধিকারের বৈচিত্র্যেরই প্রতীক নয়, বরং ভাষা-সাহিত্য, বিশ্বাস-প্রত্যয়, চিন্তা-পদ্ধতি ও জ্ঞান-বুদ্ধির রকমারি শাখা-প্রশাখারও প্রতিচ্ছবি এই মানুষ। স্পষ্টত মনে হয়, এ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাই মাটি-পানির এই জগতের সৌন্দর্য-শোভা। জীবনের স্থিতি ও দৃঢ়তা এ বৈচিত্র্যেরই ফসল।

মানুষের সমাজ-জীবনে ইতিহাস-পূর্বকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতি যে বিকাশমান পর্যায়সমূহকে অতিক্রম করে এসেছে,তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষের নিকটই ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আজও তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি মানুষের সামনে; বরং অস্পষ্টতার এক ছায়াঘন আবরণ তাকে আচ্ছন্ন ও প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমরা যা কিছু জানতে পেরেছি, তা শুধু আন্দাজ-অনুমান বৈ আর কিছু নয়।

মানুষ এক বিশেষ ধরনের পরিবেশে জন্ম গ্রহণ করে। সে পরিবেশে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। জন্ম মুহূর্ত থেকেই নানারূপ জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা ও মিষ্টি-মধুর ভাষা তার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়; তার চোখ দেখতে পায় বৈচিত্রময় সাংস্কৃতিক অনুষ্টানাদি এবং অসংখ্য সক্রিয় প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা। সে প্রতি মুহূর্তেই এ পরিবেশ থেকে প্রেরণা লাভ করেছে, প্রভাব মেনে নিচ্ছে, প্রভাবান্বিত হচ্ছে এবং অবচেতনভাবে তার ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিত্ব ও মন-মানস এক বিশেষ ধরনের ছাঁচে ঢেলে গঠিত হচ্ছে। পরিবেশ থেকে গৃহীত এসব প্রভাব তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং উত্তরাধিকারলব্ধ প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে একাকার করে দেয়। পরিভাষায় একেই বলা হয় সংস্কৃতিবান তথা সভ্য মানুষ (Cultured man)।[১]

মানবতার বিরাট মর্যাদাপূর্ণ প্রাসাদ অবশ্য পাশবিকতার ভিত্তির ওপরই গড়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষ নিম্নশ্রেণীর পাশবিক গুণ-বৈশিষ্ট্যে উৎকর্ষ ও উন্নতি লাভ করে উচ্চতর মানবীয় মূল্যমানে ভূষিত হয়। কেননা বিশ্বস্রষ্টা তাকে বিবেক-বুদ্ধি এবং মন-মানস দিয়ে ধন্য করেছেন। যদিও মানুষের বুদ্ধি-বিবেক (Reason) ও মননশক্তি (mind) খোদার বিশেষ দান, নাকি মানুষ নিজেরাই চেষ্টা-শ্রম ও সাধনার ফলে তা অর্জন করে নিয়েছে? এ বিষয়ে একটা বিতর্ক রয়েছে; কিন্তু সে বিতর্ক বাদ দিলেও আমাদের এ কথা অনস্বীকার্য সত্য।

মানুষ সম্পর্কে দুনিয়ার নানা চিন্তাবিদ নানা মত প্রকাশ করেছেন। ডারউইন (Darwin) তার ক্রমবিকাশ তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, জীবতাত্ত্বিক দিক দিয়ে মানুষ সাধারণ

১. ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায়েরই একটি জীব বিশেষ। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা, হজম-রীতি এবং রক্তের প্রবাহও জীব-জন্তুর এসব দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন কি জন্ম-মুহূর্তে মানুষ জীব-জন্তুর মতোই বাকশ্‌ক্তিহীন হয়ে থাকে। উত্তরকালে দীর্ঘ সময় অতিক্রম করার পর তার পরিবেশ থেকে সে বাকশক্তি অর্জন করে। ডারউইন তার বক্তব্য বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে একটি অরণ্যক মেয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। মেয়েটিকে ১৭৩১ সনে ফ্রান্সের ক্যালন (CHALON) নামক স্থানে পাওয়া গিয়েছিল। সে কথা বলার পরিবর্তে শুধু চীৎকার করতো ।[১]

১৯৫৬ সনে মধ্য-ভারতেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। রামু নামে নেকড়ের একটি বাচ্চা (Ramu the Wolf boy) জঙ্গলে পাওয়া যায়। সেটি ঘাস খেতো এবং জন্তুর মতোই খুব জোরে চীৎকার করতো। বাচ্চাটিকে হাসপাতলে চিকিৎসাধীন রেখে তার পশুসুলভ আদত-অভ্যাসের গভীর ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্যে মানবীয় আদত-অভ্যাস সৃষ্টির চেষ্টা করা হল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। বস্তুত সব জীব-জন্তুই আঙ্গিকের দিক দিয়ে পরস্পর সদৃশ্য। অতএব বুদ্ধি-বিবেক, মন-মানস, চিন্তাশক্তি সবই ক্রমবিকাশের ফসল আর তার নিছক শ্রমলব্ধ ও অর্জিত গুণ-বিশেষ।

কিন্তু ডিকার্টে (Descartes) এ থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, মানুষের মন ও মনন আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অবদান। এ শক্তি আল্লাহ্ তা'আলা কেবল মানুষকেই দিয়েছেন; সৃষ্টির মাঝে এ গুণ তিনি আর কাউকেই দেননি। তবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাহায্যে তাকে অধিক তীক্ষ্ম ও শাণিত করে তোলা যেতে পারে; তাকে উত্তম পন্থায় প্রয়োগ ও ব্যবহার করা যেতে পারে।[২] মানুষের মন সম্পর্কে চিন্তাবিদ মিল(Mill); এর অভিমত হল এই যে, তার চিন্তা, গবেষণা ও অনুভূতি অত্যন্ত জটিল এবং ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। মোটকথা, এদের মতে যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন, মানুষের–সে পুরুষই হোক কি নারী–বুদ্ধি-বিবেক ও মন-মানসই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতার বিশেষ সম্পদ। এর বদৌলতে মানুষ যেমন দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্টি থেকে পৃথক, তেমনি সে বিশিষ্ট ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।[৩]

অবশ্য ডারউইন এ বিষয়েও আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct)-র বিশেষত্বই হল এই যে, তা জ্ঞান-বুদ্ধির প্রভাব থেকেই কাজ করে। জীব-জন্তুর মধ্যে চেতনা তেমন উন্নত ও উৎকর্ষলব্ধ নয়, অথচ মানুষের চেতনা দীর্ঘকাল যাবতই উন্নতমানের রয়েছে। মানুষের মগজ (Cerebral cortex) নিত্য-নব অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কার, উদ্ভাবনীর সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রয়েছে বহুকাল থেকেই; যদিও তার স্নায়ুবিক পদ্ধতি (Nervous system) শুরুতেই নির্ভুলভাবে পৃথককরণ এবং স্মরণ রাখার ব্যাপারে এতো তীক্ষ্ম শক্তির অধিকারী ছিল না।[৪]

এ থেকে ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব দেহ-কেন্দ্রিক হওয়ার বদলে মন-কেন্দ্রিক হওয়ার দিকে ঘুরছে বলে মনে হয়। যান্ত্রিক অস্ত্রশস্ত্র, বই-পুস্তক, সাহিত্য, চিত্রকলা, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস,

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দর-সুরম্য প্রাসাদ, সুনীতি ও সুষ্ঠুতা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান, এই পর্যায়ের সব প্রতিষ্ঠানাদি এবং আধুনিক ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সবকিছুই মানব মনের চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি-প্রতিভারই বিস্ময়কর ফসল। এগুলো মানুষ নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা-গবেষণা ও অভ্যাস-অনুশীলনের সাহায্যে বর্তমান পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। মানুষের নতুন বংশধরেরা এ উত্তরাধিকারকে, যার নাম-সংস্কৃতি, হারাতেও পারে, এর সমৃদ্ধি সাধনও করতে পারে– পারে ভালোভাবে এর সংরক্ষণ করতে।[১]

একেবারে প্রাথমিক কালের অবস্থা লক্ষ্য করলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ সেদিন নিজের পরিবেশে যথেষ্ট পরিবর্তন সূচিত করে পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূল বানিয়ে নিয়েছিল–পরিবেশের সাথে স্থাপন করে নিয়েছিল পূর্ণ সামঞ্জস্য। চক্‌মকির ব্যবহার, গুহা-প্রাচীরের গায়ে (স্পেন ও ফ্রান্সে) চিত্র অঙ্কন ও পাথরের অস্ত্র মানব সমাজে শত-সহস্র বছর পূর্বে প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে পশু শিকার-নির্ভর এ অরণ্যক জীবন পরিহার করে মানুষ স্থিতিশীল সামাজিক জীবন যাপন শুরু করে। মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা ও মননশীলতায় যতোই উৎকর্ষ দেখা দিল, মানুষ ততোই আদিম ও অরণ্যক জীবন থেকে দূরে সরে গেল। কিন্তু এসব হল কিভাবে? এ পর্যায়ে কেবল ধারণা-অনুমানই করা চলে, কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ-নির্ভর জ্ঞান লাভ করা যায় না।

অবশ্য ক্ষেতে ফসল বোনা, ফসল আহরণ, সূতা কাটা, কাপড় বোনা এবং তামা ইত্যাদি ধাতব দ্রব্যকে ব্যবহারাধীন করে নেয়ার খবর পাওয়া যায়। পরর্বতীকালে লেখার পদ্ধতি চালু হয়। এর ফলে মানব জীবনে এক মহাবিপ্লব সূচিত হয়। এসব আবিষ্কার-উদ্ভাবনী মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ক্রমবিকাশমান সংস্কৃতি এরই মাধ্যমে সভ্যতায় পরিণত হয়। আরো পরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাময়িক কার্যক্রমের সাহায্যে তাকে ব্যাপকতর ও সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়।

আবিষ্কার-উদ্ভাবনীকে এক আকস্মিক ব্যাপারই বলা যায়। আর তা হচ্ছে ত্যাগ-তিতিক্ষা, অধ্যাবসায় ও অনুসন্ধিৎসার ফসল। তা যখন লোকদের নিকট সমাদৃত হয়, তখন তা-ই সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে; সমাজ-মানুষের চিন্তায়-মননে এবং আদত-অভ্যাসে তার গভীর প্রতিফলন ঘটে। চিন্তা করা যেতে পারে, মানুষ আজ যদি আগুনের ব্যবহার না জানত, কথা বলতে না পারত, খাদ্য ও পোশাকের কোন ব্যবহার না হতো, তাহলে মানুষের জীবন কি গভীর শুন্যতায় ভরে যেত না ? এ দুনিয়ার যত ব্যক্তিসত্তাই জন্ম নেয়, তারা প্রত্যেকেই নিজকে এক বিশেষ প্রাকৃতিক ছাঁচে ঢেলে তৈরী করে নেয় আর এ ছাঁচের গড়নেও দীর্ঘকালের সাধনা প্রয়োজন। তার অভ্যাস, প্রবণতা, মনোভাব, বিশ্বাস প্রচলন প্রভৃতি সবকিছুই হয় আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর মাধ্যম। এটা না হলে ব্যক্তিদের অসভ্য মনে করা যেত। এজন্যে তারা বাধ্য হয়েই উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ মতাদর্শ ও চিন্তা-বিশ্বাসকে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে; বরং বলা যায়, তার নিজের বাছাই করে কোন একটাকে গ্রহণ করার পূর্বেই এগুলো তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়।[২]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত সংস্কৃতির বিকাশ ও ফলন দৈহিক বর্ধনশীলতা ও বিরাট আকৃতির সাথে অনেকটা জড়িত। পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর প্রভাব, ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধ এবং নৈতিক মূল্যমানের আনুকূল্য, দৈহিক ও মানসিক ও যোগ্যতা ও প্রস্তুতির ওপর নির্ভরশীল। দৈহিক আকৃতির তৎপরতা ও সুক্রিয়াশীলতার সাথে কথা বলার গুরুত্বও অপরিসীম। তার জন্যে চিন্তা-ভাবনা, অনুসন্ধান সমীক্ষণ এবং সচেতন পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এসব চিন্তা-ভাবনা ও তত্ত্ব-তথ্যের মাঝে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তা কখনো ছিন্নভিন্ন হতে পারে না। কর্মের উপর শব্দ তার প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রাচীনতমকালে ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল হু, হ্যাঁ ইত্যাদি ধ্বনি থেকেই। আর লেখার উৎপত্তি হতে এসব ঘটনা ও ক্রিয়াকান্ডের চিত্র অঙ্কন করতে বহু কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন হয়েছিল অবশ্যই। মিশরীয় শিলালিপি, চিত্রলেখা এবং তার পরিবর্তনগুলোকে ধ্বনি-কেন্দ্রিক নিদর্শনই প্রকাশ করে থাকে। এ থেকেই বর্ণের উৎপত্তি আর এ পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছিল আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, শব্দ মূলতই কাজ ও কর্ম মাত্র আর তার শক্তি সর্বজনবিদিত।

সংস্কৃতির আবেগ ও উচ্ছাসমূলক দিকটি শব্দের সাথে সম্পর্কিত আর বুদ্ধি ও মনন হচ্ছে কর্ম, শুধু মাধ্যমই নয়। কেননা সক্রিয় ও প্রভাবশালী চিন্তা-ভাবনার দ্বারা সংস্কৃতি দানা বেঁধে ওঠে আর চিন্তা, মনোভাব, গবেষণা, ও মননশীলতার সাথে শব্দের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এজন্যে নাম ও শব্দের পরস্পর সম্পর্কিত হওয়া আবশ্যক। ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে অনুভূত হয়, যেন কোন একটা জিনিস উপস্থিত করে দেয়া হয়েছে। এভাবে তা বস্তুনিচয়ের সাথে একাত্মতার সৃষ্টি করে। এভাবে এই চেতনা পর্যায়ক্রমিক বিকাশধারায় নিজের জন্যে উপযুক্ত শব্দ ও ভাষার উপাদান সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে অস্তিত্ব লাভ করে এক সম্পদশালী ভাষা।

মানব সমাজে ভাষার বিভিন্নতা ও পার্থক্য কেন? তার কারণ এই যে, স্নায়ুবিক প্রক্রিয়া ও জ্ঞানগত ধারণা বিভিন্ন অবস্থা ও ধ্বনির সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনি ও বিশেষ শব্দের পশ্চাদপটের অবস্থা ও পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্যে যে হাতিয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে,তা দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলে যায়। সাধারণ উন্নতি ও ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারসমূহের সাথে সাথে আত্মপ্রকাশ করে। এ কারণে ভাষা যে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অস্পষ্ট ও চুপচাপ কথাবার্তা চিন্তার মতোই নিঃশব্দ। যদি শব্দই না থাকে, তাহলে চিন্তা, গবেষণা ও সমীক্ষণও থাকে না । মানুষ কেবল সজাগ থেকেই চিন্তা করে না, ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ও তার চিন্তাকর্ম অব্যাহত থাকে। প্রাচীনকালের মানুষের জন্যে এ দৃষ্টিভ্রম বা অস্পষ্টতা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাতিসমূহের আকীদা-বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ ও নীতি-পদ্ধতির সাথে তাদের স্বপ্নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এ জিনিস এমন কারণসমূহের অন্যতম, যার দরুন সভ্যতার প্রাসাদ উন্নতশির হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত সামগ্রিক, ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক শক্তিসমূহের শুভ সংমিশ্রনেরই অপর নাম হচ্ছে 'সংস্কৃতি'।[১]

মানুষের প্রয়োজন–তা আত্মিক হোক কি দৈহিক, রাজনৈতিক হোক কি নৈতিক, ব্যক্তিগত হোক কি সমষ্টিগত, তা সমাজবদ্ধতা ও সংস্থা-সংগঠনের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক মানুষের (Man Of Nature) কোন অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারেনা। তার প্রতিরক্ষা, খাদ্য গ্রহণ ,

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

স্থানান্তর ও গতিবিধি, সবই সামগ্রিক সহযোগিতা মূলক কাজের ওপর নির্ভরশীল। এ সামাজিক দলবদ্ধতা এমন লোকদের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে যারা স্থানীয়, দেশীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। তা ছাড়া অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতার দিক দিয়ে ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়েই থাকে। এসব সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের সকলেরই মানজিল এক এবং অভিন্ন। চলার পথও সমান। এ জীবনপথে চলার ব্যাপারে তাদের আচরণও বিশেষ রীতিনীতি ও আইন-বিধানানুগ আর সেগুলোর মৌল উৎস হচ্ছে ধর্মীয় ও নৈতিক বিধান।

মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর নীতিবাদিতা, মানসিক আবেগ এবং আল্লাহ্‌র ভয় এমন কার্যকরণ, যা বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরনের আচরণ সৃষ্টির নিমিত্তে হয়ে থাকে। সর্বসমর্থিত মূল্যমান মানুষের আচরণকে প্রভাবান্বিত করে আর তার নির্ভুল ও পূণর্বিন্যাস হতে পারে এক বিশেষ ধরনের সংস্কৃতিতে। মনের ইচ্ছা-বাসনা ও আবেগ-উচ্ছাসের পারস্পরিক সংযোজন হতে পারে এসব ব্যবস্থাপনার অধীন। জাতি, সরকার, জাতীয় পতাকা ইত্যাদির পশ্চাতেও অন্তর্নিহিত থাকে জীবন্ত সংস্কৃতির মহাসত্য। আর নতুন বংশধরদের মাঝে তার মোটামুটি মনস্তাত্বিক জৈবজীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে রূপ পরিগ্রহ করে।

ক্রমবিকাশমূলক চিন্তায় বিশ্বাসী লোকদের মতে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত (Sponteneous) পরিবর্তন ধারার পরিণতি। তা সুসংবদ্ধ মৌল নীতিসমূহের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়। তাকে একটির পর একটি পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। অগ্নির অস্তিত্ব লাভ, তৈজসপত্র নির্মাণ, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার এবং তার বিভিন্ন 'ডিজাইন', 'Patern' ও অর্থনৈতিক উন্নতি একথার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

এসব পর্যায় ও স্তরের পরিব্যাপ্তি ও সম্প্রসারণশীলতার (Diffusion) সূচনা কি করে হল, কি করে ও কিভাবে তা ক্রমোন্নতির সিঁড়ি বেয়ে অগ্রসর হল এবং তার কোথায় কোথায় ও কতখানি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? তার সন্ধানের ওপর ঐতিহাসিক চিন্তাবাদের ভিত্তি সংস্থাপিত। সংস্কৃতিকে এভাবেই বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। এজন্যে গোত্র-ভিত্তিক জীবন-ধারা, ধর্মীয় সংঘবদ্ধতা, বস্তুগত ও বৈষয়িক উন্নতি, সামাজিক মূল্যমান ও সামষ্টিক প্রতিষ্ঠানাদি ইত্যাকার বিশেষত্বকে সামনে রেখেই সংস্কৃতিকে বিবেচনা করা হয়। এ সবের বিস্তার যে একই নিয়মে সংঘটিত হতে পারেনি, তা সুস্পষ্ট। বিভিন্ন অঞ্চলে একই ধরনের বিশেষত্ব পাওয়া যেতে পারে বটে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বাইরে তথা বৈদেশিক সভ্যতা-সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাবও তার ওপর প্রতিফলিত হতে পারে। মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনাবলী পরিপূরণে আদত-অভ্যাসের বৈচিত্রও বিশেষ ধরনের পটভূমির অধিকারী। ছড়ি বা লাঠি অন্ধকার যুগে মাটি খোদাইর কাজে ব্যবহৃত হতো। কালের অতিক্রমনের সঙ্গে সঙ্গে তার দ্বারা চালনা-দন্ডের কাজও করা হয়েছে। উত্তরকালে তা আবার ভ্রমন-ছড়ি রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক যুগে এই ছড়িই উচ্চতর মান-মর্যাদার নিদর্শন। আবার শিক্ষাঙ্গনে তা দৈহিক পীড়নের উপকরণ। এক কথায় ছড়ির সঙ্গে যেসব ধারণা ও চিন্তা-বিশ্বাস জড়িত, তা সমাজের প্রচলিত মূল্যমান দ্বারা প্রভাবিত। সোরাহীকে এক কালে পানির সঞ্চয় রক্ষা ও তা শীতল করার কাজে ব্যবহার করা হতো। পরিবর্তিত চিন্তা-বিশ্বাস ও ধারণা-মতবাদ তার ব্যবহারের উপর সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে সেই সোরাহীই শিল্পীর উচ্চমানের শিল্পকর্মের নিদর্শন হয়ে ড্রয়িং রুমের শো-কেসে স্থান লাভ করেছে এবং লোকদের সৌন্দর্য- পিপাসু মন-মানসের স্পৃহা চরিতার্থ করেছে। নৌকার গঠন-প্রকৃতি, তার সংগঠন

Dhaka University Institutional Repository

পরিপক্কতা এবং তাকে কর্মোপযোগী বানানোর কাজে যুগ যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে হাজার রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নৌকা বা জাহাজ নির্মাণ কৌশলে দক্ষতা, নৌ-পরিচালনা বিদ্যা ও পদ্ধতি সব কিছুই তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশেষে বর্তমান যুগে এসে তা একটা সর্বাত্মক সৌন্দর্য ও ব্যবহারিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

জমির ওপর লাঙ্গল চালানো, বীজ বপন করা ও ফসল তোলা–এই সব কিছুই একটা নিয়ম ও শৃংখলার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এসব তৎপরতা বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশ-পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের পন্থা-পদ্ধতি ও হাতিয়ার অবলম্বন করেছে। এভাবে মানবীয় প্রয়োজন যথার্থভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করার একটা বিশেষ ভঙ্গি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এগুলোর পারস্পরিক সংমিশ্রণ ও সংযোজন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের (Traits) পরিণতি নয়; বরং তা সে সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের (Institutions) অবদান যেসব সংস্থা নিজেদের সুসংবদ্ধ ও সুসংহত চেষ্টা-প্রচেষ্টার দরুন এ পর্যায়গুলো অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অতিক্রম করেছে। একটি জিনিসের ব্যবহারের সাংস্কৃতিক পটভুমি (Cultural Context), চিন্তা-ভাবনা,প্রচলন এবং আনুষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা (Attachment) অনিবার্য–তা কোন ব্যক্তির দ্বারাই ব্যবহৃত হোক, কি কোন সমাজ সমষ্টি কর্তৃক। ছড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ, তার ওপর নানা রূপ নকশা অংকন, চাক্‌চিক্য বৃদ্ধিতে একটি সাংস্কৃতিক, আনুষ্ঠানিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় সম্পৃক্ততা বলিষ্ঠভাবে বর্তমান আর তা-ই তার মৌলিক ব্যবহারের উপর পরিব্যাপ্ত।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের তৎপরতাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের কাজে ব্যবহার করে থাকে। আর এই উদ্দেশ্য লাভের জন্যেই সে সব সংগঠন গড়ে তোলা হয়। তাতে জীবন-জীবিকা, বংশানুক্রম, প্রতিরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকার গুরুত্ব সর্বাগ্রগণ্য। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে ধনসম্পদ বিনিয়োগ, উপায়-উপকরণের ব্যবহার, হাট-বাজার যোগাযোগ ও নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি গড়ে ওঠে আর নিত্যকার ব্যস্ততার মধ্যে মাছ-ধরা, বাগান রচনা, পশু পালন, বন্য পশু শিকার ও চাষাবাদ এর শামিল। এসবের সাহায্যেই আর্থিক ভিত্তি সুদঢ় হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

মানব জীবনে সংস্কৃতির ভুমিকা

ভাষা-বিশেষজ্ঞরা 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। ভূমি চাষ বা জমির কর্ষণ, শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে মন-মানসের পরিচ্ছন্নতা ও উৎকর্ষ বিধান, নৈতিকচরিত্র ও মানসিক যোগ্যতার পরিবর্ধন, স্বভাব-মেজাজ, আলাপ-ব্যবহার ও রুচিশীলতার পরিমার্জন এবং এসব উপায়ে কোন জন-সমাজ বা জাতির অর্জিত গুণ-বৈশিষ্ট্য, এসবই 'সংস্কৃতি' শব্দে নিহিত ভাবধারা। এ থেকেই সংস্কৃতির অর্থ করা হয় 'অর্জিত কর্মপদ্ধতি'। এ অর্জিত কর্মপদ্ধতিতে রয়েছে আমাদের অভ্যাস, ধরন-ধারণ, চিন্তা-বিশ্বাস ও মূল্যমান, যা এক সুসংবদ্ধ সমাজ বা মানব গোষ্ঠী কিংবা একটা সঠিক পরিবার-সংস্থার সদস্য হওয়ার কারণে আমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। আমরা নিজেরা তা রক্ষা করে চলি এবং মনে মনে কামনা পোষণ করি তার উৎকর্ষ ও বিকাশ লাভের।

সংস্কৃতির এ তাৎপর্য অনেক ব্যাপক-ভিত্তিক। এর মধ্যে শামিল রয়েছে এমন সব জিনিসও, যাকে সাধারণত এর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না। ব্যাপক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে, প্রতিটি কর্মপদ্ধতির মূলে রয়েছে কতকগুলো বিশেষ কার্যকারণ; সেগুলো কি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয় ? আমাদের মধ্যে ক্ষুধার উন্মেষ হয়, আমরা তা দূর করার চেষ্টায় লিপ্ত হই; সেজন্যে কিছু-না-কিছু কাজ আমরা করে থাকি। যেমন ক্ষুধা নিবারণ, তবে শুধুমাত্র ক্ষুধা নিবারণ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু যে নিয়মে আমরা ক্ষুধাকে নিবৃত করি, সেজন্যে যে ধরনের খাদ্য আমরা গ্রহন করি এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহে আমরা যে নিয়ম ও পন্থা অনুসরণ করি, তা সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের যৌন-প্রকৃতি–কিংবা বলা যায় যৌন কার্যকারণ–মূলত একটি দৈহিক প্রবণতা; তার সাথে সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে এমন বিশেষ পন্থা ও পদ্ধতিতে, যা মানব সমাজের বিশেষ অভ্যাস ও রসম-রেওয়াজের অঙ্গীভূত হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে এই বিশেষ ধরণ ও পদ্ধতি অবশ্যই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

মানবতা-বিশেষজ্ঞরা সংস্কৃতির সাধারণ মূলনীতির ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। যে কর্মপদ্ধতি সব সংস্কৃতিতেই সমানভাবে বিরাজমান এবং সব সংস্কৃতির জন্যেই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে ভাষা; এটি স্বতঃই সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে পারিবারিক সংগঠনের কোন না কোন রূপ। বস্তুত কোন সংস্কৃতিই তাকে জানবার ও তার আত্মপ্রকাশের উপায় ও মাধ্যম ছাড়া বাঁচতে পারে না। অনুরূপভবে বংশ সংরক্ষণের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে সংস্কৃতিই স্বীয় অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। এর চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সত্য এই যে, সংস্কৃতি স্বতঃস্ফুর্তভাবেই সাধারণ মূলনীতির মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। মানুষ কোথাও একত্রে বসবাস করবে অথচ তার কোন সংস্কৃতিই থাকবে না, এটা অসম্ভব; অন্তত এরূপ এক মানব- সমষ্টির অস্তিত্ব ধারণাই করা যায় না। এমন কি দুনিয়ার ও লোক-সমাজের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে যে ব্যক্তি নিবিড় অরণ্যের এক নিভৃত কোণে বসে আছে, যে মনে করে নিয়েছে যে, সে দুনিয়ার সব নিয়ম-নীতিকেই পরিহার করে চলেছে, মূলত সে-ও অবচেতনভাবে অন্য লোকদের কাছ থেকে নেয়া কিছু-না-কিছু নিয়ম-নীতি অবশ্যই পালন করে চলছে– সে তা স্বীকার করুক আর না-ই করুক। তার চিন্তা-বিশ্বাস,

Dhaka University Institutional Repository

তার কাজ-কর্ম সারা জীবন ধরে তার সঙ্গে লেগেই থাকে; কিন্তু তা কোথায় যে রয়েছে এবং কবে থেকে, তা সে বুঝতে এবং জানতেই পারে না।[১]

সংস্কৃতির এ সার্বিক বৈশিষ্ট্যকে মানবীয় বিকাশের ফসল বলা যেতে পারে অনায়াসেই। মানুষ সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে পারছে শুধু এজন্যে যে সে নিজের মধ্যে এমন কিছু যোগ্যতা ও প্রতিভার লালন ও বিকাশ সাধনে সাফল্য অর্জন করেছে, যার ফলে সংস্কৃতির সৃষ্টি তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সংস্কৃতির উদ্ভাবন করে মানুষ যেন নিজেরই পরিবেষ্টনীর এক নব-দিগন্তের সৃষ্টি করে নিয়েছে। এর ফলে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া খুবই সহজ হয়েছে তার পক্ষে। আর এ সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে সেদিন থেকেই, যেদিন এ দুনিয়ার বুকে মানব জীবনের প্রথম সূর্যোদয় ঘটেছিল সেই দূর অতীতকালে। এ জমিনের বুকে সেই প্রথম যেদিন মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো, সেদিন থেকে মানুষের জ্ঞানও বুদ্ধির যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে মানুষের এ সংস্কৃতির বাহ্য রূপও বিবর্তিত হয়েছে অনেক।

মানব জীবনের সেই প্রথম পর্যায়টি ছিল সর্বতোভাবে স্বভাব-ভিত্তিক,স্বভাব-নিয়মে চলত সে জীবনের দিনগুলো। খাদ্য গ্রহণ এবং বসবাস করার ধরন-ধারণ ও নিয়ম-পদ্ধতি ছিল অতীব স্বাভাবিক ও স্বভাব-নিয়মসম্মত। কোন কৃত্রিমতার অবকাশ ছিল না সে জীবনে। সেকালে খাদ্য আহরণের ক্ষেত্র ছিল এই বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতি, জীবনযাত্রা ছিল প্রকৃতি-কেন্দ্রিক, সহজ ও সাচ্ছন্দ। মানুষ ক্রমশ এখানে তার অন্তর্নিহিত কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রকৃতিকে নিজের জীবন-যাত্রার অনুকূল করে তুলতে শুরু করে। প্রকৃতির বুকে মানুষের শক্তি-প্রয়োগের সে অভিযান সেদিন শুরু হয়েছিল, ক্রমবিকাশের নানা স্তর অতিক্রম করে, তা আজো সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে সব বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে চূর্ণ করে, দুমড়ে দিয়ে।

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজের ব্যবহারে লাগাবার জন্যে মানুষ তৈরী করে নিয়েছিল নানা হাতিয়ার। দিন যতোই অগ্রসর হয়েছে, মানুষ এ প্রকৃতির বুকে পেয়েছে নানা অপূর্ব সম্পদ ও মহামূল্য দ্রব্য-সম্ভারের সন্ধান এবং তাকে ব্যবহার করার জন্যে মানুষ তৈরী করেছে তার উপযোগী হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি। এতে করে মানুষের চিন্তা-শক্তি একদিকে যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনি হয়েছে তাতে সুক্ষ্মতা, গভীরতা ও বিশালতার উদ্ভব। তাই আজ একদিকে মানুষের বুদ্ধি-প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ সাধিত হয়েছে, অপরদিকে মানুষ তৈরী করতে সক্ষম বহু বিচিত্র ধরণের জটিল ও জটিলতর যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার। আজ মানুষ সক্ষম হয়েছে জটিলতর ও সূক্ষ্মতর কর্ম সম্পাদনে।

মানবীয় সংস্কৃতির বর্তমান বিকশিত রূপ মানুষের বুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা উভয়েরই পরিণতি। কিন্তু এ বিকশিত রূপ যতোই বিভিন্ন ও বিচিত্র হোক-না কেন, মানব প্রকৃতির আসল রূপ আজো ঠিক তা-ই রয়ে গেছে, যা ছিল তার বৈষয়িক জীবনের প্রথম সূচনাকালে। পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে অনেক; কিন্তু তা সবই বাহ্যিক–পোশাকী পর্যায়ের। বিবর্তন ও পরিবর্তনের এ আঘাত মানব-প্রকৃতির মূল ভাবধারায় পারেনি কোন পরিবর্তন সূচিত করতে। এ এমনই এক সত্য, যা মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে না।

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক কি ? মানুষ কি প্রকৃতির দাস, না মানুষের অধীন এই প্রকৃতি ? প্রকৃতি কি মানুষকে নিজের মতো গড়ে তোলে, না মানুষ নিজের মতো গড়ে নেয় প্রকৃতিকে ? এ এক জটিল এবং অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্ন। প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে যত গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তাই করা যাবে, ততোই এ সত্যে প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, কথাটি কোন দিক দিকেই পুরোমাত্রায় সত্য নয়; বরং সর্বদিক দিয়েই তা আধা-সত্য। মানুষ প্রকৃতির দাস নয়, একথা ঠিক; কিন্তু প্রকৃতি ছাড়া মানুষের জীবন ধারণাতীত। প্রকৃতি মানুষকে নিজের মত গড়ে; কিন্তু সে গড়ন বাহ্যিক–দৈহিক মাত্র। মানসিকতার কোন নব রূপায়ন বা তাকে নতুনভাবে ঢেলে তৈরী করা প্রকৃতির সাধ্যের বাইরে; বরং দেখা যায়, মানুষ প্রকৃতির ওপর নিজের সুক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তি, প্রতিভা ও অপ্রতিহত কর্মক্ষমতার সুস্পষ্ট ছাপ আকঁতে পারে।[১]

মানুষ প্রকৃতির ওপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করতেই সর্বদা সচেষ্ট। সে নিজের ইচ্ছা মতো তার পরিবেশকে গড়ে তুলতে চায়। সেজন্যে সে নিজের অভিপ্রায় অনুসারে প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করে, প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে এবং প্রকৃতির কাঁচা মালকে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ নতুন এক জিনিস তৈরী করে নেয়; কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায়, মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত করতে সক্ষম হয়নি; বরং মানুষের বুদ্ধি-প্রতিভা চিন্তা-গবেষণা ও কর্মশক্তির যা কিছু প্রয়োগ, তা এই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই কার্যকর হয়ে থাকে, তার বিপরীত কিছু করা সম্ভব হয়না মানুষের পক্ষে।

মানুষের সাংস্কৃতিক ভাবধারায় এরই সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। মানুষ এখানে এক নির্জীব পদার্থের মত পড়ে থাকতে প্রস্তুত নয়। সে চায় নিজের ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে যেতে স্বীয় পরিবেশ ও প্রকৃতির বুকে। এজন্যে সে গভীর চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও পরিকল্পনা শক্তি এবং কর্মের ক্ষমতা ও সামর্থ্য এ দুটিকেই পুরোমাত্রায় প্রয়োগ করে। আর মনের সুষমা মিশিয়ে সে এখানে যা কিছু স্থাপন করে, যা কিছু বলে, যেভাবে জীবন যাপন করে, যেভাবে লোকজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, যেভাবে পরিবার, সমাজ, অর্থ-সংস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে, সব কিছুতেই তার নিজস্ব চিন্তা-বিশ্বাস, ধারণা-অনুমান ও কর্ম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এভাবে মনের ও মানসিকতার যে প্রতিফলন ঘটে সমগ্র পরিবেশের উপর আমাদের ভাষায় তাকেই আমরা বলি সংস্কৃতি। এ হচ্ছে মানসিক ভাবধারা ও মানসিকতারই বাহ্য প্রকাশ। তাই যা ব্যক্তির মানসকিতা, যা তার মানসিক ভাবধারা, তা-ই সংস্কৃতির মূল উৎস এবং একই মানসিকতাসম্পন্ন বহু মানুষের বাস্তব জীবনে এ মৌল উৎসের যে প্রতিফলন ঘটে, তা-ই সে সমাজের সংস্কৃতি।

ব্যক্তি জীবন সমাজ-নিরপেক্ষ নয়, হতে পারে না। ব্যক্তি-মানসিকতা সংস্কৃতির যে মৌল উৎস, তারও সামাজিক ও সামষ্টিক প্রতিফলন এবং প্রতিষ্ঠা একান্তই স্বাভাবিক। এর ব্যত্যয় হতে পারেনা কখনো। তাই ব্যক্তি-সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত হয়ে ব্যক্তির সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারে না। তার বিকাশ, প্রকাশ, সম্প্রসারণ ও পরিব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এটাই হচ্ছে সংস্কৃতির পরিবেশ।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতির নিজস্ব ভাষা প্রয়োজন। এমন কোন সংস্কৃতির ধারণা করা যায় না, যার নিজস্ব কোন ভাষা নেই–নেই নিজস্ব কোন পরিভাষা। সংস্কৃতি যতই জটিল ও সূক্ষ্ম হোক এবং তার প্রকাশ যতই কঠিন হোক না কেন, মানসিক ভাবধারা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও হয় ততই তীব্র। মানব মনের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা ও আশা-আকাংক্ষা স্বতঃই প্রকাশের মুখাপেক্ষী–প্রকাশপ্রবণ। এর প্রাবল্য যত তীব্র হবে, মানুষের মগজও হবে তত বেশী কর্মক্ষম ও সৃজনশীল। মন ও মগজের এ বিকাশশীলতার চাপে মানুষের সংস্কৃতিও হয়ে ওঠে ততই বিকাশমান ও গঠনোন্মুখ। এভাবেই সংস্কৃতির যতই অগ্রগতি ঘটে, জন-মানস এবং মানসিকতাও ততই উৎকর্ষ লাভ করে। আর মানুষও তার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনে ততই সক্ষম হয়ে ওঠে। এর ফলে মানব-বংশের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানব-সংস্কৃতিরও প্রকাশ ঘটে নানাভাবে, নানা রূপে এবং নানা উপায়ে। এজন্যে বলতে হবে, মানুষ ও সংস্কৃতি পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত–অবিচ্ছিন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী সংস্কৃতি ও তার বৈশিষ্ট্য

১ম পরিচ্ছেদ

ইসলামী সংস্কৃতির ধারণা ও মূল কথা

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর এ জীবন ব্যবস্থার চিন্তামূলক দিকই হল ইসলামী সংস্কৃতি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস বুঝায় ঃ

১. উন্নততর চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল।
২. ঐহিহাসিক দৃষ্টিতে সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্জিত সাফল্য।
৩. মুসলিমদের জীবনধারা, ধর্মীয় কাজকর্ম, ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম-প্রথার বিশেষ সংযোজন।[১]

অপর এক চিন্তাবিদের দৃষ্টিতে ইসলামী সংস্কৃতির দুটি অর্থঃ একটি তার চিন্তার দিক আর অপরটি হল সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজ-সংস্থা। কিন্তু আমরা প্রথমটিকেই সংস্কৃতি মনে করি বলে বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের মানসিক অবস্থা, যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠে; যেমন আল্লাহ্‌র একত্ব, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানব বংশের ঐক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস।[২]

মানুষের চিন্তাগত জীবন এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই আলোক-উদ্ভাসিত হয় এবং গোটা মানববংশ প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এ আলোকচ্ছটায়। আসলে ইসলামী সংস্কৃতি আলোর এক সুউচ্চ মীনার; এ থেকেই ইসলামী সভ্যতা রুপায়িত হয়। এ মীনারই সমগ্র জগতের সংস্কৃতিসমূহকে প্রভাবান্বিত করেছে, আপনও বানিয়ে নিয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণ সংস্কৃতির সূচনা ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ পেশ করে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কারোর কারোর দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেসব অঞ্চলে জৈবিক ও অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের অনটন প্রকট, সেখানে প্রয়োজনের প্রবল তাগিতে মানুষ পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। দুনিয়ার দিকে দিকে ও দেশে দেশে তারা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে নিত্য নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সংঘটিত হয়। এর দরুন নানা সংস্কৃতির পারস্পরিক মিশ্রণ ঘটে আর তার ফলে একটি নবতর সংমিশ্রিত রূপের উদ্ভব হয়।[৩]

---

১. Islamic Culture. p. 6 ; উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

২. International colloqium. p. 26 ; উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপভাবে যে সব দেশের আবহাওয়ার আর্দ্রতার অংশ শতকরা ৭৫ ভাগ বা ততোধিক সেখানে ঝড়-ঝপটা ও ঝঞ্ঝা তুফান নিত্য-নৈমিত্যিক ব্যাপার, এর দরুন সেখানকার জনজীবন কঠিনভাবে বিধ্বস্ত হয়। তাদের মন-মানসিকতার ওপর এর তীব্র প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া অবধারিত। এই পরিমন্ডলের লোকেরা বাধ্য হয়ে স্থানান্তরে গমন করে ও ভিন্নতর অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে ছুটে যায় এবং নিজেদের চেষ্টায় এমন সব স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে, যেখানে তাদের মনের আশা-আকাংক্ষা উজ্জীবিত হয়, চিন্তা, চেতনা,অনুভুতি ও বোধশক্তি পায় তীব্রতা- তীক্ষ্নতা। প্রাচীনতম কালে পৃথিবীর বিশেষ কয়েকটি অঞ্চল সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাকেন্দ্র ছিল। এশিয়ার দজলা ও ফোরাত নদীর উপকূল , গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর বেলাভূমি আফ্রিকার নীল উপত্যকা,ইউরোপের টায়র উপত্যকা, যার উপকূলে রোম শহর অবস্থিত– ইত্যাদি এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অনুরূপভাবে আজ থেকে প্রায় পনেরো শো বছর পূর্বে মেক্সিকো (Mexico), হন্ডুরাস (Honduras) ও গুয়েতেমালায় (Guatemala) মায়েন (Mayan) সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল।[১]

অতীতের মূল্যবান জাতীয় সম্পদের অবলুপ্তির দাসপ্রথার ব্যাপক প্রসার এবং অবসাদ-অবজ্ঞায় অভ্যস্ত হওয়ার ফলেও জাতিসমূহের রীতি-নীতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। গ্রীক ও ভারতীয় সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল তাদের দেশসমূহের ভৌগোলিক ধরণ-ধারনের কারণে। এসব দেশের নদ-নদীর বেলাভুমি এবং উপত্যকাসমূহে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ব্যাপকতাভাবে প্রসার লভ করে। মরুচারী জীবন পদ্ধতিতে দুগ্ধ ও গোশ্ত প্রচুর পরিমাণ সহজলভ্য হওয়ার দরুন সেখানকার অধিবাসীরা শক্তি ও বীরত্ব গুনে ধন্য হয়ে থাকে আর তার ফলেই তাদের মধ্যে কঠোরতা নির্মমতা ও স্বৈরাচারমূলক ভাবধরা তীব্রতর রূপে দেখা দেয়। এ শ্রেণীর লোকেরা দুনিয়ার দিকে দিকে বিজয়ী ও শাসক হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। বেবিলনীয়, আসিরীয়, কালদানীয় এবং দজলা ও ফোরাত অঞ্চলের সংস্কৃতিসমূহের উকর্ষ ও প্রসার লাভের পিছনে এই কারণই নিহিত রয়েছে। তারা মধ্য এশিয়া থেকে উত্থিত হয়ে পারস্য ও ভারতীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং সভ্যতার ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে আধুনিক ইউরোপের গুরুর মর্যাদা লাভ করে। এই মারুচারী লোকেরাই কাব্য-সাহিত্য ও নানা ধর্মমতের প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা হয়ে দাঁড়ায়।

ইতিহাসবিদ-দার্শনিক ইব্ন খালদুন এবং আধুনিক কালের বিশ্ব-বিশ্রুত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি (Arnold toyenbee) এ সম্পর্কে যে দৃষ্টিকোণ পেশ করেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য। তা হল, দারিদ্র ও অভাব-অনটনের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে মানুষ নিজেদের প্রাচীন জীবনধারা পরিত্যাগ করে এবং নবতর দিগন্তের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে নানা দেশে ও নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় আর এভাবেই সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়।[২]

এভাবে জনতার স্থানান্তর মরু পরিক্রমা, যাযাবর জীবন-ধারা, চিন্তা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের ধরন প্রভৃতি সংস্কৃতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ইতিহাস-পূর্ব কালের ব্যবসায়িক সড়ক, রোমান গীর্জা এবং বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতি একালের সংস্কৃতির ওপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। কাল-পরিক্রমায় দক্ষিণ আমেরিকা,

---

১. প্রাগুক্ত

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য আফ্রিকা, দূরপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার প্রাচীনতম সংস্কৃতিসমূহ সম্পূর্ণরুপে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তার করণ এই যে, স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ও হল্যান্ডের অধিবাসীরা নিজেদের শিক্ষাগত, রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতার সাহায্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ঐসব অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নাম-নিশানা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্ণূরূপে বিলুপ্ত ও নিঃশেষ করে দিয়েছে। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার সংস্কৃতিসমূহ পশ্চাদপদ রয়ে গেছে। কেননা উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলো থেকে এ অঞ্চলগুলো বহুদূরে অবস্থিত ছিল এবং উন্নতি ও বিকাশ লাভের কোন কারণ বা উদ্যোগই সেখানে ছিলনা। বৈদেশিক আক্রমণ থেকেও এদেশগুলো মুক্ত রয়েছে এবং দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতিরও কোন ছায়াপাত ঘটেনি এসব দেশের ওপর। নৈসর্গিক উপায়-উপকরণ দুনিয়ার সব দেশের মানুষের জন্যেই সমান। কিন্তু বংশীয় পার্থক্য-বৈষম্য দৈহিক-মনস্তাত্বিক বিশেষত্ব,লিঙ্গগত প্রভেদ, সমাজের বিশেষ গঠন-প্রণালী ও নিয়মতন্ত্র একটি বিশেষ ধরনের অবয়ব গড়ে তোলে এবং এগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও একটি নবতর বিজয়ী সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও উৎকর্ষ দান করে। সংস্কৃতির উৎকর্ষে এমন পর্যায়ও আসে, যখন অধিকতর উৎকর্ষ লাভ ও তার সম্ভাবনা ম্লান হয়ে আসে। তবে বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণ, অর্থনৈতিক তৎপরতা ও গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি সংস্কৃতিক উৎকর্ষে যথেষ্ঠ সাহায্য করে থাকে।

সংস্কৃতি সম্পর্কে এ তত্ত্বমূলক আলোচনার পর আমার বক্তব্য হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামেরও কি কোন সংস্কৃতি আছে? থাকলে কি তার দৃষ্টিকোণ? কি তার রূপরেখা ?

ইসলামের কোন সংস্কৃতি আছে কিনা কিংবা সংস্কৃতি সম্পর্কে ইসলাম কোন সুস্পষ্ট ধারণা দেয় কি-না, সে আলোচনা পরে করা হচ্ছে। তার আগে বলে রাখা দরকার যে, দুনিয়ার প্রখ্যাত কয়েকজন মনীষী 'ইসলামী সংস্কৃতি' বলতে কোন জিনিসকে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, ইসলামী সংস্কৃতি আবার কি ? কেউ কেউ বলেন, ইসলামের কোন সংস্কৃতি আছে না-কি ? থাকলেও গ্রীক, রোমান, প্রাচীন মিশরীয়, পারসিক বা ভারতীয় সংস্কৃতিকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরু তাঁর আত্মচরিতে 'ইসলামী সংস্কৃতি' কথাটির ওপর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।[১] তিনি এ পর্যায়ের আলোচনায় উপমহাদেশী মুসলিম সমাজের কতিপয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদ্রুপ করেছেন। তিনি বলেছেন: মুসলিম সংস্কৃতি'কে বুঝতে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, উত্তর ভারতের মধ্যম শ্রেণীর মুসলিম ও হিন্দু ফারসী ভাষা ও কিংবদন্তীতে খুবই প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানতে পারা যায় যে, এক বিশেষ ধরনের পাজামা– না লম্বা না খাটো- বিশেষ ধরনে গোঁফ মুন্ডন করা, দাড়ি রাখা এবং এক বিশেষ ধরনের লোটা–যার বিশেষ ধরনের থুথনি হবে, এগুলোই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি। মুসলিম সংস্কৃতি তথা ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে মি: নেহেরুর এ উক্তি শুনে হাসবো কি কাঁদবো, ঠিক করা যাচ্ছে না।

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরাও (Orientalists) মিঃ নেহেরুর চাইতে কোন অংশে কম জানে না। জার্মান পন্ডিত ভন ক্রেমার ও লেবাননী পন্ডিত ফিলিপ হিট্টিও ইসলামী সংস্কৃতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। তাদের মতে মুসলিমরা যখন পারস্য ও মিশর জয় করে, তখন তারা প্রাচীন

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

সভ্যতার ধারক লোকদের সম্মূখীন হয় এবং তারা সবকিছু এদের কাছ থেকে শিখে নেয়। আরো বলা হয়, আরব মুসলিমদের নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে কিছুই ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, স্থাপত্যবিদা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজ্য-শাসন এ সবের কিছুই জানত না মুসলিমরা। তবে এসব কিছু জানবার ও শেখবার বড় অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভা মুসলিমদের মাঝে ছিল। এ পর্যায়ে প্রাচ্যবিদরা বলেন: গ্রীক, পারসিক ও আর্মেনিয়ান শিল্পকলা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পুনর্জীবন দান করেন প্রথমে আরব মুসলিমরা এবং পরে দুনিয়ায় বিভিন্ন জায়গার মুসলিমরা।[১]

পন্ডিত নেহেরুই হোন আর প্রাচ্যবিদ এসব বড় বড় পন্ডিতরা, এরা কেউ-ই যে ইসলামী সংস্কৃতি ঝুঝতে পারেননি, তা বলাই বাহুল্য। আর ইসলামী সংস্কৃতিকে বুঝতে না পারার মূল কারণ যে ইসলামের প্রকৃত ভাবধারাকে বুঝতে না পারা, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অথবা বলা যায়, তারা জেনে-শুনেই ইসলামী সংস্কৃতিকে বিদ্রুপ করেছেন, তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন কিংবা এ-ও হতে পারে যে, তারা একটি ছিদ্র দিয়ে ইসলামকে দেখার চেষ্টা করেছেন বলেই তাদের ধারণা এতদূর বাঁকা অর্থহীন হয়ে গেছে যে, তাঁরা তা টেরই পাননি।

কেবল প্রাচ্যবিদরাই নন–নয় কেবল প্রাচীন পন্ডিতদের কথা, ইসলামী সংস্কৃতিতে অস্কীকৃতি জানাতে কসুর করেননি এ যুগের এবং দেশের প্রতিবেশী অমুসলিম জাতিও । শুধু তা-ই নয়, তাদের ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত ও ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানে পারদর্শী পন্ডিত ব্যক্তিরা এবং তথাকথিত মুসলিম নামধারী লেখকরাও ইসলামী সংস্কৃতিকে–সংস্কৃতির ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে তথা ইসলামী রূপরেখাকে বুঝতে পারেন নি; হয়ত-বা বুঝতে চেষ্টাই করেননি অথবা বুঝতে চাননি কিংবা বলা যায় বুঝতে পেরেও তাকে অস্কীকারই করতে চেয়েছেন। কেননা অস্বীকার না করলে কিংবা তাকে সংস্কৃতি বলে স্বীকৃতি দিলে সংস্কৃতির নামে চলমান বর্তমানের আর্বজনা, অশ্লীলতা ও জঘন্যতাকে পরিহার করতে হয় আর তাকে পরিহার করলে জীবনের আনন্দ-স্ফূর্তির উৎসই যে বন্ধ হয়ে যাবে– মৌচাক যাবে শুকিয়ে। তখন জীবন যে যাবে মরু আরবের মত ঊষর-ধুসর রুক্ষ-নিরস হয়ে। তখন বেঁচে থাকার স্বাদটুকুও যে নিঃশেষ হয়ে যাবে; ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, ইসলামের জীবন-স্রোতে ভাসতে হবে, জীবনের গতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, বইতে হবে ভিন্ন স্রোত-বেগে আর তা তাদের পক্ষে সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। অতএব তাদের বলতে হয়েছে:

'স্থুলভাবে যারা ধর্মাচরণ এবং ধর্মভিত্তিক ধ্যান-ধারণার সমষ্টিকে সংস্কৃতি বা তামাদ্দুন মনে করেন অথবা আরব-পারস্যের জ্ঞান-চর্চা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেই সারা মুসলিম জাহানের সংস্কৃতি বলতে চান, তাদের সঙ্গে তর্ক দুঃসাধ্য।

হ্যাঁ,দুঃসাধ্যই বটে! দুনিয়ার মনীষীদের মতানুযায়ী 'ধর্মকে সংস্কৃতির উৎস' রূপে স্বীকার করে নিলে যে ধর্মকে মানতে হয়, মেনে নিতে হয় ধর্মীয় অনুশাসন, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হয় বর্তমানে সংস্কৃতির নামে চলমান অনেক অশ্লীলতা, জঘন্যতা ও বীভৎসতার আবর্জনাকে। আর এক শ্রেণীর পোকা যে ময়লার স্তুপ ত্যাগ করলে মরে যায়, তাতো সকলেরই জানা কথা।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম দুনিয়ার সকল জনগোষ্ঠীর সকল মৌল সত্যের সমষ্টি। তার সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন, সর্বজনীন ও সুদূরপ্রসারী। দুনিয়ার অন্য যেসব সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক উপাদান তার মৌল ভাবধারার অনুকূল, তা সবই সে গ্রহণ করে নেয়। বস্তুত যে সংস্কৃতিতে ইসলাম-বিরোধী উপাদান ও উপকরণ রয়েছে, তা-ই সুস্পষ্টভাবে মানবতা বিরোধী, তার সাথে ইসলামের রয়েছে চিরন্তন সংঘর্ষ। ইসলামী সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ দান কোন সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ নয়। তাতে বরং সমগ্র মানব কল্যাণকর সংস্কৃতিই সংরক্ষিত হয় এবং তাতে করেই সমস্ত তামাদ্দুনিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সম্ভব হতে পারে।

ইসলামী সংস্কৃতি গ্রীক সংস্কৃতি নয়–নয় তা পারসিক সংস্কৃতি। কাজেই গ্রীক বা পারসিক সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে না। ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী মতাদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠেছে। আল্লাহ্‌র কালাম কুর'আন মাজীদেই এ মতাদর্শের বিস্তারিত রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছে এবং নবী কারীম (স.) এর মহান জীবন ও শিক্ষায় তা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে।[১]

প্রতিটি জাতীয় সংস্কৃতি তার নিজস্ব পরিবেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটা বিশেষ দেশের সীমারেখার মধ্যে জীবন যাপনকারী লোকদের উত্তরাধিকারই হয় সেই দেশের সংস্কৃতি। কিন্তু ইসলাম বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ। সমগ্র মানব বংশের প্রতিই তার সমান আহবান। কোন বিশেষ জাতি, বংশ গোত্র, সম্প্রদায় বা ব্যক্তির প্রতি তার কোন পক্ষপাত নেই; তার দৃষ্টিকোণ বিশাল, বিস্তীর্ণ, ব্যাপক ও সার্বিক। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ওপরই তার লক্ষ্য নিবদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা ব্যক্তিগত ও বংশীয় বিশেষত্বের উৎকর্ষ বিধানের জন্যে চেষ্টা-সাধনা চালাতে যথেষ্ঠ উৎসাহ প্রদান করে। আর তার ফলে যে সাংস্কৃতিক ফসল পাওয়া যায়, তার প্রতি তার নেই কোন অনীহা।[২]

একালে শিল্পকলা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর সীমাহীন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং এগুলোর ওপর পূজা-উপাসনার মতোই সংবেদনশীলতার এক মোহময় আবরণ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের বাড়াবাড়ি দেখে যে কোন ঈমানদার ব্যক্তি বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এ বিষয়গুলো সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা হঠাৎ ঘটে-যাওয়ার বিপ্লব রূপে গণ্য হতে পারে কিংবা তাদের জন্যে তা জীবনের একটা লক্ষ্য হতে পারে হয়ত-বা। কিন্তু মুসলিমরা একে জীবন লক্ষ্য রূপে গণ্য করতে পারে না। তবে এসব সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প পর্যায়ের কীর্তিসমূহের প্রতি মুসলিমদের মনে কিছুমাত্র অনীহা অথবা ঘৃণা রয়েছে তাও মনে করার কোন কারণ নেই।

মুসলিমারা এগুলোকে আল্লাহ্‌র অনুদানসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে এবং নিছক একটা সহায়ক ও বিনোদনমূলক উপাদানই মনে করে। অথবা এগুলো হচ্ছে পথিকের চলার পথের সহজাত আয়েশ ও বিশ্রাম লাভের উপকরণ মাত্র, নিজেই কোন লক্ষ্য বা মানজিল নয়। বড়জোর এগুলো উদ্দেশ্য লাভের ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে সাহায্যকারী মাত্র। মুসলিমরা এই সাহায্যে ও আরাম-আয়েশের পূজারী আদৌ নয়। এ ধরনের কাব্য-সাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্পকলামূলক দুর্লভ সম্পদকে দুটি দিক দিয়ে সাহায্যকারী ও বিনোদনমূলক পর্যায়ে বিভক্ত করা

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

যায়। বিশেষত কাব্য-সাহিত্য ও স্থাপত্যশিল্প উভয় দিকেই গণ্য হতে পারে; তা যেমন সাহায্যকারী তেমনি বিনোদনমূলকও। সমাজবদ্ধ মানব-সমষ্টির মধ্যে মুসলিম জাতির লক্ষ্য, পথ-প্রদর্শক ও আলোক-বর্তিকা এক ও অভিন্ন। আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ তাদের চূড়ান্ত জীবন লক্ষ্য।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) তাদের পথ-প্রদর্শক। তাদের অগ্রগতি সাধিত হয় আল্লাহ্‌র কালাম কুর'আন মাজীদের নিষ্কলংক আলোকের দিগন্তপ্লাবী উজ্জ্বলতায়। ফলে তাঁর (কুর'আনের) উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থার প্রতিফলনে যে সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির উন্মেষ ঘটে কেবলমাত্র তা-ই হতে পারে ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলিম নামধারী লোকেরা অতীতে কোন এক সময় যে সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিল অথবা ভিন্নতর আদর্শানুসারী জীবন যাত্রার ফলে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, ইসলামী সংস্কৃতি বলতে তা বুঝায় না কখনো। ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব-মানবতার সার্বিক ও সামষ্টিক কল্যাণ।

মানবতার কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধনই ইসলামের ঐকান্তিক চেষ্টা। ইসলাম মানুষের মন-মগজ ও যোগ্যতা-প্রতিভাকে এরই সাহায্যে পরিচ্ছন্ন ও পরিপুষ্ট করে তুলতে সচেষ্ট। এই বিকাশমান ধারাবাহিকতায় এমন কোন পরিবর্তন বা পর্যায় যদি এসে পড়ে, যা কুর'আন মাজীদ বা রাসূলের সুন্নাহ অনুমোদিত নয়, তাহলে বুঝতে হবে, সে পরিবর্তন বা পর্যায় ইসলামের মধ্য থেকে সূচিত হয়নি, তার উৎস রয়েছে বাইরে। তাই তা ইসলামী আদর্শানুসারী জীবন-ধারার পরিণতি বা প্রতিফলন নয় এবং সে কারণে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী লোকেরা তা গ্রহণও করতে পারে না–তা বরদাশত করে নেয়াও তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা তার পরিণতিতে মুসলিম জনতা সার্বিকভাবে ধ্বংস, বিপর্যয় ও সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।

শিল্পকলা নামে পরিচিত একালের মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মানসহ কয়েক ধরনের সৃষ্টিকর্ম ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। কেননা মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে যে প্রতিমা পূজা ও মুশরিকী ভাবধারা নিহিত মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ তারই চরিতার্থতা ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রথমটির সঙ্গে রয়েছে দ্বিতীয়টির পূর্ণ সাদৃশ্য। এ কারণে শিল্পকলার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদিকে নির্মল করে তোলা মানব জাতির উৎকর্ষ ও কল্যাণ সাধনের জন্যে অপরিহার্য। এই দুনিয়ার জীবনকে কেবলমাত্র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, রূপ-শোভামন্ডিত ও চোখ ঝলসানো চাকচিক্যে সমুজ্জল করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হতে পারে না। মানব জীবনকে ধন্য ও সুসমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে ইসলামী সংস্কৃতি অবলম্বিত পথ ও পন্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর।

সংস্কৃতির কোন কোন উচ্চতর নির্দশন ও প্রতীক, তা যতই উন্নত মানসম্পন্ন হোক, পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল সংস্কৃতির দর্পন হতে পারে না। কতিপয় ব্যক্তি এইরূপ সৃষ্টিকর্ম অধিকাংশ লোকের মহৎ কীর্তি রূপে গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কেননা তাদের প্রধান অংশই পশ্চাদপদ, দীন-হীন নিম্নমানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। অতএব, কথিত শিল্পকর্মকে অধিকাংশ লোকের মহৎ কীর্তি নয়; বরং হীন মন মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ রূপে গণ্য করতে হবে।

পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকায় একটা প্রশ্ন নিয়ে যথেষ্ট বাগ্-বিতন্ডা চলেছিল। প্রশ্নটি ছিল এই, একটি কক্ষে যদি একটি নিষ্পাপ শিশু থাকে আর সেখানেই এক মূল্যবান, দুর্লভ ও অন্যান্য গ্রীক ভাস্কর্য প্রতিমা থাকে আর হঠাৎ কক্ষটিতে আগুন ধরে যায় এবং সে আগুন গোটা কক্ষটিকে গ্রাস করে ফেলে আর সময়ও এতটা সামান্য থাকে যে, তখন হয় শিশুটিকে রক্ষা করা যেতে পারে, না হয়

Dhaka University Institutional Repository

ভাষ্কর্যের নিদর্শনটি, এ দুটির মধ্যে কোনটিকে বাঁচানোর জন্যে চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়–মানব শিশুটিকে কিংবা ভাষ্কর্য শিল্পটিকে ? এই প্রশ্নটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর জনগণ যে জবাব দিয়েছিল তা ছিল মানব শিশুটির পরিবর্তে ভাষ্কর্যটিকে রক্ষা করার পক্ষে। এটা ছিল মানব শিশুটির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন এবং শিল্পকলার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই জনমতকে কি কোনক্রমে বিবেকসম্মত ও যথার্থ বলে মেনে নেয়া যায় ? তা যায়না।[১] কারণ:

১. যে শিশুটিকে একটা নিস্প্রাণ-নির্জীব প্রস্তর মূর্তিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জ্বলে-পুড়ে মরার জন্য ছেড়ে দেয়া হল একদিন সমাজের এক বিরাট কল্যাণ সাধন করতে পারতো হয়ত-বা। আর সে জীবনে বেঁচে থেকে প্রস্তর মূর্তির চাইতেও অনেক অনেক বেশী মূল্যবান ও দুর্লভ জিনিস সৃষ্টির কারণ হতে পারত।

২. সে প্রস্তর মূর্তিটি একটা বিরাট ও উত্যুঙ্গ সভ্যতার খুবই ক্ষুদ্র ও নগণ্য অংশ মাত্র। সেটি জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলে মানবতার এমন কি ক্ষতি সাধিত হতো ? কিছুই না।

৩. নৈতিক মূল্যমানের দৃষ্টিতে এ প্রস্তর মূতির্টি নিতান্তই গুরুত্বহীন একটি বস্তু, অথচ সংস্কৃতিতে নৈতিক মূল্যমানের ভূমিকা অত্যন্ত প্রকট ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য ঘটনায় দেখা গেল, মানুষের তুলনায় প্রস্তর মূর্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর প্রস্তর মূর্তির তুলনায় মানুষ অতীব তুচ্ছ-মূল্যহীন! পাশ্চাত্য সুধীদের এই মনোভাবের ফলে মূর্তি পূজার একটা নবতর সংস্করণ প্রসার ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ অবস্থা অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয়। ইসলাম মানবতার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে কাজ করে। মানুষের কোন মূল্যবান শিল্পকর্মের জন্যে একটা মহামূল্য মানব সন্তানের জীবন উৎসর্গ করা ইসলামের ধারণাতীত। মানুষের দুর্লভ কীর্তির প্রতি এই আসক্তি ও ভক্তি কার্যত আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যখন নিজের চিন্তা-বিশ্বাসকে খোদায়ী বিধান হতে স্বতন্ত্র ও নিঃসম্পর্ক করে নেয়, তখন তার ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি সীমাহীন হয়ে যায়। তখন চূড়ান্ত ধ্বংসই হয় তার অনিবার্য পরিণতি। এই দৃষ্টিকোণের ধারকরা বলেন, শিল্প-সৌন্দর্য ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। প্রাচীন মানব সভ্যতা পতনোম্মুখ। একারণেই ভাষ্কর্যের নিদর্শনটিকে রক্ষা করা অপরিহার্য। কেননা অতীতের দুর্লভ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু এইটুকু যুক্তিতে মানুষের সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে মূল্যহীন ভাবাকে কোন মানুষই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে না।

ইসলামের কল্যাণমূলক দৃষ্টিকোণ ব্যক্তির অন্তরে একদিকে শুভেচ্ছা ও শুভাকাঙ্খা এবং অন্যদিকে অনুতাপ ও তিরস্কারের ভাব জাগ্রত করে আর এটাই হচ্ছে সাফল্য ও সার্থকতা লাভের প্রধান উপায়। যাকাতের মাধ্যমে এই চেতনা কার্যকর হয় মূলধনের হ্রাস-প্রাপ্তির ফলে আর তার ফলেই মূলধন পবিত্র ও ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে। ইসলাম জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে সমানভাবে পরিব্যাপ্ত। তাতে ধর্মচর্চা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পার্থক্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রগতিই ইসলামের কাম্য। এখানে শুধু ভালো ও মন্দ তথা কল্যাণ ও অকল্যাণের পার্থক্যই স্বীকৃত। বৈরাগ্যবাদ বা দুনিয়াত্যাগের কোন অনুমতি বা অবকাশ ইসলামে নেই।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে বহুমূখী কর্তব্য ও দায়িত্ব। সফল ও সার্থক কার্যাবলী সংঘটিত হয় সে সব সমর্পিত কর্মক্ষমতার দরুন, যা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি দ্বীনের সর্বাত্মক নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা বাস্তব, অবিমিশ্র ও সারবত্তাপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী ব্যবস্থা, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তা অবশ্য অনুসরণীয়। কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহের সময়টুকুতে তার অনুসরণ নিতান্তই অর্থহীন।

ফরাসী ও রুশ বিপ্লবে আল্লাহ্র কোন স্থান স্বীকৃত নয়। গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ হল বৈষয়িক জীবন ও রাজনীতিতে আল্লাহ্র কোন অংশ নেই। কিন্তু এ বিশ্বলোকে এবং মানব সমাজে প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি নিমিষে এমন অসংখ্য ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছে, যে বিষয়ে কোন ভবিষ্যৎবাণী কোন মানুষ করতে সক্ষম নয়–তা কাঙ্খিত বা প্রার্থিতও নয়। এ ধরনের ঘটনাবলীর আকস্মিক আত্মপ্রকাশ মানুষের সব পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনাকে চুরমার করে দেয়–ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয় তার সব স্বপ্ন-সাধ। কিন্তু আল্লাহ্কে বা আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করে সে সবের কি ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে ?[১]

মধ্যযুগীয় ধর্মচর্চা হচ্ছে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর গল্প-কাহিনী, রসম-রেওয়াজ, উপাসন-আরাধনা ও উপাসনালয়-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানাদি সমন্বিত। জগতের রুঢ় বাস্তবতা, বৈষয়িক তৎপরতা ও ব্যতিব্যস্ততা থেকে পলায়নের পথ হিসেবেই তা অবলম্বিত হতো। সেকালে লোকদের অভিমত ছিল, বাস্তব জীবনকে অবশ্যই ধর্মহীন বা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হতে হবে। আর কৃচ্ছসাধক ও একনিষ্ঠ পূজারীদের তা-ই হচ্ছে রক্তিম স্বপনের পরাকাষ্ঠা। এ দৃষ্টিকোণের মারাত্মক প্রভাব আজ দুনিয়ার সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত। হীন স্বার্থের কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে মানুষ আজ সমাজের সাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করেছে। ক্ষমতাবানরা মানুষের মৌলিক ও বৈধ অধিকার হরণ করেছে নিষ্ঠুরভাবে। জনগনের রক্ত পানি করে উপার্জন করা বিত্ত-বৈভবের ওপর চলেছে নির্মম লুটপাটের পৈশাচিকতা। সব দুষ্কর্মের পশ্চাতে ব্যক্তি-স্বার্থই ছিল প্রধান নিয়ামক। কিন্তু যারা ভালো মানুষ, সত্যই তারা ব্যক্তি-স্বার্থকে সামষ্টিক স্বার্থের জন্যে উৎসর্গ করে। কেননা তাতেই নিহিত রয়েছে মানবতার বৃহত্তর কল্যাণ ও সাফল্য। ব্যক্তিবাদের ওপর সমষ্টিবাদের প্রাধান্য এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ হচ্ছে চরম লক্ষ্যের নিকটবর্তী পর্যায়। নৈতিক ভিত্তিসমূহ তখন হয় পাকা-পোক্ত, অবিচল ও অনড়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনী ও নিত্য-নব উদঘাটন তার ভিত্তিমূলের ওপর কোন প্রতিকূল প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

মোটকথা, ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে দ্বীনীভিত্তিক। এই দ্বীনী ভাবধারাই তার প্রাণ-শক্তি ও আসল নিয়ামক। দ্বীনী ভাবধারাশূণ্য সংস্কৃতি কখনও ইসলামী পদবাচ্য হতে পারে না। হতে পারে অন্য কিছু। এখানে প্রতিটি কাজ, পদক্ষেপ বা অনুষ্ঠানের বৈধতা দ্বীন ইসলাম থেকে গ্রহণীয়। কেননা তা আল্লাহ্র দেয়া বিধি-বিধান ও নিদের্শনার সমষ্টি। জীবনের প্রতিটি বাকে, প্রতিটি স্তরে ও প্রতিটি চড়াই-উৎরাইয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পথিকের যাত্রা সুগম করে ও তাকে অগ্রগমনের প্রেরণা দেয়। বিশ্বনবীর বাস্তব জীবনে ও কর্ম-ধারায় তা পূর্ণমাত্রার প্রতিফলিত। তাতে স্পষ্টত প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি নিছক কতকগুলো আকীদা-বিশ্বাসেরই সমষ্টি নয়। বাস্তব

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম সম্পাদনই তার আসল কথা আর জাতীয় সাফল্য ও সার্থকতা লাভ কেবলমাত্র এভাবেই সম্ভবপর।

ইসলামী সংস্কৃতি ও মানব জীবনে তার কার্যকারিতা উপলব্ধি করার জন্যে আরও একটা দিক দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কুর'আন মাজীদে তাযকিয়া শব্দটি বহুল-ব্যবহৃত। ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার ভাষায় ঐ শব্দটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য আমাদের ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রকৃত ধারণা (conception) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তিনি বলেছেন: 'তায্কিয়া' অর্থ পবিত্র হওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ করা, অন্যায় ও কদর্যতা পরিহার করে চলা, যার ফলে আত্মার শ্রীবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রাচুর্য সাধিত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন:

قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها

"নিসন্দেহে মানুষের মধ্যে সেই সফলকাম যে (পাপ থেকে দূরে থেকে) নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে, আর যে (ব্যক্তি পাপে নিমাজ্জত হয়ে) নিজেকে কলুষিত করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।"[১]

একারণে যাকাত শব্দের অর্থ কখনও বলা হয় প্রবৃদ্ধি, আধিক্য বা প্রাচুর্য আর কখনও করা হয় পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও ময়লা আবর্জনা দূর করা। কিন্তু সত্য কথা হল যাকাত শব্দে এ দুটি অর্থেরই সমন্বয় ঘটেছে। অন্যায় ও ময়লা দূর করা যেমন এর অর্থ তেমনি কল্যাণ ও মঙ্গল বৃদ্ধি করাও এর মধ্যে শামিল। এ ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়: কুর'আনে যে 'তায্কিয়ায়ে নফস' (আত্মশুদ্ধি) এর কথা বলা হয়েছে, তাতে এক সঙ্গে কয়েকটি কথা নিহিত রয়েছে :

১. তায্কিয়ার আসল অর্থ মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতি বিধান করা, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-যোগ্যতা ও কর্ম-ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ–উচ্চকিত করা, সতেজ বা ঝালাই করা, ময়লা-আবর্জনা-দুর্বলতা ও পংকিলতামুক্ত করা এবং তাকে পূর্ণ পরিণত করে তোলা। দেহ ও আত্মা, মন ও মগজ, স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণের যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্যের দরুন জীবন পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে,পারে সফল ও সার্থক হতে, তা অর্জনের সঠিক চেষ্টা-সাধনাই আত্মার তায্কিয়া। আর ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্যও তা-ই।

২। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার মানে সর্বপ্রকারের অন্যায়, অশ্লীলতা ও পংকিলতা থেকে তাকে মুক্ত ও পবিত্রকরণ (Purification) । কেননা এছাড়া জীবনের সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন অসম্ভব। বাস্তবতার দৃষ্টিতেও জিনিসটি জীবনের শোভা-সৌন্দর্য, বিশেষত্ব ও মহিমা-মাহাত্ম্য অর্জনের আগেই অর্জিত হওয়া উচিত। পবিত্রকরণ ও সংস্কার সাধন জীবনের 'তায্কিয়া' ও পূর্ণতা বিধানের প্রাথমিক কাজ। এইসব কারণে অনেক সময় পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকরণ এবং সংস্কার সাধনের অর্থেও ব্যবহৃত হয় এই তায্কিয়া শব্দ।

এখানে নফসের বা আত্মার তায্কিয়া বলে যা কিছু বোঝাতে চাওয়া হয়েছে তাতে কেবল মানব জীবনের খারাপ দিকের তায্কিয়া বা পবিত্র-পরিচ্ছন্নকরণই লক্ষ্য নয়–বরং সমগ্র মানব সত্তাই এর ক্ষেত্র। মহান রাব্বুল আলামীনের ভাষায় :

---

১. *আল কুর'আন*, ৯১: ০৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

ونفس وماسواها فا لهمها فجورها وتقواها --قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها -

"মানব প্রকৃতি এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি সুবিন্যস্ত করেছেন,অত:পর তার পাপাচার ও তার সতর্কতা (তাকওয়া) তার পতি ইলহাম করেছেন। নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল আর ব্যর্থ হল সে, যে তাকে খর্ব ও কলুষিত করল।"[১]

এ আয়াতে মানুষের গোটা সত্তাকেই সামনে রাখা হয়েছে। এ পর্যায়ে অন্যান্য আয়াতেও মানুষের সমগ্র সত্তার পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সংস্কার সাধন এবং উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা বিধান অর্থেই এ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

৩। আত্মার তায্কিয়া সম্পর্কে কুর'আন যে ধারণা পেশ করেছে, তা হল Self-perfection-এর ধারণা। এর ভিত্তি দুটি জিনিসের ওপর সংস্থাপিত। একটি হচ্ছে মানুষের রুহ বা আত্মা তথা মন ও মগজের সমস্ত শক্তির একটা সমন্বিত ও সুসংহত রূপ। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতার সর্বোত্তম ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর নিদর্শনরূপে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টিকর্মে মানুষের নানাবিধ যোগ্যতা ও প্রবণতায় এক উচ্চ মানের ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে। এ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সত্তার আত্মা ও বস্তু, জ্ঞান ও বিবেক, বাহির ও ভিতরের মাঝে আল্লাহ্ কোন বিরোধ বা বৈষম্যকে স্বীকার করেন না। এসবের মাঝে গুরুত্বের দিক দিয়ে শ্রেণী-পার্থক্য রয়েছে বটে; কিন্তু সে শ্রেণীগুলোর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ স্বীকৃত নয়। একটির উৎকর্ষের জন্যে অপরটিকে অবলুপ্ত করা বা অবদমন (Suppression) করা জরুরী নয়; বরং একটির পূর্ণত্ব অপরটির উন্নয়নের জন্যে পরিপূরক। এ জন্যেই কুর'আনের শিক্ষা হল এই কামনা করা :

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقناعذاب النار-

"হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গল দাও এই দুনিয়ায় এবং পরকালেও আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও।"[২]

দ্বিতীয় বিষয় হল, মানুষের সমগ্র সত্তার যুগপৎ উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য এবং কাম্য। এ সত্তার প্রতিটি অংশই মহামূল্যবান এবং তার সংস্কার, সংশোধন, পরিশুদ্ধকরণ, পুনর্গঠন ও উন্নয়নই বাঞ্ছনীয়। দৈহিক উন্নতি এবং নৈতিক ও আত্মিক পূর্ণত্ব- এর প্রতিটিই নিজ নিজ সীমার মাঝে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও চিন্তা মন, মগজ, চরিত্র ও স্বভাব, সৌন্দর্যপ্রীতি ও সুরুচি-প্রবণতা এবং দেহ ও মনের সব দাবির ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুসামঞ্জস সংস্কার সাধন ও পূর্ণত্ব বিধানকেই বলা হয় 'তায্কিয়া' এবং তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি। মনের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে দৈহিক সীমা লংঘন কিংবা দৈহিক চাহিদা পূরণে মনের তাকীদ উপক্ষো করা ইসলামের সংস্কৃতি চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু কোন বিশেষ মুহূর্তে এ দুটির মাঝে তারতম্য করা যদি অপরিহার্যই হয়ে

১. *আল কুর'আন*, ৯১: ৭-১০

২. *আল কুর'আন*, ০২: ২০১

পড়ে তাহলে দেহের পরিবর্তে মনের গুরুত্ব–বস্তুর তুলনায় আত্মার এবং প্রস্তর বা ভাস্কর্য অপেক্ষা মানুষের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।[১]

মোটকথা, কুর'আনের যেসব স্থান 'তায্কিয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব স্থানে সংস্কৃতি শব্দ বসিয়ে দিলে যেরূপ দাঁড়ায় ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণে তা-ই বক্তব্য। অন্য কথায়, কুর'আনের 'তায্কিয়া শব্দের যে ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হল তা-ই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামী সংস্কৃতির মৌল ভাবধারা।

১. সংস্কৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় ইদানীং 'অপসংস্কৃতি' বলে একটি শব্দের ব্যাবহার প্রায় লক্ষ্য করা যায়। এর সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুবই মুশকিল। তবে সংস্কৃতি নামে যাকিছু মানুষের সুস্থ চিন্তা-ভাবনা, নৈতিকতা, রুচিবোধ, শালীনতা ইত্যাদিকে কলুষিত করে তাকেই অমরা অপসংস্কৃতি বলতে পারি। উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এজন্যেই তা এক আপোষহীন দ্বীন নামে অভিহিত। তার নির্দিষ্ট সীমা বা পরিমন্ডলের ভেতর মানুষ নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে। ইসলামের নির্ধারিত এ সীমা অপরিবর্তনীয় চিরন্তন ও শাশ্বত সত্যের ধারক। বিশ্বলোকের চিরন্তন মূল্যমানের উৎস যে খোদায়ী গুণাবলী তা ইসলামের সীমার মধ্যে নিজের আয়ত্তাধীন করে নিতে প্রত্যেক ব্যক্তিই সক্ষম হতে পারে।

ইসলামী বিধানের অধীনে ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন শৃংখলা (Discipline) ও নিয়মানুবর্তিতার সৃষ্টি হয়, যার দরুন খোদায়ী গুণাবলীর আনুপাতিক প্রতিফলন হওয়া সম্ভবপর। ইসলামের পরিভাষায় একেই বলা হয় ই'তিদাল– ভারসম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। সেখানে ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন যোগ্যতার উদ্ভব হয়, যার ফলে প্রকৃতি বিজয়ের সুফলকে বিশ্বমানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভবপর হয়। ইসলামের উপস্থাপিত বিশ্বভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার এককত্ব ও অনন্যতা এবং জাতীয় সংহতি ও অখন্ডতার সুদৃঢ় ধারণা এমন এক একাত্মতা ও অভিন্নতার সৃষ্টি করে যার দরুন মানব সমাজের বাধ্যবাধকতা নিঃশেষে দূরীভূত হয়ে যায়। এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের জন্যে জীবিত থাকে বিধায় সমস্ত ব্যক্তির জীবন-প্রয়োজন স্বতঃই পূর্ণ হতে থাকে।

মানবজাতির জীবনযাপনের যে বিধি ব্যবস্থা ইসলাম দিয়েছে তার ব্যবহারিক দিক হলো ইসলামী সংস্কৃতি। একে মনীষীগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন:-

১. দার্শনিক আবুল হাশিম ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : "মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের ইসলামী নীতি, আদর্শ ও শিক্ষাসম্মত উৎকর্ষসাধন পদ্ধতি এবং ব্যবহারিক জীবনে তার বাস্তবরূপ হল ইসলামী সংস্কৃতি।"[১]

২. ড. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম এর মতানুসারে : "ইসলামী জীবনদর্শন ও ইসলামী জীবন বিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয় তাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে।"[২]

৩. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : "ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। পবিত্র কুর'আন এবং সুন্নাহ্ই হলো এর ভিত্তি। কুর'আন সুন্নাহ্র ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক কোন সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতাবিরোধী সব কিছুই অপসংস্কৃতি।"[৩]

৪. বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আবদুল মান্নান তালিব ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলেন : "ইসলামী জীবন চর্চাই ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলিমরা যেভাবে তাদের জীবন গড়ে তোলে ইসলামী

---

১. অধ্যাপক ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২. ড. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৩. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামী সংস্কৃতি*, জতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্বারক (ঢাকা: জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০৪ খ্রী.), পৃ. ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি ঠিক তেমনি রূপ লাভ করে। তারা যখন পুরো পুরি ইসলাম তথা ইসলামী বিধান মেনে চলে তখন তারা পূর্ণ ইসলামী জীবন-যাপন করে।"[১]

৫. আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়ে বলেন : "ইসলামী সংস্কৃতি এক কিতাব ও এক রসূলের প্রতি ঈমান, তাঁরই আনুগত্য-অনুসরণ, তাঁরই গড়া ছাঁচে মানসিকতার পুনর্গঠন, সেই এক উৎস থেকে গোটা আকীদা, ইবাদাত, নৈতিকতা, লেনদেন ও সামাজিক বিধানের উৎসারণ এবং সেই ঈমান, আনুগত্য ও অনুসরণের সূত্রে গোটা মুসলিম সমাজের সংযুক্তিকরণই ইসলামকে একটি স্থায়ী সংস্কৃতি এবং সকল প্রকার বংশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও ভৌগলিক পার্থক্য সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে একটি জাতিতে পরিণত করে।"[২]

৬. মাওলানা মওদূদী আরো বলেন : "ইসলামী সংস্কৃতি কোন জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি... ... ... এ সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী এক উদার জাতীয়তা গঠন করে। যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হবার মতো অনন্য যোগ্যতা। সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সাথে সাথে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রচন্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী বন্ধন। এ সংস্কৃতি নিজের অনুবর্তীদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইনের অনুগত করে তোলে।"[৩]

৭. বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব মুহতারাম আবদুস শহীদ নাসিম ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন : "সংস্কৃতি তো মানুষের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করে, প্রকাশ করে তার অভ্যন্তরীণ ভাবধারাগত অবস্থা। তাই ইসলাম মানুষের মধ্যে যে মানসিক অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ ভাবধারা সৃষ্টি করে তারই প্রেক্ষিতে ব্যক্তি যে আচরণ করে তাই হলো ইসলামী সংস্কৃতি।"[৪]

৮. বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এ.কে.এম.নাজির আহমদ এর মতে, "ইসলামী শারীয়া অনুমোদিত সকল কর্মকান্ড ইসলামী মূল্যবোধের নিরিখে সর্বোত্তমরূপে সম্পাদনের নাম ইহসান। এই ইহসানই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।"[৫]

৯. কেউ কেউ বলেন : " দুনিয়া ও দ্বীনের এক মহোত্তম সমন্বয় হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। এটি একটি ব্যপকতর জীবনব্যবস্থা । মানুষের চিন্তা, স্বভাব, আচরণ, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং সভ্যতা ও সৌজন্যবোধের উপর এটা বিস্তৃত। এ সকল বিষয়েই আল্লাহ্ নির্ধারিত আইন রয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতি এ আইনের সমষ্টি। সহজ ভাষায় ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে মুসলিম জাতির জীবনপদ্ধতি, যা কুর'আন-সুন্নাহ্র আলোকে নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়।"[৬]

---

১. আবদুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১ খ্রী.), পৃ. ৯৫

২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা*, অনুবাদ: মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (ঢাক: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ১৭৬

৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭- ৮

৪. অবদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭ খ্রী.), পৃ. ১৯

৫. এ.কে.এম.নাজির আহমদ, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৩৪

৬. অধ্যাপক ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর ভিত্তিতে এ কথা দিবালোকের মতো প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী জীবন বিধান কতৃক নিয়ন্ত্রিত ও ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত মনব জাতির জীবন পদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।

বস্তুত ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন। এতে মানুষের মানবিক বৃত্তিসমূহের পরিচর্যার দ্বারা এ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে মানুষের বাস্তবজীবন ও প্রাসঙ্গিক পরিবেশে যে সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। অর্থাৎ ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধ সক্রিয় থাকে।

কাজেই প্রতীয়মান হয় যে সংস্কৃতি শিক্ষা-সাধনায়, সাহিত্য-স্থাপত্যে,চিত্র-ভাস্কর্যে, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক,অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে ইসলামী নীতি, আদর্শ ও মননশীলতাকে লালন করে– ব্যপকার্থে তাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাওহীদ। তাওহীদ বা একত্ববাদ বলতে বুঝায় আল্লাহ্ তা'আলার নিরঙ্কুশ এককত্বের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। তাওহীদ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করে। ইতিবাচক ধারণা এই যে, বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি এক ও একক। আর নেতিবাচক ধারণা এই যে, তাঁর মতো কেউ নেই–কিছু নেই; কেউ হতে পারে না তাঁর সমতুল্য। গোটা বিশ্বলোকে তিনি একক ইখতিয়ারসম্পন্ন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী সত্তা। তিনি যা ইচছা তা-ই করতে পারেন; যা ইচ্ছা তারই ফয়সালা করেন–আদেশ ও নির্দেশ দেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদের ধারণা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। 'ইলাহ' হিসেবেও তিনি এক ও একক । তিনি ছাড়া আর কেউ 'ইলাহ' নয় এবং 'ইলাহ' হওয়ার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য কেবল এককভাবে তাঁরই জন্যে শোভনীয়–তাঁর সত্তায়ই নিহিত। মহান আল্লাহ্ বলেন :

قل هو الله احد -الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

"(হে মুহাম্মদ,) তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ্, তিনি একক, তিনি কারোই মুখাপেক্ষী নন, তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি, আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই।"[১]

স্রষ্টা বা আল্লাহ্কে 'এক' বলে জানার ও মানার কথা অন্যান্য ধর্মে ও সংস্কৃতিতে স্বীকৃত হলেও তাতে রয়েছে অসংখ্য ভুল ও ভ্রান্তি। কেউ তাকে একটি শক্তিমাত্র মনে করেছে। কেউ মনে করেছে প্রথম কার্যকরণ (First cause of causes)। কেউ তাঁর সাথে বংশধারাকে সংযোজিত করেছে। কেউ কেউ আবার তাঁকে আকার–আকৃতি বিশিষ্ট মনে করেছে। কিন্তু ইসলামের তওহীদী ধারণা এ সব কলুষতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। ইসলামের খোদা পবিত্র ও মহান সত্তার অধিকারী। তাঁর সত্তা যাবতীয় মহৎ গুণে বিভুষিত। তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন, সবকিছু বরং তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি সর্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর রহমত সর্বব্যাপক। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজয়ী। তাঁর হিকমত ও সুবিচার নীতিতে কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি নেই। তিনিই জীবনদাতা ও জীবন সামগ্রীর একমাত্র পরিবেশক। ক্ষতি ও কল্যাণের যাবতীয় শক্তি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও পুরস্কার তাঁরই ইখতিয়ারভুক্ত। তিনিই চিরন্তন মা'বুদ, অবিনশ্বর ইলাহ। পূর্ণত্বের সব গুণ তাঁরই সত্তায় নিহিত। তাঁর কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যে নেই একবিন্দু দোষ-ত্রুটি। বস্তুত খোদা সম্পর্কে এ ধারণা অত্যন্ত ইতিবাচক। এরই পাশাপাশি নেতিবাচক ধারণাও। অথার্ৎ খোদার এ মহৎ গুণাবলী খোদা ছাড়া আর কারোর মধ্যে নেই। খোদা সম্পর্কে যা কিছু বলা হল, তা আর কারোর সম্পর্কেই বলা যেতে পারে না। বিশ্বলোকের অন্য কোন শক্তি বা সত্তা এই গুণাবলীর অধিকারী নয়। এ কারণে অপর কেউই, কোন কিছুই 'ইলাহ' হতে পারে না।

---

১. *আল কুর'আন*, ১১২: ০১-০৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের তাওহীদী ধারণার পূর্ণতার একটি অপরিহার্য দিক হল নবুয়্যাত বা রিসালাতে বিশ্বাস। তাওহীদী ধারণায় আল্লাহ্-ই যেহেতু সর্ব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণকারী,একমাত্র বিধানদাতা, তাই মানুষের নিকট তাঁর বিধান পৌঁছানোর মাধ্যম হল এই রিসালাত বা নবুয়্যাত । এ জন্যে মানব সমাজের মধ্য হতেই এক এক ব্যক্তিকে তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী বাছাই করে নেন এবং এ কাজ সম্পাদনের জন্যে মনোনীত করেন। মানুষের ইতিহাসে এ ধরনের বহু মনোনীত পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে এ দুনিয়ায়। এদের মধ্যে সর্বশেষ ও পূর্ণ-পরিণত ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (স.)। তিনি কিয়ামত অবধি সমস্ত মানুষের জন্যে রাসূল। মহান আল্লাহ্ বলেন :

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين -وكان الله بكل شيئ عليما

"হে মানুষ ! (তোমরা জেনে রেখো), মুহাম্মদ (স.) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনে হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল এবং নবীদের সীলমোহর (শেষ নবী), আর আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে অবগত রয়েছেন।"[১]

বস্তুত নবুয়্যাত ও রিসালাত মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। মানুষের জীবনে যতটা প্রয়োজন খাদ্য ও পোশাকের, তার চাইতেও অধিক প্রয়োজন এই রিসালাতের। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে যে সব আইন বিধানের প্রয়োজন, তা সবই রিসালাতের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। আর এ সব আইন বিধানের ভিত্তিতে মানুষের জীবন যতটা উন্নত মানে চলতে পারে, ততটা উন্নত মান অপর কোন বিধানের সাহায্যেই অর্জিত হতে পারে না। এখন মানুষ যদি নবুয়্যাত বা রিসালাতকে গ্রহণ না করে তাহলে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-বিধান হয় সে নিজেই রচনা করবে, নচেত অপর কোন মানুষকে তা রচনার অধিকার দিতে হবে, কিংবা বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে বিভিন্ন পর্যায়ের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান রচনার দায়িত্ব অর্পন করতে হবে। অথবা প্রতিটি জন-সমাজ নতুন করে আইন-বিধান রচনার পরিবর্তে প্রচলিত রসম-রেওয়াজের আশ্রয়ে জীবন পরিচালিত করবে।

এছাড়া মানুষের সামনে অন্য কোন উপায় আছে কি?.... কিন্তু বর্ণিত উপায়সমূহ গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টত দেখা যাবে, এর কোন একটি উপায়ও মানুষকে নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত জ্ঞানের সন্ধান দিতে সমর্থ নয়। এ কারণে মানুষ তার সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে কোন সর্বজনীন, সর্বকালীন ও সর্ব মানুষের জন্যে কল্যাণকর বিধান রচনা করতে পারে না; তার (মানুষের) মানসিক যোগ্যতা সীমাবদ্ধতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে মানব-সমাজের বিভিন্ন অংশ চরম দুর্গতি ভোগ করে আসছে যুগ যুগ ধরে। দুনিয়ায় সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মূলে প্রধানত ও কারণটিই নিহিত।

এদিক থেকে বিবেচনা করলে মানুষকে শেষ পর্যন্ত মহান সৃষ্টিকর্তার দেয়া বিধানের নিকটই আত্মসমপর্ণ করতে হয়, এছাড়া আর কোনই উপায় নেই। ইসলামের দাবি হল, মানুষের মর্যাদা রক্ষা তথা সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন-যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন বিধান দানের অধিকার কেবল আল্লাহ্রই রয়েছে। রিসালাত হচ্ছে এ বিধান দানের একমাত্র মাধ্যম। রাসূল (স.) তার বিশেষ

---

১. *আল কুর'আন*, ৩৩: ৪০

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের যোগ্যতা-প্রতিভা ও খোদায়ী নিয়ন্ত্রন লাভের কারণে সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি আল্লাহ্‌র বিধানকে যথাযথভাবে পৌঁছানো ও তার বাস্তবায়নে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করেন। তাই আল্লাহ্‌র বিধান সঠিকভাবে লাভ করতে কোন অসুবিধে হয়নি। বস্তুত রাসূল (স.) এর উপস্থাপিত বিধানে সর্বশ্রেণীর মানুষের এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানূন বর্তমান। মানব-জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কেবলমাত্র এই রিসালাতে বিশ্বাসের সাহায্যেই সম্ভবপর।

রিসালাতে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাওহীদী আকীদার আর একটি অপরিহার্য দিক হল পরকালে বিশ্বাস। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক কাঠামোর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহীর সন্দেহাতীত বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা ও কর্মকে পবিত্র ও নির্দোষ করে তোলে। মানুষ এর তাকীদেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌-ভীতি ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। এক পরিপূর্ণ চিন্তা-ব্যবস্থা ও যুক্তিধারার ওপর ভিত্তিশীল হচ্ছে এই আকীদাটি। মানুষের নৈতিক সুস্থতার জন্যে এর মত প্রভাবশীল দৃঢ় ভিত্তি আর কিছুই হতে পারে না। এ আকীদার মূল কথা হল, মানুষ প্রতিটি বিষয়ের জন্যে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করবে। কোনরূপ বাহ্যিক চাপ, প্রলোভন ও লালসা ছাড়াই মনের ঐকান্তিক তাকীদে সে আল্লাহ্‌র বিধান পালন করে চলবে। এই হল পরকাল বিশ্বাসের লক্ষ্য। মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك -وبالاخرة هم يوقنون

"আর যারা তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনে এবং তোমার আগে (অন্য নবীদের ওপর) যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও তারা ঈমান আনে, (সর্বোপরি) তারা পরকালের ওপরও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।"[১]

ইসলামী সংস্কৃতি বিপুল কল্যাণবাহী। মানুষের কল্যাণ সাধনই হচ্ছে এর মূল লক্ষ্য। এ সংস্কৃতি ঐশী এবং অনন্যসাধারণ। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সাথে ইসলামী সংস্কৃতির সাযুজ্যতা প্রশ্নাতীত।

কুর'আন ভিত্তিক

ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণ কুর'আন ভিত্তিক। আল-কুর'আনে জীবন যাপনের যে বিধি ও নীতিমালা পেশ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে ইসলামী সংস্কৃতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। আল্লাহ্‌ বলেন :

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيئ وهدى وحمة وبشرى للمسلمين-

"আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা, সঠিক পথের দিশা, অনুগ্রহ এবং মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ।"[২]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবন ভিত্তিক

১. *আল কুর'আন*, ০২: ০৪

২. *আল কুর'আন*, ১৬: ৮৯

ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবহারিক রূপ হল রাসূলুললাহ (স.) এর জীবন। তাঁর মধ্যে সকল মানবিক গুণের পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন :

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة-

"নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে।"[১]

তাওহীদ ভিত্তিক

ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃত ভিত্তি হল তাওহীদ। আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, এবং ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য এক মাত্র সত্তা হিসেবে স্বীকার ও বিশ্বাস করাকেই তাওহীদ বলে। ইসলামী সংস্কৃতির নীতি, আদর্শ, দর্শন, সবকিছুই আবর্তিত হয় তাওহীদকে ঘিরে। মহান আল্লাহ্র ভাষায় :

ذالكم الله ربكم لااله الا هو خالق كل شيئ فاعبدوه وهو على كل شيئ وكيل

"এই হচ্ছেন তোমাদের মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, সবকিছুর (একক) স্রষ্টা তিনি, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। সব কিছুর উপর তিনি চুড়ান্ত তত্ত্বাবধায়ক ।"[২]

রিসালাত ভিত্তিক

নবী-রাসূলগণ কর্তৃক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের পবিত্র বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়াকে রিসালাত বলে। রিসালাতের সত্যতায় দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন এবং সর্বশেষ রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসরণের নীতিতে ইসলামী সংস্কৃতি আবর্তিত হয়। কুর'আন মাজিদে ঘোষিত হয়েছে :

لانفرق بين احد من رسله-

"আমি আল্লাহ্র রাসূলদের মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য করি না।"[৩]

আখিরাতমূখী

ইসলামী সংস্কৃতির সকল নীতি আদর্শ প্রণীত হয়েছে আখিরাতকে কেন্দ্র করে। ইহকালের পরের জীবনকে বলে আখিরাত বা পরকাল। মৃত্যুর পরই এ জীবনের শুরু। আল্লাহ্ বলেন :

وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا -

"আর পরকালতো নিশ্চয় মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠতম।"[৪]

---

১. *আল কুর'আন*, ৩৩: ২১

২. *আল কুর'আন*, ০৬: ১০২

৩. *আল কুর'আন*, ০২: ২৮৫

৪. *আল কুর'আন*, ১৭: ২১

Dhaka University Institutional Repository

ঈমান ভিত্তিক

ইসলামী সংস্কৃতির মূলে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, ক্ষমতা এবং আরো কিছু মৌলিক বিষয়ে ঈমান পোষণ। ঈমান ছাড়া কোন কাজই অর্থবহ হয় না। আল্লাহ্ বলেন :

تؤمنون بالله ورسوله-

"তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো।"[১]

বিশ্বজনীন

ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্বজনীন। দেশ-কাল, গোত্র-অঞ্চল-বর্ণ,ধনী-নির্ধন ও জাতি নির্বিশেষে এ সংস্কৃতি বিশ্বের সকল মানুষের জন্য। এ সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা রাসূলুল্লাহ (স.) এসেছেন বিশ্ববাসীর জন্য। আল্লাহ্ বলেন :

قل يايهاالناس اني رسول الله اليكم جميعا-

"বল, হে মানব জাতি! নিশ্চয় তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল।"[২]

তাকওয়া ভিত্তিক

ইসলামী সংস্কৃতির সকল গুণাবলীর মূল-সঞ্জীবনীশক্তি হল তাকওয়া। এর মাধ্যমে ব্যক্তি পাপাচারমুক্ত জীবন গড়ে তোলে। আল্লাহ্ বলেন :

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى--فان الجنة هى الماوى

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভয়ে নিজেকে পাপ থেকে বিরত রাখে তার স্থান জান্নাতে।"[৩]

يايها الذين امنوا اتقواالله حق تقاته-

"হে ইমানদার ব্যক্তিবর্গ ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, ঠিক যতটুকু ভয় তাকে করা উচিত।"[৪]

ومن يتق الله يجعل له مخرجا-

---

১. *আল কুর'আন*, ৬১: ১১

২. *আল কুর'আন*, ০৭: ১৫৮

৩. *আল কুর'আন*, ৭৯: ৪০, ৪১

৪. *আল কুর'আন*, ০৩: ১০২

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্যে (সংকট থেকে বের হয়ে আসার) একটা পথ তৈরী করে দেন।"[১]

সমতাভিত্তিক

ইসলামী সংস্কৃতি মানুষ হিসেবে সাধারণভাবে সবার জন্য অধিকারের সাম্যের কথা বলেছে। এখানে সকল মানুষ সমান। জন্ম, বংশ, অঞ্চল বা সম্পদগত কারণে কারও উপর কারও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন :

لافضل لعربى على اعجمى ولا لعجمى على عربى- ولا لاحمرعلى اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوى-

"অনারবের ওপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরবের ওপর কোন অনারবের। অনুরূপভাবে কালো বর্ণের ওপর লাল বর্ণের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং লাল বর্ণের ওপর কালো বর্ণের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"[২]

ব্যাপক সংস্কৃতি

মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ নিয়ে ইসলামী সংস্কৃতি। ব্যক্তির মন-মানস,আচরণ, পোষাক, পরিবার, রাষ্ট্র, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিশ্বব্যবস্থাসহ সর্বক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি ক্রিয়াশীল। এ সংস্কৃতির অবস্থিতি তাই বিশ্বব্যাপী। মহান আল্লাহ্ বলেন :

ونزلناعليك الكتاب تبيانا لكل شيئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين-

"আমি তোমার ওপর এমন এক কিতাব নাযিল করেছি যাতে মুসলমানদের জন্যে (দ্বীন সম্পর্কিত) যা প্রয়োজন তার সবকিছুর ব্যাখ্যা রয়েছে, (আল্লাহ্র) হেদায়াত মুসলমানদের জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদ স্বরূপ।"[৩]

مافرطنا فى الكتاب من شيئ ثم الى ربهم يحشرون-

"আমি অমার গ্রন্থে (আল-কুর'আনে) বর্ণনা বিশ্লেষণে কোন কিছুই বাকী রাখিনি, অতপর এদের সবাইকে (একদিন) তাদের মালিকের নিকট জড়ো করা হবে।"[৪]

কর্মমূখী

ইসলামী সংস্কৃতি ব্যবহারিক জীবনে অলসতা ও কর্মবিমূখতাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ফরয করেছে প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জন। আল্লাহ্ বলেন :

---

১. *আল কুর'আন*, ৬৪: ০২

২. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ২২৩৯৯

৩. *আল কুর'আন*, ১৬: ৯৮

৪. *আল কুর'আন*, ০৬: ৩৮

فاذاقضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله-

"সালাত সমাপ্ত হয়ে যাবার পর তোমরা যমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ কর।"[১]

ইহ ও পরজীবনের সেতু

ইসলামী সংস্কৃতি ইহকাল ও পরকালের মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য এবং বাস্তব সমন্বয় ঘটিয়েছে। এখানে পৃথিবী ও পরকাল আলাদা কোন জীবন নয় বরং এ হল মানব জীবনের দুটি পর্যায়। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে সূখী বা দুঃখী হওয়া পৃথিবীর জীবনের কর্মকান্ডের উপর নির্ভর করে। মৃত্যু হচ্ছে পরকালে প্রবেশের মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন :

الدنيا مزرعة الاخرة

"দুনিয়া আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র।"[২]

ভারসাম্যপূর্ণ

ইসলামী সংস্কৃতিতে অতিরিক্ত দুনিয়াপ্রেমী অথবা পুরোপুরি সংসারত্যাগী হওয়ার সুযোগ নেই। এখানে মানুষকে সংসারধর্ম পালন করেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) যেমন একজন নিখূত সংসারী লোক ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিখূত সাধক। এজন্য তিনি কোন ক্ষেত্রেই কমবেশি করেন নি। দু'পর্যায়েই প্রয়োজনীয় দয়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

ومنهم من يقول ربنا ءاتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار-

"মানুষের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অর্থাৎ উভয় জগতে কল্যাণ দান করুন; সর্বোপরি আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দিন।"[৩]

মানবমর্যাদা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

وسخرلكم مافى السموات ومافى الارض جميعا منه-

"আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তার সবকিছুর উপর আল্লাহ্‌ তোমাদের আধিপত্য দিয়েছেন।"[৪]

---

১. *আল কুর'আন*, ৬২: ১০

২. অধ্যাপক ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৩. *আল কুর'আন*, ০২: ২০১

৪. *আল কুর'আন*, ৪৫: ১৩

ولقد كرمنا بنى ادم وحملنهم فى البروالبحرورزقنهم من الطيبات وفضلنهم على كثيرممن خلقنا تفضيلا-

"আমি অবশ্যই আদম সন্তনদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে আমি ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং পবিত্র (জিনিসসমূহ দিয়ে) আমি তাদের রিয্কের ব্যবস্থা করেছি, অত:পর আমি অন্য যতো কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপর তাদের স্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[১]

যে জন্য এ সংস্কৃতি প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক বা অন্যকোন বস্তু বা বিষয়ের কাছে মানুষকে মাথা নত করতে দেয় না। কেবল আল্লাহ তা'আলা হলেন সেই সত্তা–যাঁর নিকট সে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে।

কল্যাণকামী

পারস্পরিক সদিচ্ছা, শুভেচ্ছা ও কল্যাণকামিতার উপর ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত। এর প্রতিজন অনুসারী অন্য অনুসারীর সুখ-দুঃখের অংশীদার। এখানে ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতির পরিবর্তে সৌহার্দ্য ও ভালবাসা বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

الدين النصيحة-

"পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সদুপদেশই হচ্ছে দ্বীন।"[২]

শালীন

ইসলামী সংস্কৃতি অশালীন, অশোভন, অরুচিকর ও অসভ্য সকল রীতিনীতি এবং আচরণ নির্মূল করে। আল্লাহ বলেন :

قل انما حرم ربى الفواحش ماظهرمنها ومابطن-

"মুহাম্মদ (স.) তুমি বল, নিশ্চয় আমার রব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করেছেন।"[৩]

বাহুল্যবর্জিত

ইসলামী সংস্কৃতি সহজ, সরল ও সাধারণ। বিলাসিতা, অপচয়, লেনদেন ও আচরণে বাহুল্য এখানে নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

من حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه-

"ব্যক্তির ইসলামী জীবনের মূল সৌন্দর্য হলো, অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ করা।"[৪]

---

১. *আল কুর'আন*, ১৭: ৭০

২. সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, বাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৪২

৩. *আল কুর'আন*, ০৭: ৩৩

৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪ খ্রী.), খন্ড- ০১, পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

ত্যাগধর্মী

ইসলামী সংস্কৃতি ভোগধর্মী নয় ত্যাগধর্মী। এর সকল রীতি-নীতি ও আচরণে অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার নির্দেশনা রয়েছে। এ সংস্কৃতির সকল মৌলিক ইবাদতের মধ্যে ত্যাগের আদর্শই সমুজ্জল। ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল আযহা, সাদকা, যাকাত, আকীকা প্রভৃতি আনুষ্ঠানিকতায় ইসলামী সংস্কৃতি ত্যগের আদর্শের প্রশিক্ষণ দেয়। মহান আল্লাহ্ বলেন :

قل ان صلا تى ونسكى ومحياى ومما تى لله رب العالمين--لا شريك له وبذالك امرت وانا اول المسلمين

"(হে মুহাম্মদ!) তুমি (একান্ত বিনয়ের সাথে) বলো, অবশ্যই আমার সালাত, আমার (আনুষ্ঠানিক) কাজকর্ম, আমার জীবন, আমার মৃত্যু–সব কিছুই সৃষ্টিকুলের মালিক মহান আল্লাহ্‌র জন্যে।"[১]

সত্য ও সুন্দরের আহবায়ক

ইসলামী সংস্কৃতি অন্যায় অসত্যকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সত্য ও সুন্দরের চিরন্তন আহবান বহন করে। আল্লাহ্ বলেন :

تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر-

"তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।"[২]

জীবন্ত ও চিরস্থায়ী

ইসলামী সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এ সংস্কৃতি গতিশীল। মানুষের জীবন নির্বাহের মতো এ সংস্কৃতিতে আছে বহমানতা। প্রতিনিয়ত উদ্ভূত সমস্যা ও সম্ভাবনার বস্তবসম্মত যুক্তিসঙ্গত সমাধান আছে এখানে। তাছাড়া ইসলামী সংস্কৃতি মূলত আল্লাহ্‌র গুণাবলী অর্জনের পদ্ধতি। গতিশীলতা ও পদ্ধতিগত কারণে ইসলামী সংস্কৃতি চিরন্তন এবং শাশ্বত।

বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতা

ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। যেহেতু অল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজেও পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। আর পবিত্রতা বলতে বাহ্যিক ও আত্মিক অর্থাৎ দেহের ও মনের উভয় প্রকার পবিত্রতা বোঝায়। ইসলাম এ উভয় প্রকার পবিত্রতার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে এবং এ উভয় প্রকার পবিত্রতা ছাড়া কোন ধরণের ইবাদাত মহান আল্লাহ্‌ও নিকট গস্থহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

---

১. *আল কুর'আন*, ০৬: ১৬২

২. *আল কুর'আন*, ০৩: ১১০

Dhaka University Institutional Repository

يايهاالذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الى الكعبين-

"হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন সালাতের জন্যে দাঁড়াবে তখন তোমরা তোমাদের (পুরো) মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত দুটো ধুয়ে নেবে, অতপর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা দুটো গোড়ালী পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।[১]

هوالذى بعث فى الاميين رسولامنهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم-

"তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি (একটি) সাধারণ জনগোষ্ঠির (নিরক্ষর লোকদের) মাঝে থেকে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে এবং তাদের জীবনকে পবিত্র করবে।"[২]

قدافلح من تزكى

"যে ব্যক্তি (হেদায়াতের আলোকে নিজের জীবন) পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে।"[৩]

কুসংস্কার মুক্ত

ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম একটি বিশেষ দিক হচ্ছে যাবতীয় সামাজিক কুসংস্কার বর্জন। যেহেতু কুসংস্কার একটি সামাজিক ব্যাধি, যা মানুষকে অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন কবরে চাদোয়া টানানো, পীর-মরেশিদকে সিজদা করা, কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট কিছু প্রার্থনা করা ইত্যাদি। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন :

لعن الله اليهود والنصارى اتخذ وا قبورانبيا ئهم مساجد-

"আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। কেননা তারা স্বীয় নবীদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে।"[৪]

ঐক্য ও সংহতি

ঐক্য ও সংহতি ইসলামী সংস্কৃতির এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা মানব সমাজকে বিভক্তি ও বিভেদের বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا-

"তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র রুজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো এবং এক্ষেত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়ো না।"[১]

---

১. *আল কুর'আন*, ০৫: ০৬

২. *আল কুর'আন*, ৬২: ০২

৩. *আল কুর'আন*, ৮৭: ১৪

৪. ইমাম আবু আব্দুর রহমান আহমাদ আন-নাসাঈ, *সুনান আন নাসাঈ*, হাদীস নং- ২০৪৭, প্রাগুক্ত, খন্ড- ০২, পৃ. ২৩৯০

Dhaka University Institutional Repository

স্বচ্ছ, উদার ও গতিশীল জীবন-চেতনা

ইসলামী সংস্কৃতি এমন একটি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত, যার মূল ভিত্তি হলো আল্লাহ্ভীতিপূর্ণ সদাচার। এবং এটি একটি স্বচ্ছ, উদার, গতিশীল জীবনচেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم ان الله عليم خبير-

"হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ এবং একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্জাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে (আল্লাহ্ তা'আলাকে) বেশী ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর (পুংখানুপুংখ) খবর রাখেন।"[২]

মানবতাবোধ

ইসলামী সংস্কৃতির অনুপম আরেকটি দিক হচ্ছে মানবতাবোধ। এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে, একে অপরের উপকারে তৎপর হয় এবং একে অন্যের উন্নতি এবং সুখ-শান্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر-

"তোমরা (হচ্ছো দুনিয়ার) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।"[৩]

সৌন্দর্যবোধ

ইসলামী সংস্কৃতির আরো একটি বিশেষ দিক হচ্ছে সৌন্দর্যবোধ, যা মানুষকে তার যবতীয় কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পাদনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং আকাশ ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ্ নিজেই সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

ان الله جميل يحب الجمال-

"নিশ্চয়ই মহান আল্লহ্ সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন।"[৪]

---

১. *আল কুর'আন*, ০৩: ১০৩

২. *আল কুর'আন*, ৪৯: ১৩

৩. *আল কুর'আন*, ০৩: ১১০

৪. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ , *সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং- ৯১, অনুবদ: মাওলানা অফলাতুন কায়সার (ঢাকা: বংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১২ খ্রী.), খন্ড-০১, পৃ. ৭৬৫

Dhaka University Institutional Repository

জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম বিশেষ একটি দিক। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতিকে তাদের প্রতিটি কৃতকর্মের জবাব হাশরের মাঠে আল্লাহ্‌র সামনে দিতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন :

ولاتقف ماليس لك به علم-ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, (অযথা) তার পেছনে পড় না; কেননা (কেয়ামতের দিন) কান, চোখ ও অন্তর, এ সব কয়টির (ব্যবহার) সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।"[১]
আর রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته-

"সাবধান ! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হতে হবে।"[২]

আল্লাহমুখীতা

ইসলামী সংস্কৃতিতে মানুষের প্রতিটি কাজ আল্লাহ্‌র জন্যেই নিবেদিত হওয়া উচিৎ। কারণ মানুষের উন্নতি-অবনতির চাবি-কাঠি সহ জীবন, মৃত্যু এবং রিয্‌কের মালিক হচ্ছেন একমাত্র তিনি। অতএব মানুষের সকল কার্যক্রম আল্লাহ্ অভিমূখী হওয়া উচিৎ। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

قل ان صلا تى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين-

"তুমি (একান্ত বিনয়ের সাথে) বলো, অবশ্যই আমার সলাত, অমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু–সব কিছুই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে।"[৩]

স্বাভাবিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

ইসলামী সংস্কৃতি স্বাভাবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লক্ষ্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে ইসলাম যে মতবাদ পেশ করে, প্রকৃতপক্ষে তা সাধারণ মতবাদের সীমা অতিক্রম করে ঈমান প্রত্যয়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। সে মতবাদটি হচ্ছে এই যে, সৃষ্টির এ অন্তহীন রাজ্যের মালিক ও শাসক হচ্ছেন এক আল্লাহ্। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁরই অধীন ও অনুগত এবং তাঁরই সামনে আত্মসমর্পিত।[৪] মহান আল্লাহ্ বলেন :

لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهوعلى كل شيئ قدير-

---

১. *আল কুর'আন*, ১৭: ৩৬

২. *সহীহ আল বুখারী*, হাদীস নং- ৮৯৩, অনুবাদ: অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী গং (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২ খ্রী.), খন্ড- ০১, পৃ. ৯৬

৩. *আল কুর'আন*, ০৬: ১৬২

৪. ড.মুহাম্মদ রেজাউল করিম, *ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি ও স্বরূপ* (ঢাকা: ইউনিভার্সাল ইসলামিক থট, ২০১৪ খ্রী.), পৃ. ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

"আকাশমালা ও যমীন এবং এর মধ্যবর্তী সমগ্র সৃষ্টিকূলের ভেতর যা কিছু আছে তার সমুদয় বাদশাহী তো আল্লাহ্‌র জন্যেই এবং তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[১]

وله من في السماوات والارض كل له قانتون-

"নভোমন্ডল এবং ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, তা তো (একান্তভাবে) তাঁর জন্যেই; সবকিছু তাঁর (আদেশেরই) অনুগত।"[২]

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আকর্ষিক শক্তি

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আকর্ষিক শক্তি হিসেবে ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের অন্তরে এবং সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। এ সংস্কৃতির গোটা ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আল্লাহ্‌র সত্তা। এর গোটা ব্যবস্থাপনাই ঐ কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তনশীল। মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقداستمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور-

"যদি কোন ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে নিজেকে (সম্পূর্ণ) সঁপে দেয়, (তাহলে) সে (যেন মনে করে এর দ্বারা) মজবুত হাতল ধরেছে; (কেননা) যবতীয় কাজকর্মের চুড়ান্ত পরিণাম আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে।"[৩]

চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে একমুখীতা

ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমুখী নীতি অবলম্বন করা এবং কথায় ও কাজে মিল না রেখে কাজ করা মহান আল্লাহ্‌র নিকট অন্যতম ঘৃন্যকাজ বলে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন :

يا ايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون-كبرمقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون

"হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা এমন সব কথা বলো কেন যা তোমরা (নিজেরা) করো না। আল্লাহ্‌র কাছে এটা অপছন্দনীয় কাজ যে, তোমরা এমন সব কথা বলে বেড়াবে–যা তোমরা করবে না।"[৪]

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের অভিপ্রায়

ইসলামী সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় একটি দিক হচ্ছে জীবনের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি পদে এবং প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের অভিপ্রায় থাকা এবং পুরো জীবনটাকে একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে সমর্পন করা।

---

১. *আল কুর'আন*, ০৫: ১২০

২. *আল কুর'আন*, ৩০: ২৬

৩. *আল কুর'আন*, ৩১: ২২

৪. *আল কুর'আন*, ৬১: ২,৩

Dhaka University Institutional Repository

بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن-فله اجره عند ربه ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون

"(তবে হ্যাঁ,) যে কোন ব্যক্তিই (আল্লাহ্‌র সামনে) নিজের সত্তাকে সমর্পণ করে দেবে এবং হবে সে অবশ্যই একজন নেককার মানুষ, তার জন্যে তার মালিকের কাছে (এর) বিনিময় রয়েছে, তাদের কোন ভয় ভীতি নেই, আর না তারা (সেদিন) চিন্তান্বিতও হবে।"[১]

সৎকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী

ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান একটি দিক হচ্ছে এটি সমাজে বসবাসরত প্রতিটি মানুষের মধ্যে সৎকর্মের প্রেরণা যুগিয়ে থাকে। আকাশ এবং যমীনের মালিকও কুর'আনুল কারীমে এ বিষয়েরই নির্দেশনা দিয়েছেন :

وتعاونواعلى البروالتقوى-ولا تعاونواعلى الاثم والعدوان

"(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা !) তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করো, এবং পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে কখনো একে অপরকে সহযোগিতা করবে না।"[২]

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইসলামী সংস্কৃতির সকল বিধান ও নীতিমালার একটি মাত্র লক্ষ্য রয়েছে। সেটি হল এ সংস্কৃতি মানুষকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের যোগ্য করে গড়ে তোলে। কেননা ব্যক্তির সকল সাফল্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে। যে জন্য এ সংস্কৃতিতে ব্যক্তির জীবন, মৃত্যু লেনদেন সহ সকল কিছু মহান আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পিত হয়। আল্লাহ্ বলেন :

قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومما تى لله رب العالمين-

"মুহাম্মদ (সঃ) তুমি বল, আমার সালাত, আমার কুরবানী, অমার জীবন এবং মৃত্যু বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।"[৩]

ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা হল একথা স্বীকার করা যে, মহান আল্লাহ্ তা'আলা গোটা বিশ্বলোকের এক ও একক স্রষ্টা; তিনিই একমাত্র সার্বভৌম প্রভূ। হযরত মুহাম্মদ (স.) দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি [৪] (محمد رسول الله) এবং কুর'আন মাজীদ আল্লাহ্‌র কালাম-হিদায়াতের সর্বশেষ বিধান। ইসলামী মতাদর্শে তাওহীদ বিশ্বাস হল সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক মৌলিক বিষয়। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইলাহ নেই (لاالـه الاالله) এই ঘোষণাটি হচ্ছে তাওহীদের সার নির্যাস, অন্য কথায় আল্লাহ্‌কে প্রকৃত ইলাহ রূপে মেনে নেয়া তাঁরই নিরংকুশ প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব (সার্বভৌমত্ব) স্বীকার করার পর মানুষ দুনিয়ার খোদায়ীর দাবিদার অন্যান্য দেব-দেবী, দেবতার, রাজা-বাদশাহ

---

১. *আল কুর'আন*, ০২: ১১২

২. *আল কুর'আন*, ০৫: ০২

৩. *আল কুর'আন*, ০৬: ১৬২

৪. *আল কুর'আন*, ৪৯: ২৯

Dhaka University Institutional Repository

এবং সম্পদ দেবতার দাসত্বের অভিশাপ থেকে চিরকালের তরে মুক্তি লাভ করতে পারে। তাওহীদের এ আকীদার দৃষ্টিতে ইসলামী সংস্কৃতি বংশীয় পার্থক্য, বর্ণগত বৈষম্য-বিরোধ, আর্থিক অবস্থাভিত্তিক শ্রেণী-পার্থক্য ভৌগোলিক সীমাভিত্তিক শত্রুতা প্রভৃতিকে আদৌ বরদাশত করতে পারে না; অথচ এসবের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছে দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যতা। মানুষে মানুষে যৌক্তিক ও সঠিক সাম্যই হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে ইসলামী সংস্কৃতির একমাত্র দৃষ্টি।[১]

আল্লাহ্‌কে এক ও লা-শারীক সার্বভৌম বলে স্বীকার করা এবং সকল মানুষকে মূলগতভাবে সমান অধিকারসম্পন্ন মেনে নেয়া-শুধু মৌখিকভাবে মেনে নেয়াই নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে ও সে অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন পরিচালিত করাই হল ইসলামী সংস্কৃতির মর্মবানী। ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে একজন শ্রমজীবীও তেমনি সম্মানী যেমন সম্মানীয় কোন কারখানার মালিক। নিগ্রো মুষ্ঠিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলী ক্লে ও শ্বেতাঙ্গ চিন্তাবিদ মুহাম্মদ মার্মাডিউক পিক্‌থল অভিন্ন শ্রদ্ধার পাত্র। ইসলামী সমাজের প্রত্যেকে ব্যক্তিই তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন অবাধে পূরণের অধিকারী। এ অধিকার সত্যিকারভাবে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করাই ইসলামী সংস্কৃতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।[২]

ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ রীতি এবং সংযত, নিয়ন্ত্রিত ও সক্রিয় জীবনের গুরুত্ব সর্বাধিক। মানুষের জীনব অবিভাজ্য; বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী অংশ বা বিভাগে তাকে ভাগ করা যায় না। মানুষের সত্যিকার উন্নতি নির্ভর করে দেহ ও আত্মা তথা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ঐকিক কল্যাণের ওপর। দেহ ও আত্মার বিরোধ মিটিয়ে একাকার করে দেয়াই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য, যদিও দুনিয়ার অনেক সংস্কৃতিরই লক্ষ্য হচ্ছে এ দূয়ের মাঝে বিরোধ ও দ্বৈততাকে বজায় রাখা এবং একটিকে নস্যাৎ করে অপরটির পরিতৃপ্তি সাধন।

Hedonism বা ভোগবাদী ও আনন্দবাদী চিন্তা-দর্শন বিশ্বাসীরা আজো আত্মার দাবিকে অস্বীকার করে এবং আত্মার মর্যাদা ও প্রবণতাকে অমর্যাদা করে কেবল মাত্র দৈহিক সূখ ও ভোগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। তাদের মূল মন্ত্র হলঃ Pleasure is the highest good 'সুখ ভোগ বা আনন্দ লাভই শ্রেষ্ঠতর কল্যাণ।'

কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি দেহ ও আত্মার মাঝে পরিপূর্ণভাবে সাম্য রক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্প। এর কোনটিকে অস্বীকার করা কিংবা একটি দিকের ওপর সর্বাধিক গুরত্বারোপ করা এবং সেদিকেই গোটা জীবনকে পরিচালিত করা ইসলামের সাংস্কৃতিক আদর্শের পরিপন্থী। এ ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতিবাদীদেরকে লক্ষ্য করেই কুর'আন মাজীদে বলা হয়েছে :

وكذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداءعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

"এমনিভাবেই তোমাদেরকে আমি মধ্যম নীতির অনুসারী করে বানিয়েছি, যেন তোমরা সমগ্র মানুষের পথপ্রদর্শক হতে পার এবং রাসূল হতে পারে তোমাদের পথ-প্রদর্শক।"[৩]

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

২. প্রাগুক্ত

৩. *আল কুর'আন*, ০২: ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

অন্যকথায় রাসূল (স.) এর আদর্শ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এ ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ অনুসারীরাই বিশ্বমানবের নেতৃত্বের অধিকারী হতে পারে সংস্কৃতি ও সভ্যতার উভয় দিক দিয়েই। আর একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতিই পারে এক ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতির জন্ম দিতে। সে কারণেই ইসলামী সংস্কৃতি না একথা বলেছে যে, মানুষ বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করবে এবং দুনিয়ার কাজকর্ম ও দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দূরে নিবিড় জঙ্গলে কিংবা খানকার নির্জন পরিবেশে আশ্রয় নেবে, আর না এ শিক্ষা দিয়েছে যে, সে কেবল দুনিয়ার কাজকর্মকেই জীবনের চরম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করবে,তাতেই মশগুল হয়ে থাকবে একান্তভাবে; বরং তার শিক্ষা হল, মানুষ দুনিয়ার জীবনকে সঠিক পন্থায় এবং পুরোমাত্রায় যাপন করে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে, এটাই হল আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি মানুষের একমাত্র কাজ। ইসলামী সংস্কৃতি এ উভয় দিকে নিহিত অযৌক্তিক প্রবণতা ও অবৈজ্ঞানিক ভাবধারাকে পরিহার করে এবং এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি করে এক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ-পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। অর্থ্যাৎ দুনিয়ায় থেকেও দুনিয়াবিমূখ হওয়া এবং দুনিয়াবিমুখ হয়েও দুনিয়া ভোগ করাই হল ইসলামী সংস্কৃতির মর্মবাণী। রাসূলে কারীম (স:) একথাই বুঝিয়েছেন তাঁর এ উক্তি দিয়ে:

كن فى الدنياكانك غريب او عابر سبيل

"তুমি দুনিয়ায় প্রবাসী অথবা পথিকের ন্যায় জীবন যাপন কর।"[১]

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হল ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ-সংস্থার পূর্ণত্ব বিধান। প্রধানত দুটি দিক দিয়েই ইসলামী সংস্কৃতির ধারণা (conception) অন্যান্যদের ধারণা থেকে ভিন্ন ও বিশিষ্ট। একটি এই যে, ইসলামের উপরোক্ত লক্ষ্য ইসলামী শরী'আতের সীমার মাঝে এবং কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র পরিচালনাধীনে অর্জিত হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়টি হল এ পর্যায়ে যা কিছু চেষ্টা-সাধনা, আয়োজন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সব হতে হবে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারেই আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের এ চেষ্টা চলতে হবে।

কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে ব্যক্তির সংশোধন, পুনর্গঠন ও পূর্ণতা বিধানের জন্যে সমাজ ও সমষ্টির সংশোধন ও পুনর্গঠন একান্তই জরুরী। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি প্রায় অসম্ভব। অধিকাংশ ব্যক্তি-সত্তার সংস্কার সংশোধন ও পূর্ণত্ব বিধান গোটা সমাজের সংশোধন ও সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল। শেষের কাজটি না হলে প্রথমটি আদৌ সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সমাজ সংশোধন ও সংস্কার প্রচেষ্টাই ব্যক্তি জীবনে এনে দেয় সংশোধন ও সংস্কারের বন্যা-প্রবাহ। তাই এ প্রচেষ্টা হতে হবে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক যেমন, সমাজ-কেন্দ্রিকও তেমনি। এই প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণার অপনোদন করা প্রয়োজন। কিছু লোক মনে করে যে, মুসলিম নামধারী ব্যক্তি বা সমাজ যেসব অনুষ্ঠান ও ভাবধারাকে সংস্কৃতি রূপে গ্রহণ করেছে, তারই নাম ইসলামী সংস্কৃতি, কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়।

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই মুসলিম সংস্কৃতি নামে অভিহিত হতে পারে, যার সন্ধান পাওয়া যায় কুর'আন ও সুন্নাহ্‌তে কিংবা যার সমর্থন মেলে আল্লাহ্‌র ও রাসূল (স.) এর

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম , *হাদীস শরীফ*, প্রাগুক্ত, খন্ড- ০১, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

কাছ থেকে এবং যার লক্ষ্য বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন। মুসলিম সমাজে এমন কোন ভাবধারা বা সংস্কৃতি যদি দেখা দেয়, কুর'আন ও সুন্নাহ্ যার অনুমতি দেয় না, তাহলে বুঝতে হবে, তা ইসলামী সংস্কৃতি নয়, তা মুসলমানদের নিজস্ব জিনিসও নয়; বরং তা মুসলিম সমাজের বাইরে থেকে আমদানী করা জিনিস। তা গ্রহণ করে মুসলমানরা নিজেদেরকে ধ্বংসেরই ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া কোন কল্যাণই তাতে নেই, থাকতে পারে না। Fine Arts বা ললিতকলার যেসব ধরন বা উপকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ, তা নিষিদ্ধ এই কল্যাণদৃষ্টির কারণেই। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে চায় সুন্দর সুষমামন্ডিত, সবুজ-সতেজ, আনন্দমুখর ও উৎফুল্ল করে গড়ে তুলতে কিন্তু তা সবই করতে চায় কুর'আন ও সুন্নাহ্র আলোকে মানুষের সঠিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে।

তবে 'শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি' বইটির লেখক জনাব আবদুস শহীদ নাসিম এর মতানুসারে সংক্ষেপে ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস ও এক আল্লাহ্মুখীতা।
২. আল্লাহ্ প্রেম, আল্লহ্ ভীতি ও আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনের প্রেরণা।
৩. আখিরাত বা পরকালের চিন্তা।
৪. আত্মশুদ্ধি ও আত্মার প্রশান্তি।
৫. নৈতিক মূল্যবোধ।
৬. চিন্তা, চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতা।
৭. অনাবিলতা ও পরিচ্ছন্নতাবোধ।
৮. সৌন্দর্যবোধ।
৯. দায়িত্বানুভূতি ও কর্মবোধ।
১০. উদারতা ও মনের বিশালতা।
১১. আত্ম সম্মানবোধ ও ব্যক্তি সাতন্ত্র্যবোধ।
১২. মানবতাবোধ।
১৩. মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান।
১৪. মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ।
১৫. মানবতার ঐক্যবোধ।
১৬. আত্মীয়তাবোধ।
১৭. সামাজিকতাবোধ।
১৮. নির্লোভ ও নিরহংকার মানস।
১৯. দয়া, মায়া, ক্ষমা, কোমলতা ও ভালোবাসা।
২০. নেতৃত্ববোধ।
২১. বিনয়, আনুগত্য ও শৃংখলাবোধ।
২২. অদর্শবোধ ও রিসালাতের অনুবর্তন।
২৩. মিশনারী মনোভাব।
২৪. সুবিচার।
২৫. সহিষনুতা।
২৬. ভারসাম্যতা।
২৭. বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতা।[১]

১. অবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

ইসলামী সংস্কৃতির মৌল উপাদান

ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. তাওহীদ।
২. মানবতার সম্মান।
৩. বিশ্ব-ব্যাপকতা, সর্বজনীনতা (Universality) ও ভৌগলিক অভিন্নতা।
৪. মানবীয় ভ্রাতৃত্ব।
৫. বিশ্ব শান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।
৬. বিশ্ব-মানবের ঐক্য।
৭. কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ।
৮. পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা।
৯. পংকিলতা থেকে মুক্তি।
১০. ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের মর্যাদা।
১১. ভারসাম্য, সুষমতা ও সামঞ্জস্য।[১]

এসব মৌল উপাদান ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা-ই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি । যে সংস্কৃতিতে এর কোন একটি উপাদান ও ভাবধারার অভাব থাকবে, তা আর যাই হোক ইসলামী সংস্কৃতি হবে না এবং তা হতে পারে না ইসলামী আর্দশে বিশ্বাসীদের গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি।

বর্তমান মুসলিম সমাজে এর বিপরীত আদর্শের উপাদান ও ভাবধারায় গড়া সংস্কৃতি বিরাজমান । বিদেশী ও বিজাতীয় ভাবধারার প্রভাবে মুসলিম সংস্কৃতি আজ পংকিলময়। আজ আমাদের সংস্কৃতিকে বিদেশী ও বিজাতীয় উপাদান ও ভাবধারা থেকে মুক্ত করে ইসলামী আদর্শের মানে উত্তীর্ণ এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামী আর্দশবাদীদের সংগ্রাম চালাতে হবে। এ সংগ্রাম কঠিন, ক্লান্তিকর ও দুঃসাধ্য। এ পথে পদে পদে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধার সম্মূখীন হতে হবে। কিন্তু পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে এ সংগ্রাম চালাতে পারলে এর জয় সুনিশ্চিত। বর্তমান বিশ্ব এমনি এক ভারসাম্যপূর্ণ মানবতাবাদী ও সর্ব মানুষের জন্যে কল্যাণকর সংস্কৃতির প্রতীক্ষায় উদগ্রীব।

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদ

ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক ও উদাহরণ

মানুষের পুরোজীবন নিয়েই ইসলামী সংস্কৃতির বিস্তার। জন্ম, মৃত্যু, লেনদেন, দেখা সাক্ষাৎ, দৈনন্দিন জীবন–সকল ক্ষেত্রেই এ সংস্কৃতি বিরাজমান। সংক্ষেপে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো ঃ

জন্মের পর আযান দেয়া

ইসলামী সংস্কৃতির বিশেষ দিক হলো জন্মের পর শিশুকে আযান ধ্বনি শোনানো।[১]

সুন্দর নাম রাখা

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে তার সুন্দর একটি নাম রাখা রাসূলুল্লাহ্ (স.) যেমনটি ইরশাদ করেছেন :

اذاولد له ولد فليحسن اسمه-

"যখন শিশুর জন্ম হয়–তখন তার সুন্দর একটি নাম রাখ।"[২]

আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ولد لى غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه الى وكان اكبر ولد ابى موسى-

"আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রন করল। আমি তাকে নিয়ে নবী (স.)-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খোরমা চিবিয়ে মুখে দিলেন, অতপর তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন, তারপর তাকে আমার নিকট ফেরত দিলেন।"[৩]

আক্বীকা করা

জন্মের ৭ম, বা ১৪তম বা ২১তম দিনে আক্বীকা দেয়া। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন :

مع الغلام عقيقة فاهرقوا عنه دما اميطوا عنه الاذى-

"শিশুর (জন্মের পর) আকীকা করা আবশ্যক। অতএব তার তরফ থেকে তোমরা রক্ত প্রবাহিত কর। (পশু যবেহ কর) এবং তার থেকে কষ্ট দূর কর"।[৪]

---

১. অধ্যাপক ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

২. প্রাগুক্ত

৩. *সহীহ আল বুখারী*, হাদীস নং- ৫০৬২ (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮২ খ্রী.), খন্ড- ০৫, পৃ. ২০৭

৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫০৬৬, খন্ড- ০৫, পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

কাজের শুরূতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া

প্রতিটি ভাল এবং বৈধ কাজের শুরূতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া ইসলামী সংস্কৃতির অংঙ্গ। বিশ্বনবী (স.) এরশাদ করেন :

كل امر ذى بال لم يبدء باسم الله فهو اقطع اوابتر-

"প্রতিটি ভাল কাজের শুরুতে যদি আল্লাহ্‌র নাম নেয়া না হয় তাহলে তা হয় অসম্পূর্ণ অথবা নিম্নমানের।"[১]

ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتى بعد-

"হে বালক ! আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) ডান হাত দিয়ে নিজের সামনে থেকে খাও। সুতরাং তখন থেকে আমি ঐ নীতি অনুসারে খেয়ে থাকি।"[২]

একত্রে খাদ্যগ্রহণ

সবাই মিলে এক সাথে খাদ্য গ্রহণ করা ইসলামী সংস্কৃতির অংশ। রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেন :

واجتمعواعلى طعامكم واذكرواسم الله يبارك فيه-

"তোমরা একত্রে খাবার গ্রহন কর এবং খাদ্য গ্রহনের সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ কর, তাহলে তোমাদের খাবারে বরকত দান করা হবে।"[৩] খাবার শুরুতে"বিসমিল্লাহি ওআলা বারাকাতিল্লাহ্‌ "এবং শেষে "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আতআমানা ওয়াছাকানা ওয়াজা আলানা মিনাল মুসলিমিন"[৪] বলা এ সংস্কৃতির অন্যতম দিক। শেষে অবশ্য শুধু 'আলহামদু লিল্লাহ্‌ ' বললেও চলবে।

ডান হাতে খাবার খাওয়া

যে কোন খাবার গ্রহণের সময় ডান হাতে খাবার গ্রহণ করা ইসলামী সংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক। রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেন :

اذا اكل احدكم فلياكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله-

"তোমাদের কেউ যখন খায়, সে যেন তার ডান হাতে খায় এবং যখন পান করে তখনও যেন তার ডান হাতে পান করে। কেননা শয়তা তার বাম হাতে পানাহার করে।"[৫]

---

১. অধ্যাপক ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

২. *সহীহ আল বুখারী*, হাদীস নং-৪৯৭৫, খন্ড- ০৫, পৃ. ১৭৩

৩. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আস'অস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, হাদীস নং- ৩৭৬৪ (ঢাকা: বংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০ খ্রী.), খন্ড- ০৫, পৃ. ২২৮

৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৮৫০, খন্ড- ০৫, পৃ. ২৬৫

৫. প্রগুক্ত, হাদীস নং- ৩৭৭৬,৩৭৭৭, খন্ড- ০৫, পৃ. ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

দোয়া পড়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং দোয়া পড়ে ঘুম থেকে ওঠা

ঘুম আল্লাহ্‌র নিয়ামত। ঘুমাতে যাওয়ার সময় নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করে ঘুমাতে যাওয়ার কথা রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

اللهم باسمك اموت واحيا-

"হে আল্লাহ্‌ আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি (ঘুমাতে যাই) এবং তোমার নামেই বেঁচে থাকি (জাগি)।"[১]

ঘুম থেকে জেগে পড়তে হয় :

الحمد لله الذي احيانا بعدماامانناواليه النشور-

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি মৃত্যুর পর (ঘুমের পর) আমাকে জীবন দান করলেন আর অবশেষে তাঁর কাছেই ফিওে যেতে হবে।"[২]

সাক্ষ্যাতে সালাম দেয়া

মুসলিমগণ পারস্পরিক সাক্ষাতে প্রথমেই সালামের মাধ্যমে কুশল বিনিময় করবেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেন :

تطعم الطعام وتقرءواالسلام على من عرفت و من لم تعرف-

"খুধার্তকে খাবার দেবে আর তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।"[৩] সালামের পর কুশল জিজ্ঞাসা ও মুসফাহা মুআনাকা করা যেতে পারে।

عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اى الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرءالسلام على من عرفت ومن لم تعرف-

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন কাজ সবচেয়ে ভাল ? জবাবে তিনি বললেন : "খাদ্য খাওয়ানো (অভুক্তকে) এবং চেনা-অচেনা ব্যক্তিকে সালাম দেয়া।"[৪]

---

১. প্রাগুক্ত , হাদীস নং- ৫৮৭৯, খন্ড- ০৫, পৃ. ৫৩৫

২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৮৮০, খন্ড- ০৫, পৃ. ৫৩৫

৩. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৭৯৪ , খন্ড- ০৫, পৃ. ৪৯৫

৪. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১, খন্ড- ০১, পৃ. ৬০

সুন্দর বাক্যালাপ

ইসলামী সংস্কৃতির বিশেষ দিক হলো সুন্দর বাক্যালাপ।অর্থাৎ কথবার্তায় ঔদ্ধত্য বা অহংকার প্রকাশ পাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (স.)বলেন :

تواضعوا حتى لايفخراحدعلى احد-

"তোমরা একে অপরের সাথে বিনয়ী ব্যবহার করবে এবং অহংকার করবে না।"[১]

لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام-

"য ব্যক্তি মানুষের সাথে ভালো কথা বলে, অনাহারীকে খাবার দেয়, সর্বদা রোযা রাখে এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন সে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সালাত পড়ে।"[২]

ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান

ইসলামী সংস্কৃতিতে ছোটরা বড়দের সম্মান করবে। লেন-দেন, কথাবার্তায় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। আর বড়রা ছোটদের স্নেহ করবে, আদব শেখাবে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন :

من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقركبيرنا فليس منا-

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করেনা এবং বড়দের সম্মান করেনা সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।"[৩]

শালীন পোষাক পরিধান করা

ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম দিক হচ্ছে শালীন ও শোভনীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান। মহান আল্লাহ্ বলেন :

يبنى ادم قد انزلناعليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا--ولباس التقوى ذالك خير

"বনী আদম ! আমি তোমাদের জন্য পোষাক অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং পরহেজগারির পোষাক। এটি সর্বোত্তম।"[৪] এজন্য মুসলমানদের পোষাক হবে মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন। তা পুরুষ ও মহিলাদের ইজ্জত আবরু পুরোপুরি আবৃত করে রাখবে। এ পোষাক পরিচ্ছন্নও পবিত্র হবে, তবে চাকচিক্য ও বিলাসিতার প্রতীক হবে না।

---

১. অধ্যাপক ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, হাদীস নং- ১৯৩৪ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭ খ্রী.), খন্ড- ০৩, পৃ. ৪০৪

৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮৬৯,১৮৭০,১৮৭১, খন্ড- ০৩, পৃ. ৩৭৩,৩৭৪

৪. *আল কুর'আন*, ০৭: ২৬

Dhaka University Institutional Repository

বসে পান করা

ইসলামী সংস্কৃতিতে পান করতে হয় বসে। দাঁড়িয়ে পান করা শোভন নয়। আবার এক নিশ্বাসে সবটুকু পান করা উচিত নয়। পান করতে হবে থেমে থেমে, ধীরে ধীরে। হযরত আনাস (রা.) বলেন :

كان النبى صلى الله عليه وسلم يتنفس فى الشراب ثلاثا-

"নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্র থেকে পানি পান করার সময় তিনবার শ্বাস নিতেন। তিনি বলতেন : এভাবে পান করা অধিক স্বাচ্ছন্দকর ও তৃপ্তিদায়ক।"[১] এছাড়া পানপাত্রটি ধরতে হবে ডান হাতে। সম্ভব না হলে বাম হাতে ধরতে পারবে তবে তার নিচে ডান হাত রাখতে হবে।

ডানে ফিরে শোয়া

ডান পাশে ফিরে শোয়া উত্তম। অজু করে কুর'আন মাজিদের সূরা ইখলাস, মূলক বা ফাতিহার মতো সূরা পড়তে পড়তে বিছানায় যাওয়া উত্তম।[২]

عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل احدى عشر ركعة فاذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يجيئ المئذن فيئذنه-

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (স.) রাতে এগার রাকাত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। পরে ফজরের সময় হলে হালকাভাবে দ'রাকাত নামাজ (ফজরের সুন্নাত) পড়তেন। তারপর ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। শেষে মুয়াজ্জিন এসে তাঁকে (ফজরের সময় হওয়ার) খবর দিত।[৩]

ওঠা-বসা ও চলাফেরা

পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্থানে বসতে হবে। মজলিশে কাউকে কষ্ট দিয়ে বসা যাবে না বা কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসা যাবে না। হাঁটতে হবে মৃদু পদক্ষেপে। হাঁটার মধ্যে দম্ভ প্রকাশ করা যাবে না। এমন ভাবেও হাঁটা যাবে না যাতে অলস মনে হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন :

ولاتمش فى الارض مرحا- ان الله لايحب كل مختال فخور-

"আর তুমি পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[৪]

প্রস্রাব-পায়খানা

---

১. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮৩২, ১৮৩৩, খন্ড- ০৩, পৃ. ৩৫৫

২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৩৩৮, খন্ড- ০৬, পৃ. ১০৭

৩. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৮৬৫, ৫৮৬৬, খন্ড- ০৫, পৃ. ৫২৮

৪. *আল কুর'আন*, ৩১: ১৮

Dhaka University Institutional Repository

শালীনতার সাথে নির্দিষ্ট স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা ইসলামী সংস্কৃতির অংশ। এ সময়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে ঢিলা-কুলুখ বা টয়লেট পেপার এবং প্রয়োজনীয় পানি ব্যবহার করতে হয়। পায়খানায় বাম পা দিয়ে ঢুকতে হয় এবং ডান পা দিয়ে বের হতে হয়। প্রবেশের সময় বলতে হয় :

اللهم انى اعوذبك من الخبث والخبائث

"হে আল্লাহ্! শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই।"[১] এবং বের হওয়ার সময় বলতে হয় :

الحمدلله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى-

"সকল প্রসংশা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে স্বস্তি দিয়েছেন।"[২]

হাসি

অট্ট হাসি নয় বরং পরিমিত মুচকি হাসি ইসলামী সংস্কৃতির অংঙ্গ। উম্মুল ম'মিনীন হযরত 'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স.) কে কখনো সব দাঁত বের করে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর মুখ গহ্বর বা কণ্ঠ তালু পর্যন্ত দেখা যায়, বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন।[৩]

تبسمك فى وجه اخيك صدقة-

"তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসিও সাদাকাহ।"[৪]

তাকবির

মুসলিমদের ছোট-বড় যে কোন সমাবেশে তাকবির ধ্বনি বা আল্লাহু আকবার বলা ইসলামী সংস্কৃতির একটি অংগ। আল্লাহ্ বলেন :

ولتكبروا الله على ماهداكم-

"আর তোমরা আল্লাহ্র নামে তাকবির বল, কেননা তিনি তোমাদের হিদায়াত দিয়েছেন।"[৫]

আযান, সালাত ও জামায়াত

প্রতিদিন সালাতের জন্য পাঁচবার আজান দেওয়া, মসজিদে সকল মুসলিম মিলে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা-ইসলামী সংস্কৃতির অনিবার্য অংগ। কুর'আন-হাদীসে এ বিষয়ে ব্যাপক

---

১. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৮৭৭, খন্ড- ০৫, পৃ. ৫৩৪; হাদীস নং- ১৩৯, খন্ড- ০১, পৃ. ১২৮

২. অবু অবদুল্লাহ ইব্ন মাজা, *সুনান ইব্ন মাজা*, হাদীস নং- ৩০১, অনুবাদ: মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০ খ্রী.), খন্ড- ০১, পৃ. ১৬৯

৩. *সহীহ আল বুখারী*, প্রগুক্ত, হাদীস নং- ৫৬৫৩, খন্ড- ০৫, পৃ. ৪৩৫

৪. অধ্যাপক ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৫. *আল কুর'আন*, ০২: ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং কাদকামাতিস সালাত ছাড়া ইকামতের বাক্যগুলো একবার একবার করে বলার জন্য বেলালকে হুকুম দেয়া হয়েছিল।[১]

لقد هممت ان امربالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لايشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار-

জামায়াতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন : "আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি সালাত কায়েমের নির্দেশ দেই এবং এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে সালাত পড়তে আদেশ করি। অতঃপর আমি লাকড়িসহ একদল লোককে নিয়ে বেরিয়ে যাই সেই সব লোকের নিকট যারা জামায়াতে উপস্থিত হয়নি, এরপর তাদের সহ তাদে বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে ভস্মীভত করে দেই।[২]

জানাযা

মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার জানাযা দিতে হয়। মৃতের জানাযায় উপস্থিত হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরযে কেফায়া। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন:

حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز واجابة الدعوة و تشميت العاطس-

"এক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের পঁচটি হক রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল-মৃত্যু হলে জানাযায় উপস্থিত হওয়া।"[৩]

للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده اذا مرض ويشهده اذا مات ويجيبه اذا دعاه ويسلم عليه اذا لقيه ويشمته اذا عطس وينصح له اذا غاب او شهد-

"এক মুমিনের ওপর আর এক মুমিনের ছয়টি দায়িত্ব রয়েছে ঃ সে (১) অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, (২) মারা গেলে তার জানাযায় হাযির হবে, (৩) ডাকলে তাতে সাঁড়া দিবে, (৪) তার সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম দিবে, (৫) সে হাঁচি দিলে তার জবাব দিবে এবং (৬) তার অনুপস্থিতি কিংবা উপস্থিতি সর্বাবস্থায় শুভ কামনা করবে।"[৪]

গোশত খাওয়া

হালাল গরুর গোশত খাওয়া এ সংস্কৃতির বিশেষ দিক। আবার হালাল পশুও বৈধ উপায়ে জবেহ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন :

ولاتا كلواممالم يذكراسم الله عليه-

---

১. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৭০, খন্ড- ০১, পৃ. ৩০০

২. *সুনান ইব্ন মাজা*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭৯১, খন্ড- ০১, পৃ. ৩৬১

৩. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১৬১, খন্ড- ০১, পৃ. ৫৪৪

৪. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬৭৪, খন্ড- ০৫, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

"আর তোমরা এমন পশুর গোশত খাবে না যা জবেহের সময় আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করা হয়নি।"[১]

আর রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

لاتقطعوا اللحم بالسكين فانه من صنيع الاعجم وانهسوه فانه اهنا وامرا

"তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত কেটে আহার করো না। কেননা এটা আজামীদের (অনারবদের) রীতি, বরং তা দাঁত দিয়ে কামরে খাও। কারণ তা অধিক উপকারী ও স্বাস্থ্যকর।"[২]

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি "শয়তানেরা নিজেদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়" (সূরা আনআ'ম ঃ ১২১) শীর্ষক আয়াত উল্লেখপূর্বক বলেন, শয়তানেরা বলে যে, যা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে তা ভক্ষণ করো না এবং যা আল্লাহ্‌র নাম বাদ দিয়ে যবেহ করা হয়েছে তা খাও। অতএব মহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেন : "যাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়নি তার কিছুই আহার করো না" (সূরা আনআ'ম ঃ ১২১)।[৩]

সাহ্‌রী ও ইফতার

রমজান মাসে রোজা রাখা, তারাবীহ সালাত আদায়, ইফতার খাওয়া ও সাহরী খাওয়া ইসলামী সংস্কৃতির বিশেষ দিক। এ সংস্কৃতি মানুষকে সহানুভূতি ও ভালবাসায় আবদ্ধ করে। ইব্‌ন 'উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন :

اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له-

"তোমরা চাঁদ দেখলে রোযা রাখ আর (শাওয়ালের) চাঁদ দেখলে ইফতার কর (রোযা বন্ধ কর) আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে (ত্রিশ দিন) হিসেব কর।"[৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

يقول لرمضان من قامه ايما نا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه-

"যে ব্যক্তি রমজানে (রাতে তারাবীহর নামাযে) ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় দাঁড়ায় তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"[৫]

সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) বলেন :

---

১. *আল কুর'আন*, ০৬: ১২১

২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৭৭৮,৩৭৭৯,৩৭৮০,৩৭৮১, খন্ড- ০৫, পৃ. ২৩৪

৩. *সুনান ইব্‌ন মাজা*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩১৭৩, খন্ড- ০৩, পৃ. ৫০৯

৪. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৬৫, খন্ড- ০২, পৃ. ২৩৩

৫. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮৬৭, খন্ড- ০২, পৃ. ২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

كنت اتسحرفى اهلى ثم تكون سرعتى ان ادرك السحور (السجود) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم-

"আমি বাড়ীতে পরিবার পরিজনদের সাথে সাহরী খেতাম।"[১]

সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) বলেন :

لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر-

"যত দিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে তত দিন পর্যন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না।"[২]

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه-

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন : "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রমজানের রোযা রাখে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ কে দেয়া হয়।"[৩]

ঈদ উৎসব

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ইসলামী সংস্কৃতির দুটি আনন্দ উৎসব। সালাত আদায়, মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেয়া এ সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন:

ياابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا-

"হে আবু বকর ! প্রত্যেক জাতির জন্যই ঈদ রয়েছে, আর এ হচ্ছে আমাদের ঈদ।"[৪]

আনাস ইব্‌নে মালেক (রা.) বলেন, জাহিলী যুগের লোকজনের প্রতি বছর দু'টি দিন নির্দিষ্ট ছিল যাতে তারা আমোদ-ফুর্তি ও আনন্দ-উৎসব করতো। নবী (স.) মদীনায় আসার পর বলেন :

عن انس بن مالك قال كان لاهل الجاهلية يومان فى كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى-

"তোমাদের জন্য দু'টি দিন ছিল যাতে তোমরা আমোদ-ফুর্তি ও আনন্দ-উৎসব করতে। এখন আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য দুই দিনের পরিবর্তে তার চেয়েও অধিক উত্তম দুইটি দিন দান করেছেন– ঈদুল ফিতরের দিন ও কুরবানীর দিন।"[৫]

প্রকৃতই ইসলামী সংস্কৃতিকে তাই মানবকল্যাণ ও সাফল্যের নিশ্চয়তা বিধায়ক ঐশী সংস্কৃতি বলা যায় নির্দ্বিধায়। যে জন্য মনব জাতির পার্থিব কল্যাণ, সাফল্য ও শান্তিলাভ এবং পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতির অনুকরণ, অনুশীলন, অনুসরণ ও বাস্তবায়ন অনিবার্য।

---

১. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৮৪, খন্ড- ০২, পৃ. ২৪১

২. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮১৮, খন্ড- ০২, পৃ. ২৫৭

৩. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৭, খন্ড- ০১, পৃ. ৭২

৪. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮৯৮, খন্ড- ০১, পৃ. ৪৩১

৫. *সুনান অন-নাসাঈ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৫৫৭, খন্ড- ০২, পৃ. ৩৫৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

চিত্তবিনোদন ও ইসলামী সংস্কৃতি

ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হলো (বৈধ সীমার মধ্যে) বিনোদন। রসিকতার ন্যায় এ অংশটাও যদি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে জীবনটা একটা বোঝা হয়ে ওঠবে। যে জীবন ব্যবস্থায় বিনোদনের স্থান নেই, তা কোন সমাজ বেশী দিন বহন করতে পারে না। রাসূল (স.) কিছু কিছু বিনোদন ভালোবাসতেন এবং বৈধ সীমার মধ্যে এ ব্যবস্থা করতেন। যেমন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বাগানে ভ্রমণের সখ ছিল। কখনো একা আবার কখনো সাথীদের নিয়ে বাগানে যেতেন এবং সেখানে বৈঠকাদিও করতেন।[১]

ইসলামী আদর্শানুসারী জীবন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে চালিত হয়। তাতে যেমন বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের অবকাশ নেই,তেমনি নেই সংকোচন ও মাত্রা হ্রাসকরণের সুযোগ। শরী'আতের দৃষ্টিতে যা বৈধ, তাকে অবৈধ কিংবা কোন অবৈধকে বৈধ করার ক্ষমতা বা অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। ইসলামী সংস্কৃতিময় জীবন ভারসাম্যপূর্ণ। কোন দিকের বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন দ্বারা সে ভারসাম্য বিনষ্ট করা সম্ভব নয়।

ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে উদ্দেশ্যহীন জীবন মানুষের গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সুনির্দিষ্ট আইন-বিধি ও ব্যবস্থাধীন লক্ষ্যানুগ জীবনই ইসলামের কাম্য। যে জীবনের লক্ষ্য বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ, ইসলামের দৃষ্টিতে তা-ই সফল জীবন। সে জীবনে খোদার নাফরমানী বা সীমালংঘনের একবিন্দু স্থান নেই। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতিময় জীবন স্থবির, নিষ্ক্রিয় বা অথর্ব নয়। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون -

"তোমরা কি (সত্যি সত্যিই) এটা ধরে নিয়েছো, আমি তোমাদের এমনিই অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের (কখনোই) আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না।"[২]

প্রকৃতপক্ষে এই জীবনই সক্রিয়, গতিশীল ও কর্ম-কোলাহলে মুখরিত। এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ইবাদাত-বন্দেগীতে অতিবাহিত হয়। এরূপ জীবন যাপন যে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। এ জীবন বৈরাগ্যবাদী নয়; কেননা দুনিয়াত্যাগী জীবন কোন মাপকাঠিতেই মানবীয় নয়; দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী ও উপাদান-উপকরণ যথাযথভাবে ভোগ-ব্যবহার এবং অল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সব কিছু কুরবানী করাই ইসলামের লক্ষ্য।

সাংস্কৃতিক জীবনের স্বল্প ও সীমিত মুহূর্তগুলোকে অর্থহীন আরাম-আয়েস বা প্রবৃত্তির দাসত্বে অতিবাহিত করা জীবনের চরম অবমাননা এবং এটাই হচ্ছে জীবনের চরম ব্যর্থতার নামান্তর

---

১. নঈম সিদ্দিকী, *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স.)*, অনুবাদ: আকরাম ফারুক (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ১০২

২. *আল কুর'আন*, ২৩: ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র। ইসলামে হালাল খাদ্য গ্রহণে হালাল পানীয় পান করায় এবং হালাল পোশাক-পরিচ্ছন্ন ব্যবহারে কোন বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়নি। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا -ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

"হে মানুষ, তোমরা (আল্লাহ্র) যমীনে যা কিছু হালাল ও পবিত্র জিনিস আছে তা খাও এবং (হালাল-হারামের ব্যাপারে) শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"[১]

এখানে নিষিদ্ধ হল মাত্রাতিরিক্ততা, অপব্যয়-অপচয়, অপব্যহার ও অপপ্রয়োগ। কেননা এর ফলে মানব মনে অসুস্থ ভাবধারা ছাড়াও পরিবার ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। এক কথায়, ইসলাম মানুষের বৈষয়িক জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন উত্তম পন্থায় ও যথার্থ ভারসাম্য সহকারে পরিপূরণে ইচ্ছুক। কিন্তু জীবনে একবিন্দু বিপর্যয় সূচিত হোক তা বরদাশত করতে ইসলাম প্রস্তুত নয়। মানুষ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিটি মুহূর্ত উজ্জীবিত থাকুক, ইসলাম এটাই দেখতে চায়। তার জীবনের একটা মুহূতর্ও উদ্দেশ্যহীন কাজে অপচয় হোক, তা ইসলামের কাম্য নয় আদৌ। কিন্তু সেই সঙ্গে এও সত্য যে, নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততা মানুষের জীবনের সব রস নিঃশেষে চুষে নিয়ে সেখানে সৃষ্টি করে রুঢ়তা ও রুক্ষতা। তাই চিত্তবিনোদন প্রতিটি মানুষের জীবনে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো অপরিহার্য কাজের মাঝে চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা না থাকলে জীবনটাই একটা দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে অতি স্বাভাবিকভাবেই। তখন জীবনের বা মাধুর্য, হাস্য-রস,আনন্দ-স্ফুর্তি তেলহীন প্রদীপের মতই নিঃশেষ হয়ে যায় অনিবার্য পরিণতিতে, তাছাড়া কর্মের গভীর চিন্তায় নিরন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে থাকলে কর্মশক্তির অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তাই বাস্তব জীবনের দুর্বহ বোঝা সঠিকভাবে বহন করে চলার জন্যে মনকে সব সময় সতেজ, সক্রিয় ও উদ্যমশীল রাখা আবশ্যক।[২]

আর তার জন্যে আনন্দ স্ফুর্তি ও চিত্তবিনোদনের নানা উপায় ও মাধ্যম অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। আনন্দ-স্ফুর্তি ও চিত্তবিনোদন ব্যবস্থার দরুন মানব মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর। এর ফলে জীবনের প্রতি জাগে অপরিসীম কৌতুহল, মমত্ববোধ এবং তদ্দরুন মানুষ স্বীয় দায়িত্ব পালনে বিশেষ উদ্যমশীল হয়ে উঠতে পারে কিংবা অন্তত অল্প সময়ের জন্যে হলেও জীবনের নানাবিধ দুঃখ চিন্তা ও মর্মবেদনা থেকে সে নিস্কৃতি পেতে পারে, মনের দুঃসহ বেদনা অনেকখানি হালকা করতেও সক্ষম হয়। এতে সন্দেহ নেই যে, মানব জীবন নানা দুঃখ বেদনা ও আনন্দের সমষ্টি মাত্র। ঘটনা পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাত মানুষকে কখনো দেয় দুঃখ আর কখনো আনন্দ। এই হচ্ছে জীবনের বাস্তবতা। একারণে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার দুর্বহ ভারটা যদি মানুসের মনের ওপর বেশীক্ষণ চেপে বসে থাকে, তাহলে তা মনস্তত্ত্ব নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হতে পারে। পক্ষান্তরে আনন্দের এক পশলা হালকা বারিপাত লোকদের মানস-প্রান্তরে রচনা করতে পারে ফুল ও ফল-ভরা গুল বাগিচা।

---

১. *আল কুর'আন*, ০২: ১৮৬

২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত হর্সোৎফুল্য মনের পক্ষে অধিক কর্মক্ষম হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। আর তারই জন্যে মানুষের জীবনে চিত্তবিনোদনের সামগ্রী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অতএব চিত্তবিনোদনও সংস্কৃতিরই এক অপরহির্য দিক। ইসলাম মূলতভাবে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে নি; বরং নির্দোষ হাস্যরস, আনন্দ-স্ফুর্তি ও কৌতুককে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রেও ভারসাম্যকে উপক্ষো করতে ইসলাম রাজী হয়নি। মানুষ কেবল আনন্দ-স্ফুর্তিতে মশগুল হয়ে থাকবে এবং ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সর্ব প্রকারের চিত্তবিনোদনে জীবনের মহামূল্য সময় অতিবাহিত করবে, ইসলাম তা মোটেই পছন্দ করেনি। কেননা তার ফলে মানুষ আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফিল হয়ে যেতে পারে। আর আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফিল হয়ে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের পক্ষে নৈতিক ও মানবিক উভয় দিকের চরম বিপযর্য় ছাড়া আর কিছুই নয়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে, চিত্তবিনোদরে ব্যাপারটা বহুলাংশেই আপেক্ষিক। কার চিত্ত কিসে বিনোদন করবে আর কিসে হবে দুঃখ-ভারাক্রান্ত সে ব্যাপারে কোন স্থায়ী মানদন্ড নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আসলে লক্ষ্য হল চিত্তের বিনোদন। এখানে আনুষ্ঠনিকতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য; কিন্তু তার জন্যে ইদানিং যে সব অনুষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে সাধারণভাবে তা নিশ্চয়ই অপরিহার্য নয়। কেননা চিত্তের বিনোদনের জন্যে তা-ই একমাত্র উপায়। এ ধরনের অনুষ্ঠান ছাড়াও চিত্তের বিনোদন সম্ভব। ইসলাম এ দৃষ্টিতেই চিত্তবিনোদনের উপর গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠান হিসেবে কেবল তা-ই সমর্থন করেছে যা নির্দোষ–যার পরিনণাম ভাল ছাড়া মন্দ নয়, যাতে করে মানুষের নৈতিকতার পতন ঘটার পরিবর্তে উন্নতি সাধিত হয়, যার দ্বারা মনুষ্যত্বের সুমহান মর্যাদা রক্ষা পায়, যার ফলে মানুষ তার উন্নত মর্যাদা থেকে পশুর স্তরে নেমে যায় না। এ ধরনের যা কিছু অনুষ্ঠান ও উপকরণ হতে পারে, তা-ই ইসলামে সমর্থিত এবং মানুষের পক্ষেও তা-ই গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে যা কিছু এর বিপরীত তাকে বর্জন করাই ইসলামের দৃষ্টিতে বাঞ্চনীয় এবং মানুষের পক্ষেও তা বর্জন করা কর্তব্য। এই দৃষ্টিতে বর্তমানে চিত্তবিনোদন সামগ্রী বা মাধ্যম হিসেবে গৃহীত কতিপয় অনুষ্ঠান সর্ম্পকে খনিকটা বিস্তারিত আলোচনা করা যাচ্ছে।

সিনেমা বা চলচিত্র

বর্তমান কালে সিনেমা বা চলচিত্রকে সস্তা চিত্তবিনোদনের মাধ্যম রূপে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সিনেমার মূল উপকরণ হল ফিল্ম। ফিল্ম বিদ্যুতের ন্যায়ই এক প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক শক্তি। কিন্তু এ নৈসর্গিক শক্তিকে বর্তমানে যে অন্যায় ও অশোভন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। একটা শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যম হিসেবে সিনেমা সর্ম্পকে না বললেও ইদানিং সিনেমায় যা কিছু দেখানো হয় সে সম্পর্কে একথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। ফিল্মকে বর্তমানে অশ্লীল, নির্লজ্জ ও নৈতিকতা-বিবর্জিত দৃশ্যাবলী প্রদর্শনীর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে যে কাহিনী বা গল্প চিত্রায়িত হয়, তা অবৈধ ভালবাসা ও প্রণয়াসক্তির বিচিত্র গতি-প্রকৃতি রোমান্টিক ঘটনা-পরম্পরার আবর্তনে উদ্বেলিত। তা দর্শকদের, বিশেষত তরুণ-তরুণীদের মন-মগজ ও চরিত্রের ওপর অত্যন্ত খারাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রূপালী পর্দায় আলো-ছায়ার বিচিত্র ও রহস্যময় খেলায় যা দেখানো হয়, হুবহু তারই প্রতিফলন ঘটে দর্শকের চরিত্রে। যা থাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তাকেই ধরতে ছুঁতে ও কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্যে পাগল-পারা হয়ে ওঠে দর্শকবৃন্দ। এটা যে একান্তই স্বাভাবিক তাতে কারোর এতটুকু সন্দেহ থাকতে পাওে না এবং কেউ এর বিপরীত মতও প্রকাশ করতে পারে বলে ধারণা করা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করায় দর্শকদের মধ্যে তাৎক্ষনিক যৌন উন্মাদনা ও দুর্দমনীয় আবেগ-উচ্ছাস সৃষ্টি হওয়াও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের কাহিনীকে চিত্রায়িত করার জন্যে প্রথমেই নারী-পুরুষ তথা উদ্ভিন্ন-যৌবন যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, নগ্নতা-উচ্ছৃংখলতা, গায়রে মুহরিম নারী-পুরষের মধ্যে অন্যায় ও অসভ্য সম্পর্ক স্থাপন, নির্লজ্জ অঙ্গভঙ্গি এবং তার পরিণামে পাশবিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হওয়া অবধারিত। কেননা এসব উপাদান ছাড়া কোন রোমান্টিক কাহিনী চিত্রায়িত হতে পারে না। শুধু তা-ই নয় এক্ষেত্রে নির্লজ্জতা ও পাশবিকতার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি করার দাবি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। আর এ দাবি পূরণ নাহলে সিনেমার দর্শকদের সংখ্যাও কমে যায়। যে সিনেমার এদাবি পূরণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, তাকে যে কোন অজুহাতে উপেক্ষা করা হয়। তাছাড়া দর্শকদের যৌন পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে সিনেমার নায়ক-নায়িকা আবেগ উচ্ছাসিত আলিঙ্গন ও চুম্বন-এমনকি (বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে) যৌন মিলনের বাস্তব দৃশ্যের অবতারণা করাও আবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এসব অশালীন, গর্হিত ক্রিয়া কর্ম ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না; শুধু তা-ই নয়, কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও রুচিশীল মানুষই তা বরদাশত করতে পারে না। এগুলো যে মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে ? আর তা একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم --ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

"(ভালো মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা– যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা (এর দ্বারা) নিজেদের ওপর যুলুম করে ফেলে (সাথে সাথেই) তারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং গুনাহের জন্যে (আল্লাহ্র) ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কে আছে যে (তাদের) গুনাহ মাফ করে দিতে পারে ? (তদুপরি) এরা যেনে বুঝে নিজেদের গুনাহের ওপর কখনো অটল হয়ে বসে থাকে না।"[১]

সিনেমা ও নাট্যাভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বারে বারে ও ঘনঘন নিজেদের ভূমিকা বদলাতে হয়। বহু রূপে রূপান্তরিত করতে হয় নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে, ব্যক্তি-চরিত্রকে, আর তার ফলে তাদের চরিত্র নিজস্ব স্বকীয়তা ও বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলে। অত:পর কেউ আর নিজস্ব কোন চারিত্রিক রূপ আছে বলে দাবি করতে পারে না। এর ফলে অভিনেতা অভিনেত্রীদের চরিত্র পুরোপুরি বহুরূপী হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যখন প্রতিটি মানুষকে তার আয়ুস্কালের প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে দায়ী করেছেন এবং কোন মানুষকে তার ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্যকে কুরবান করার নির্দেশ দেননি, তখন এ ধরনের কোন কাজ যে তাঁর নিকট পছন্দনীয় হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। অনেক ক্ষেত্রে সৎ লোককে অসৎ লোকের ভূমিকায় ও অসৎ লোককে সৎ লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয় এবং নিজেকে অনুরূপ সাজসজ্জায় ভূষিত করে দর্শকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। এর ফলে তাদের চরিত্রে এক ধরনের কৃত্রিম গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে অনিবার্যভাবে। এটা মানবতার পক্ষে খুবই মারাত্মক । কেননা এতে মহান স্রষ্টার স্বাভাবিক

১. *আল কুর'আন*, ০৩: ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও উপহাস করা হয়। একারণে ফিল্মের বর্তমান অন্যায় ব্যবহার বন্ধ করা ছাড়া মানবতার মর্যাদা রক্ষার আর কোন উপায় নেই।[১]

মূলত সিনেমা ও ফটোগ্রাফী গৃহীত হয় নিষ্প্রাণ প্লাষ্টিক ফিতার (Negative Film) ওপর। একে যদি ইতিবাচক শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তাহলে মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হতে পারে। সেটা করা হলে চলচ্চিত্র এমন একটা শক্তি হয়ে ওঠতে পারে, যার দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষকে শুধু অক্ষর জ্ঞনসম্পন্নই নয়, অশিক্ষিতদেরকেও উচ্চতর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুসমৃদ্ধ করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। বহু মানুষকে দুনিয়ার সাধারণ জ্ঞান (General knowledge) এবং নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনী সম্পর্কে পূর্ণ অবহিতি দিয়ে ধন্য করা যেতে পারে। ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে এতে অন্যায় কিছু থাকে না। এতেও হয়ত প্রাণীর ছবি পর্দায় ভেসে ওঠবে; কিন্তু তা দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতই ক্ষণস্থায়ী। আর দর্পনে প্রতিফলিত ছবি যে নিষিদ্ধ নয় তা সকলেরই জানা কথা। তা সেই ছবি নয়, যা শরী'আতে নিষিদ্ধ।

প্রাণীর ছবি

প্রাণীর ছবি অঙ্কন বা প্রতিকৃতি (Statue) নির্মাণ ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীসে এ সম্পর্কে কঠিন নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। নিছক চিত্তবিনোদনের খাতিরে এ ধরনের কাজ করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله

"কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাস্তির সম্মূখীন হবে তারা, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সদৃশ্য তৈরি করে।"[২]

অবশ্য নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবি তোলা বা তার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ নয়। তাতে দোষেরও কিছু নেই। এরূপ কাজে বরং ড্রয়িং ও প্রকৌশল বিদ্যার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে। ইসলামে প্রতিমূর্তি নির্মাণ–বর্তমানে যাকে বলা হয় ভাষ্কর্য–শুরু থেকেই নিষিদ্ধ এবং অন্যায় বলে চিহ্নিত। নবী ও রাসূলগন এরূপ কাজের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। মুসলিম জাতি প্রথম দিন থেকেই মূর্তিভাঙ্গা জাতি নামে পরিচিত। কাজেই প্রতিমূর্তি নির্মাণ কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না,আধুনিক শিল্পকলার দৃষ্টিতে তার যত বেশী মর্যাদাই স্বীকার করা হোক না-কেন। একটি মূর্তি-পূজক জাতির পক্ষেই এটা শোভা পায়। নূহ (আ.) এর কওমের মূর্তিপূজার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

وقالوا لاتذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا-وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضللا

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

২. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১০৭, খন্ড- ০১, পৃ. ১১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

"তারা বলে, তোমরা তোমাদের (সেসব) দেবতাদের কোন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করো না আর 'ওয়াদ' এবং 'সূয়া' (নামক দেবতাদের) উপাসনা কিছুতেই ছেড়ে দিয়ো না, 'ইয়গুস', 'ইয়াউক' ও 'নাছর' নামের দেব দেবীকেও (ছাড়বে) না। (হে মালিক,) এরা বিশাল এক জনগোষ্ঠীকে পথভ্রষ্ট করছে, তুমিও আজ এ যালেমদের জন্যে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিয়ো না।"[১]

ইসলামে মূর্তি নির্মাণ ও মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ এজন্যে যে, এটা শিরকের উৎস আর শিরক ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ। যে সমাজে শিরক অনুষ্ঠিত হয়, সে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামক ব্যধির মতোই এই রোগ সংক্রামিত হয় এবং সকলকে মুশরিক বানিয়ে ছাড়ে। এই কারণে অল্প সময়ের তরে বা শিল্প-কলার খাতিরেও এই কাজকে বরদাশত করা যেতে পারে না। ইসলামী সমাজের আদর্শ পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর জাতির মূর্তি খামারের সব ক'টি মূর্তিই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা বিজয়ের পর কা'বা ঘরে অবস্থিত তিনশ ষাটটি মূর্তিকে বাইরে নিক্ষেপ করে ঘোঘণা করেছিলেন :

جاءالحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اسراء

"সত্য এসেছে, মিথ্যা ও অসত্য নির্মূল ও বিলীন হয়ে গেছে।"[২]

তাই মূর্তি নির্মাণের কাজ তাওহীদ বিশ্বাসীদের পক্ষে কোনরূপ গৌরবজনক কাজ হতে পারে না, কাল বিবর্তনে তার নাম যাই হোকনা কেন। প্রকৃতপক্ষে একাজ মানবতার ললাটে কলঙ্ক টিকামাত্র। আধুনিক Finearts (ললিতকলায়) ও Sculpture (ভাস্কর্যবিদ্যায়) এইসব পঙ্কিল ভাবধারা পুরোমাত্রায় স্থান পেয়েছে। আসলে মূর্তি-পূজার প্রাচীনতম ভাবধারা আধুনিক যুগে ভাস্কর্য শিল্পের ছদ্মাবরণে শির্ককেই সংস্থাপিত করতে চাচ্ছে। শিল্পকে এই শিরকী ভাবধারা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা ইসলামী সংস্কৃতিবানদের কর্তব্য।

তাস, দাবা ও জুয়া

বর্তমানকালে তাস, দাবা খেলা ও জুয়ায় মত্ত হয়েও বহু মানুষ অবসরে বিনোদন করে এবং এসব খেলার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে। অনেকে এসব খেলায় মেতে গিয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ,পরকালের চেতনা ও শরী'আতের অনুসরণ, ঘর-সংসার ও যাবতীয় দায়-দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে থাকতেই চাইছে। তাদের সামনে জীবনের কোন বৃহত্তর বা মহত্তর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। কোন প্রকার আনন্দ-স্ফুর্তিতে মশগুল হয়ে জীবনের মহামূল্য মুহূর্তগুলো কাটিয়ে দেয়ার এই প্রয়াস মানব সমাজের জন্যে অত্যন্ত মারাত্মক। তাস ও দাবা খেলায় চিন্তাশক্তি সূক্ষ্মতা লাভ করে বলে দাবি করা হয়; একথা কোন নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব। এতে বরং জীবনের মহামূল্য সময়ের অকারণ অপচয় ঘটে। যে জাতির বেশীরভাগ লোক এ রোগে আক্রান্ত সে জাতি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ও সমস্যা-সংকুল এই জগতে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। প্রতিযোগীতায় পরাজিত হওয়া ও শেষ পর্যন্ত বিশ্ব-পটভূমি থেকে চিরবিদায় গ্রহণই হয় সে জাতির ললাট-লিখন। ইদানীং লটারীসহ নানা ধরনের জুয়াকে এদেশে সরকারীভাবেই উৎসাহিত করা হচ্ছে;

---

১. *আল কুর'আন*, ৭১: ২৩,২৪

২. *আল কুর'আন*, ১৭: ৮১

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জুয়া খেলা হচ্ছে অন্যায়ভাবে অর্থলুণ্ঠন কিংবা অসতর্কতার মধ্যে নিজের সর্বস্ব খুইয়ে সর্বহারা হওয়ার একটা কার্যকর মাধ্যম। ইসলামে এ কারণেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সূরা আল মায়েদায় সর্বপ্রকার জুয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।[১] বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ও অযোধ্যার মুসলিম রাজত্বের নির্মম পতন ঘটার মূলে এই জুয়া খেলা যে প্রধান কারণ তা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। কোন কোন সাহাবীদের মতে দাবা খেলা মাকরুহ। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) বলেন :

عن عبدالله بن عمر انه كان اذا وجد احدا من اهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها قال يحيى وسمعت قوله تعالى لاخير فى الشطرنج وكرهها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الاية فما ذا بعدالحق الا الضلال

আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি যখনই তাঁর পরিবারের কাউকে পাশা বা ছক্কা খেলা অবস্থায় দেখতেন, তখনই তিনি তাকে প্রহার করতেন এবং খেলার সামগ্রী ভেঙ্গে ফেলতেন। ইয়াহইয়া বলেন, আর আমি মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "ফামা যা বা'দাল হাক্কি ইল্লাদ্দলাল"[২] এর আলোকে তিনি বলতেন, দাবা খেলায় কোন কল্যাণ নেই এবং এও বলতে শুনেছি যে, দাবা ও দাবা জাতীয় খেলাকে রাসূলুল্লাহ (স.) অপছন্দ করতেন।[৩]

নৃত্য-সংগীত

নৃত্য-সঙ্গীত ও বাদ্য-যন্ত্রের সূর মূর্ছনা বর্তমান সমাজের চিত্তবিনোদনের আকর্ষণীয় উপকরণরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত। বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুন্দরী যুবতীরাই সাধারণত নাচ-গানের আসরে নামে। নৃত্যহীন সংগীত অথবা নিঃশব্দ নৃত্য দুটিই বর্তমান কালের সংস্কৃতিচর্চার বিশেষ মাধ্যম। নৃত্য-সংগীত মূলত ত্রয়ার্থবোধক। তাতে রয়েছে গীত, বাদ্য ও নৃত্য। এ তিনটির সমন্বয়েই নৃত্য-সংগীত। স্বতন্ত্রভাবে নাচ ও গানের বিশেষণ করা হলে এর আসল রূপটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গান মিষ্টি কণ্ঠের সুমার্জিত সুর ঝঙ্কার। তার স্বাভাবিক আকর্ষণ তার সুরের ও তালের মধ্যে নিহিত। বিশেষ মানে ও ভঙ্গিতে কণ্ঠধ্বনির উত্থান পতন লয় তথা ছন্দই হচ্ছে গান। শ্রোতাবৃন্দ এ সুর-মুর্ছনায় মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে যায়। তাদের কর্ণকুহরে যেন মধুবর্ষণ হয়। গানের এ সুর-তরঙ্গে থাকে এক ধরনের মাদকতা। শ্রোতাকে তা মাতাল করে দেয়। অনেকে আবার গানের সুরেই সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত নন। গান যার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে–গলে গলে নিঃসৃত হচ্ছে যার কণ্ঠনালি দিয়ে এ মধুর সুর-ঝঙ্কার তার প্রতি নয়, বরং তার অবয়বের প্রতিই শ্রোতাদের আকর্ষণ থাকে সর্বাধিক কণ্ঠস্বর ও অবয়ব উভয়ই যদি মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক হয়, তাহলেই সোনায় সোহাগা।[৪]

---

১. *আল কুর'আন*, ০৫: ৯০

২. *আল কুর'আন*, ১০: ৩২

৩. ইমাম মালেক ইব্ন আনাস, *আল মুয়াত্তা* (কায়রো: দার আল-ফাজর, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৬৩১

৪. আরিফুল হক, *সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ* (ঢাকা: দেশজ প্রকাশন, ২০০০ খ্রী.), পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এই দুটিই মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য বিষের মতো সংহারক। বিষ দেহকে হত্যা করে, জীবনের অবসান ঘটায় আর নাচ মনুষ্যত্বকে করে পর্যুদস্ত। কেননা শুধু হাত-পা নাড়ানোই নৃত্য নয়। নাচের মুদ্রা প্রয়োগের সাথে সাথে দেহ যখন কথা কয়, তখনই নাচ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আর নৃত্যের তালে তালে দেহ কথা বলে ওঠে তখন যখন অঙ্গ-ভঙ্গি দেখে ক্ষুধাতুর দর্শকবৃন্দ তা ধরবার ও মন্থন করবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে আর এই অবস্থাটাই ইসলামী দৃষ্টিতে বর্জনীয়। কেননা এর পরবর্তী পর্যায়ই হচ্ছে যৌন মিলন পিয়াসার আস্বাদন। এতে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে তা নিঃসন্দেহ; কিন্তু সে সংস্কৃতি পশুপালের, মানুষ কুলের নয়। যুবক-যুবতীর যুগল বা দলবদ্ধ নৃত্য যৌন-কাতর চিত্তেরই বিনোদন করে। যে চিত্তে খোদার যিক্‌র নিহিত, তার কাছে এ বিনোদন শুধু বিরক্তিকরই নয়, বরং অসহ্যও বটে।[১]

নৃত্য ও সংগীতের এ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি পৌত্তলিকদের দেব-মন্দিরে পূজার আরতি দানের আত্মনিবেদনে তা যখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত হয়, তখন শ্রোতৃবৃন্দই হয় তার দেবতা এবং গান ও নৃত্যের মাধ্যমে যুবতী নারীশিল্পী তাদের নিকট করে আত্মনিবেদন। বিদেশী ও বিধর্মীদের প্রায় দু'শ বছরের গোলামীর যুগে এসব জিনিস মুসলিম সমাজে–বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কেননা সেকালের শিক্ষা, সমাজ ও পরিবেশ থেকেই এর সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। ফলে মুসলিম সমাজে এমন সব লোক জন্মেছে যারা মনে করে সংগীত, যুগল নৃত্য ও সহ-অভিনয়ে কোন দোষ নেই। ব্যক্তি চরিত্র ও আদর্শবাদের চরম বিপর্যয়ই যে এর একমাত্র কারণ, তাতে সন্দেহ নেই।

নারী কণ্ঠের সুরেলা ঝংকার ভিন পুরুষের মাঝে যৌন স্পৃহার উদ্বেলিত তরঙ্গ মালার সৃষ্টি করে, সে কথা সবাই জানে,সবাই বুঝে। এ জন্যই নবী কারীম (স) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الزرع -

"পানি যেমনিভাবে ফসল উৎপাদন করে, গান তেমনিভাবে অন্তরে মুনাফেকীর জন্ম দেয়।"[২]

হানাফী মাযহাবের কোন কোন ইমামের মতে :

سماع الغناء فسق والجلوس عليها نفق والتلذذ بها كفر-

"গানের শ্রবণ করা ফাসেকী, গানের বৈঠকে বসা মুনাফেকী এবং গানের তালে তাল মিলানো কুফরী।"[৩]

الغناءاشد من الزنا-

"সংগীত ব্যভিচারের তুলনায় অধিক মারাত্মক।"[৪]

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৯১

২. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হদীস নং- ৪৯২৭

৩. আরশিফ মুলতাকা, খুতবার সারসংক্ষেপ, ভলিয়ম- ১২৮, পৃ. ২৩৬ (মাকতাবা শামেলা থেকে প্রাপ্ত)

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

Dhaka University Institutional Repository

কেননা গান-বাদ্য-নৃত্যের মাদকতা মানুষের মন-মগজকে সহজেই বিভ্রান্ত করে। তাতে জাগিয়ে দেয় এক ধরনের আবেগ-আসক্তি। যার অনিবার্য পরিণতি হল নৈতিক বন্ধনের শিথিলতা আর তারই পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন আকাংখার পরিতৃপ্তি।

কুর'আন মাজীদে সংগীত,গান-বাজনা,নৃত্যেকে لهو الحديث বলা হয়েছে।[১] এর শব্দিক অর্থ হল এমন কথা,যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, দায়িত্ব ও কর্তব্যে তাকে গাফিল ও অসতর্ক বানিয়ে দেয়। নিরপেক্ষ ও অনাসক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে যারা এ জিনিসের ক্রিয়া-প্রতিক্রয়া লক্ষ্য করবেন তারাই কুর'আনের এ ঘোষণার যথার্থতা ও বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। সুসজ্জিত ও মনোরম দৃশ্য সমন্বিত রঙ্গমঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর বন্যায় ডুবে রঙ-বেরঙের তরঙ্গের তালে তালে সুন্দরী যুবতী তথা উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারী ও পুরুষ যখন কণ্ঠে কণ্ঠ, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ও হাতে হাত ধরে এবং প্রয়োজনে বুকে বুক মিলিয়ে সংগীত ও নৃত্যের মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে,তখন দর্শককুল যে সম্পূর্ণরূপে বিভোর, আত্মহারা ও দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধের বিলোপ ঘটে, সুস্থ অনুভূতিসম্পন কোন মানুষই তা অস্বীকার করতে পারে না। তাই এসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে কুর'আন-হদীসের ঘোষণাবলীর সত্যতা ও যৌক্তিকতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আসলে এগুলো মানুষের মনুষ্যত্ব, রুচিবোধ ও নৈতিকতা ধ্বংস করার এক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র। সত্যিকার ঈমান ও বলিষ্ঠ ইসলামী চরিত্র দিয়েই এ ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন-ভিন্ন করা যেতে পারে, অন্য কিছু দিয়ে নয়।[২]

মনে রাখা আবশ্যক, এখানে যা কিছু বলা হল, তা আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্য উম্মুক্ত মঞ্চস্থ নৃত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত বা পাবারিক পর্যায়ে, একান্তভাবে মেয়েদের পরিবেশে কেবল মেয়েরাই এবং পুরুষদের মজলিসে কেবল পুরুষরাই কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই যদি ভাল অর্থপূর্ণ গান গায় এবং তাতে নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত না হয়, তাহলে তাতে উপরোক্ত দোষত্রুটি থাকে না বলেই তা নিষিদ্ধ নয়, দোষণীয়ও নয়, যদি ছোট ছোট মেয়েরা শৈশবকালীন খেলা-তামাশায় মেতে গিয়ে নিজস্বভাবে তেমন কিছু করে। নবী করীম (স.) ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে এ ধরনের জাঁক-জমকহীন অনুষ্ঠানকে নিষেধ করেন নি–নিষেধ করেননি উষ্ট্র চালকের একক মরু সংগীতকে। তাই নিষিদ্ধ নয় মাঝির নিরহঙ্কার ও বাদ্যযন্ত্রহীন ভাটিয়লি সুরের গান, চাষীর আবেগ-বিধুর কণ্ঠের চৈতালী সুর।

পূর্বেই বলেছি, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খোঁজ করলে জানতে পারা যাবে যে, নৃত্য-সংগীত তথা গান ও নাচ সর্বপ্রথম অনুষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে আদিম কালের দেব-দেবীর পূজা-উপাসনায় ও তাদের উদ্দেশ্য আত্মনিবেদনের অনুষ্ঠানে। ভজন নৃত্যের তালে তালে দেবতার সামনে আত্মসমর্পন হিন্দুদের পূজা-অর্চনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। খৃষ্টানদের অর্কেষ্ট্রা (Orchestra) তাদের শির্ক-পঙ্কিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামান্তর। ইসলামে তা অনিবার্য কারণেই নিষিদ্ধ। যদিও মিষ্ট কণ্ঠধ্বনিতে কুর'আন মাজীদ পাঠ শুধু জায়েজই নয়, প্রসংশনীয়ও; কিন্তু তার সাথে সংগীতের তাল-লয় ও সমবেত সুরের সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ হারাম।[৩]

---

১. *আল কুর'আন*, ৩১: ০৬

২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৯২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সুরাপান

সুরাপান পবিত্র কুর'আনুল কারীমের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং মারাত্মক অপরাধ বা কবীরা গুনাহ। যেমন মহান আল্লহ্‌র ঘোষণা :

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون -

"হে ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ ! মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক শর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ, অতএব তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করো। আশা করা যায় তোমরা মুক্তি পাবে।"[১]

কিন্তু চরিত্রহীন লোকেরা নিছক চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে সুরা পান করে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের মন-মগজে গুনাহর অনুভূতিটুকুও জাগে না। বস্তুত সুরা হল সব রকমের অশ্লীলতা, চরিত্রহীতা ও অপরাধপ্রবণতার মৌল উৎস। শরী'আতের দৃষ্টিতে তা পান করা, পান করানো, তৈরী করা এবং বিক্রয় ও পরিবেশন করা অকাট্যভাবে হারাম। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه -

"শরাব, শরাব পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক ও শোধনকারী, যে উৎপাদন করায়, সরবরাহকারী এবং যার জন্য সরবরাহ করা হয়, এদের সবাইকে আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত করেছেন।"[২]

কেননা সুরা পানের ফলে পানকারীর জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি সম্পূর্নরূপে লোপ পেয়ে যায়। তার কাছে মা-বোন, ঔরসজাত কণ্যা ও স্ত্রীর মধ্যে কোন পার্থক্যবোধ অবশিষ্ট থাকে না। স্নায়ুবিক দিক দিয়ে উচ্ছ্বাস–বিজিত হয়ে যায়। ফলে জাতির চরিত্র, মূল্যবোধ ও অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। অনেকে সুরাকে একটা সাধারণ পাণীয়ই মনে করে। এজন্যে এব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ। এর মারাত্মক পরিণতির কথা তারা চিন্তা ও বিবেচনা করতেই প্রস্তুত নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুরা একটা পানীয় বা নিছক চিত্তবিনোদন উপকরণ মাত্রই নয়। আসলে সুরা একটি সংস্কৃতি, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার ভিত্তি। এমন কি, তা একটা জীবন পদ্ধতিও এবং তা কোনক্রমেই ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলমী সভ্যতা ও জীবন পদ্ধতির মধ্যে স্থান লাভ করতে পারে না। সুরা পানের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ন্যায়–অন্যায় বোধের বিলুপ্তি, নারী–পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং এর সঙ্গে জড়িত থাকবে অপরাধপ্রবণতা, বিশেষত নরহত্যা বা রক্তপাত। তার ফলে গোটা সমাজ ও জাতিই চরম ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াতে বাধ্য।

বস্তুত মনের স্বস্তি–প্রশান্তি-স্থিতি ও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। আল্লাহ্‌ , রাসূল ও পরকালের প্রতি অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং তদভিত্তিক ও তদনুকূল

---

১. *আল কুর'আন*, ০৫: ৯০

২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৬৭৪, খন্ড- ০৫, পৃ. ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠানাদিই তার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যম। ইসলামী অনুষ্ঠানাদি মানুষকে মূর্খতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেয়। তাদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে খোদাভীতি, পরকালের জবাবদিহিতা এবং জীবনের প্রতিপদে, প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলের অনুসরণের সুদৃঢ় ভাবধারা।

দৌড় প্রতিযোগিতা

রাসূলুল্লাহ (স.) দৌড় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি বরং এ ব্যাপারে তিনি নিজেই উৎসাহী ছিলেন। সাহাবীগণও দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতেন। হযরত আলী (রা.) দৌড় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে খুব দ্রুতগতি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। হযরত 'আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। তিনি বলেন :

خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فى بعض اسفاره وانا جارية لم احمل اللحم ولم ابدن فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال لى تعالى حتى اسابقك فسابقته فسبقته فسكت عنى حتى اذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه فى بعض اسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالى حتى اسابقك فسابقته فسبقنى فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك -

"আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে কোন এক সফরে বের হলাম। তখন আমি বয়সে ছিলাম বালিকা এবং শরীর তখনও ভারী হয়নি। এক সময় রাসূলুল্লাহ (স.) লোকদেরকে সামনে অগ্রসর হতে বললে তারা সামনে অগ্রসর হতে লাগল। রাসূল (স.) আমাকে বললেন এসো আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি, তখন আমি তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম এবং আমি এগিয়ে গেলাম। এরপর তিনি এব্যাপারে আমাকে আর কিছুই বললেন না। পরে যখন আমার শরীর ভারী হয়ে গেল এবং আমি সম্পূর্ণরূপে বিষয়টি ভুলে গেলাম তখন আবারো তাঁর সাথে এক সফরে বের হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) লোকদেরকে সামনে অগ্রসর হতে বললে তারা সামনে অগ্রসর হতে লাগল। এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন, এসো আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি, তখন আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলে তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন এবং বললেন এবার সেবারের বদলা নিলাম।"[১]

কুস্তি করা

বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) মহান আল্লাহ্‌র একান্ত প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে অগমন করেছিলেন। তিনি কোন কুস্তিগীর বা মল্লযোদ্ধা হিসেবে তথায় আগমন করেননি; কিন্তু তিনি আরবের বিখ্যাত কুস্তিগীর রুকানাহকে এক মল্লযুদ্ধে প্রতিবারই হারিয়ে দিয়েছিলেন। হাদীসে ঘটনাটি এভাবে এসেছে,

ان ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس -

রুকানাহ নামক এক নামকরা কুস্তিগীর নবী কারীম (স.) এর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন। তাতে তিনি তাকে (রুকানাহকে) আছাড় দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। রুকানাহ বর্ণনা করেছেন, আমি

১. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ২৫০৭৫ (কায়রো: মাওকা'উল ইসলাম, তা.বি.), পৃ. ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

নবী (স.) কে বলতে শুনেছি, আমাদের মাঝে ও মুশরিকদের মাঝে মর্যাদাগত পার্থক্য ঠিক সেইরূপ যেমনটি টুপির ওপর পাগড়ীর অবস্থান।[১]

তীর নিক্ষেপ

তীর নিক্ষেপণ বা তীরন্দাজী একটি শরী'আত সম্মত খেলা। বিশ্বনবী (স.) সাহাবায়ে কেরামকে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করতেন। যেমনটি তিনি বলেছেন :

ارموا واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل الارميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته امراته فانهن من الحق-

"তোমরা তীরন্দাজী কর এবং ঘোড়ায় আরোহন কর, তবে ঘোড়ায় আরোহন করার চাইতে তীরন্দাজী করাটাই আমার নিকট বেশী প্রিয়। একজন মুসলিম ব্যক্তি যা কিছু খেলাধুলা করে তার সবই অনর্থক; কেবল কয়েকটি খেলা ছাড়া। আর সেগুলো হলো, ধনুক থেকে তীর ছোঁড়া, নিজ ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং স্ত্রির সাথে বিনোদন করা। কেননা এটি তাদের প্রাপ্য।"[২]

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيئ فى سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون

"তাদের (সাথে যুদ্ধের) জন্যে তোমরা যথাসাধ্য শক্তি, সাজ-সরঞ্জাম ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহ্র দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেবে, (এ ছাড়াও কিছু লোক আছে) যাদের পরিচয় তোমরা জনো না,শুধু আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের চেনেন; আল্লাহ্র পথে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের (পরকালে) আদায় করে দেয়া হবে এবং তেমাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।"[৩]

বল্লম চালানো

ইসলামী সংস্কৃতিতে বল্লম চালানোও এক ধরনের বৈধ খেলা, যার অনুমোদন রাসূলুল্লাহ (স.) দিয়েছিলেন। হাবশীরা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সামনেই বল্লম দিয়ে খেলত। এমনি এক খেলায় হযরত 'উমার (রা.) উপস্থিত হলেন। তিনি এ খেলা থেকে তাদেরকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে খেলোয়াড়দের প্রতি পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করলেন। তখন রাসূল (স.) 'উমার (রা.)-কে নিবৃত করেছিলেন যাতে তারা খেলতে পারে। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

دخل عمرو الحبشة يلعبون فى المسجد فزجرهم عمررضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فانما هم بنوارفدة -

---

১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪০৮৭, খন্ড- ০১, পৃ. ১৬৫৭

২. *সুনান ইব্ন মাযা*, প্রাগুক্ত হাদীস নং- ২৮১১, খন্ড- ০২, পৃ. ৪৮৫

৩. *আল কুর'আন*, ০৮: ৬০

Dhaka University Institutional Repository

"হাবশীরা যখন মাসজিদে (নববীতে) খেলছিল তখন হযরত 'উমার (রা.) প্রবেশ করলেন এবং তাদেরকে ধমক দিয়ে খেলা থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, ওদের খেলতে দাও হে 'উমার ! আর তারা হলো বনু আরফিদা গোত্রের লোক।"[১]

ঘোড়া দৌড়

রাসূলুল্লাহ (স.) ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন এবং বিজয়ী ঘোড়া ও সাওয়ারীকে পুরষ্কৃত করতেন। রাসূল (স.) এসব প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন সাধারণভাবে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে। যেহেতু এসব প্রতিযোগিতা যেমনিভাবে খেলা, তেমনি তা শরীরচর্চা এবং ব্যায়ামও। এ বিষয়ে ইবন 'উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করে বলেন :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التى اضمرت من الحفياء وامدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التى لم تضمر من الثنية الى مسجد بنى زريق -

"একবার রাসূলুল্লাহ (স.) বাছাইকৃত ঘোড়াগুলোর মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন, যাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় উপত্যকার শেষ প্রান্ত। আরেকবার তিনি সাধারণ ঘোড়ার মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন, সেখানে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল উপত্যকার এক প্রান্ত হতে মাস্‌জিদে বানু যুরাইক পর্যন্ত।"[২]

শিকার করা

ইসলামে শিকার একটি অত্যন্ত উপকারী ও কল্যাণময় খেলা। যেহেতু এ শিকার এর মাধ্যমে ব্যায়াম ও শরীর চর্চা উভয়টাই হয়ে থাকে। তা কোন যন্ত্র, যেমন তীর বা বল্লমের সাহায্যে হোক, কিংবা শিকারী কুকুর বা পাখী দ্বারা হোক, উভয় ধরনের শিকারই যায়েজ। তবে ইসলাম শিকারের ক্ষেত্রে কিছুটা বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। শুধুমাত্র দু'টি সময় ছাড়া সব সময় তা করা যায়েজ। আর সে দু'ট সময় হচ্ছে হজ্জ ও 'উমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায়। কেননা এ হচ্ছে পরম শান্তি ও পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার সময়। এ সময়ে হত্যাও করা যায় না, কোন ধরনের রক্তপাতও ঘাঁন যায় না। যেমন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

احل لكم صيد البحروطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرما واتقوا الله الذى اليه تحشرون

"তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে এবং তার খাবার হচ্ছে তোমাদের জন্যে ও (সমুদ্রের) পর্যটকদের জন্যে (উৎকৃষ্ট) সম্পদ, তবে (মনে রাখবে) যতোক্ষন পর্যন্ত তোমরা ইহরাম (বাঁধা) অবস্থায় থাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত (শুধুমাত্র) স্থলভাগের শিকারই তোমাদের জন্যে হারাম থাকবে; তোমরা ভয় করো আল্লাহ্‌কে, যাঁর সমীপে তোমাদের সবাইকে জড়ো করা হবে।"[৩]

---

১. *সুনান আন নাসঈ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৫৯৬, খন্ড- ০২, পৃ. ২৩৫৫

২. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪২০, খন্ড- ০১, পৃ. ৫৭

৩. *আল কুর'আন*, ০৫: ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র আরো বলেন :

يا ايها الذين امنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حرم -ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

"হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, ইহরাম (বাঁধা) অবস্থায় কখনো শিকার হত্যা করো না, যদি তোমাদের কেউ (এ অবস্থায়) যেনে-বুঝে হত্যা করে (তার জন্যে এর বিনিময় হচ্ছে), সে যে জন্তু হত্যা করেছে তার সমান পর্যায়ের একটি গৃহপালিত জন্তু কোরবানী হিসেবে কা'বায় পৌঁছে দেবে।"[১]

সাঁতার প্রতিযোগিতা

সাঁতার প্রতিযোগিতাও ইসলামে একটি বৈধ ও উপকারী খেলা। হযরত 'উমার (রা.) সন্তানদের সাঁতার শিক্ষদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার শিক্ষা দাও।"[২] তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, এ খেলাকে কেন্দ্র করে যেন শরী'আতের অন্য সকল বিধান লঙ্ঘিত না হয়। যেমন সতর উম্মুক্ত করা এবং মেয়েদের দ্বারা প্রকাশ্যে এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

চিত্রশিল্প

রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসে চিত্রাংকন প্রসঙ্গটি বার বার এসেছে। তবে প্রায় সবগুলো হাদীসেই চিত্রাংকন ও রূপকারদের নিন্দা করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে চিত্রাংকনকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে,

ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله -

"কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শাস্তি পাবে তারা, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির সাদৃস্য তৈরী করে।"[৩]

চিত্রাংকন প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনুল কারীমে দু'টি স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম স্থানটিতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাওমের লোকদের নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে আর দ্বিতীয় স্থানটিতে হযরত সুলাইমান (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দানের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেন :

اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون -قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم فى ضلال مبين

"(হে মুহাম্মদ ! স্মরণ করুন সে সময়ের কথা) যখন সে (ইবরাহীম) তাঁর পিতা ও তাঁর জাতির (লাকদের) বললো, এ (নিষ্প্রাণ) মূর্তিগুলো আসলে কি ? যার (ইবাদাতের) জন্যে তোমরা শক্ত হয়ে বসে আছো। তারা বললো, আমরা আমাদের পিতৃপুরূষদের এগুলোর ইবাদাত করতে

---

১. *আল কুর'আন*, ০৫: ৯৫

২. *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফীল ইসলাম*, পৃ. ২৫৮; উদ্ধৃত, ড.মুহাম্মদ রেজাউল করিম, *ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি ও স্বরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

৩. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১০৭, খন্ড- ০১, পৃ. ১১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

দেখেছি (এর চাইতে বেশী অর কিছুই জানি না)। সে বললো, (এগুলোর পূজা করে) তোমরা নিজেরা (যেমন আজ) সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হচ্ছো, (তেমনি) তোমাদের পূর্বপুরুষরাও গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো।"[১]

আর দ্বিতীয় স্থানটিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات- اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادى ا لشكور

"সে (সুলাইমান) যা কিছু চাইতো তারা (জ্বিনরা) তাঁর জন্যে তাই করে দিতো, (যেমন সুরম্য) প্রাসাদ, (নানা ধরনের) ছবি, (বড়ো বড়ো) পুকুরের ন্যায় থালা ও চুলার ওপর স্থাপন করার (জন্তু-জানোয়ারসহ সবার আতিথেয়তার উপযোগী) বৃহদাকারের ডেগ; আমি বলেছি, হে দাউদ পরিবারের লোকেরা, তোমরা (আমার) শোকর সরূপ নেক কাজ করো; (আসলে) আমার বন্দাদের মাঝে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই (তাদের মালিকের) শোক্র আদায় করে।"[২]

ফটোগ্রাফি

ছবি তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হলেও অনিবার্য প্রয়োজনের সময় ছবি তোলা ও এর ব্যবহার বৈধ বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন। যেমন পাসপোর্ট, ব্যক্তিগত আইডি, চিকিৎসাসহ নানা কাজে। যেমন অনিবার্য প্রয়োজনে ছবি তোলার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ বলেন :

وان تحققت الحاجة له الى استعمل السلاح الذى فيه تمثال فلا باس باستعماله -

"যদি ছবিযুক্ত তরবারী ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে তবে তা ব্যবহারে কোন বাধা নেই।"[৩]

ইমাম আস্-সারাখসী বলেন :

ان المسلمين يتبا عون بدار هم الاعاجم فيها التماثيل بالتيجان ولا يملع احد عن المعاملة بذالك ولا باس بان يحمل الرجل فى حال الصلاة دار هم العجم وان كان فيها تمثال الملك على سريره وعليه تاجه -

"মুকুটধারী অনারব রাজার ছবিযুক্ত মুদ্রা নিয়ে মুসলিমরা লেনদেন করে আসছে, কেউ এই লেনদেনে বাধা দেননি। কেউ নামাযরত অবস্থায় অনারব মুদ্রা বহন করলে তাতে কোন অসুবিধা নেই, যদিও সে মুদ্রায় সিংহাসনে বসা মুকুটধারী রাজার ছবি থাকে।"[৪]

---

১. *আল কুর'আন*, ২১: ৫২-৫৪

২. *আল কুর'আন*, ৩৪: ১৩

৩. ইমাম শায়বানী, *আস-সিয়ার আল-কাবীর* (বৈরুত: মাওকা'উ ইয়া'সূব, তা.বি.), খন্ড- ০৩, পৃ.১০৫১

৪. ইমাম আবু বকর আস্-সারাখসী, *শারহু আস-সিয়ারিল কাবীর* (কায়রো: মাওকা'উল ইসলাম, তা.বি.), খন্ড- ০৩, পৃ. ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্যালিওগ্রাফি

রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের মত সাধারণ কোন কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া কোন জ্ঞানী না হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সময় রেখাচিত্র বা ক্যালিওগ্রাফী অঙ্কন করে স্বীয় সাহাবীগণকে বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝিয়ে দিতেন। যেমন হযরত জাবির (রা.) বলেন :

كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا امامه فقال هذا سبيل الله عزوجل وخطين عن يمينه وخطين عن شماله قال هذه سبيل الشيطان ثم وضع يده فى الخط الاسود ثم تلا هذه الاية (وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون) -

"একবার আমরা নবী কারীম (স.)-এর কাছে বসা ছিলাম, তখন তিনি নিজ হাতে মাটিতে একটি রেখা অঙ্কন করলেন। তারপর বললেন, এটি আল্লাহ্ তা'আলার পথ, অত:পর তাঁর পাশে ডানদিকে দু'টি এবং বামদিকে দু'টি রেখা অঙ্কন করলেন, তারপর বললেন, এগুলো শয়তানের পথ। অত:পর মাঝখানে অংকিত রেখার ওপর হাত রেখে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন,[১] এটা হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ সরল পথ,অতএব তোমরা এরই অনুসরণ করো, কখনো ভিন্ন পথ অবলম্বন করো না, কেননা (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে আরো একটি বিধান); আল্লাহ তা'আলা (এর মাধ্যমে) তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন (যেন তোমরা এগুলো মেনে চলো), আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।"[২]

সাহিত্য শিল্প

রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীগণকে কুর'আনুল কারীমের আলোকে বহু গল্প শুনাতেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে তাঁদেরকে কবিতা শুনাতেন এবং কবিতা আবৃত্তি করার নির্দেশও দিতেন। যারফলে পরবর্তীতে সাহাবীগণের অনেকে কবিতা রচনা করেছেন। এভাবে যুগের পরিক্রমায় সাহিত্য ইসলামী সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران-وان كنت من قبله لمن الغافلين

"(হে নবী,) আমি তোমাকে এ কুর'আনের মাধ্যমে একটি সুন্দর কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি, যা আমি তোমার কাছে ওহী হিসেবে পাঠিয়েছি, অথচ এর আগ পর্যন্ত তুমি (এ কাহিনী সম্পর্কে) ছিলে সম্পূর্ণ বেখবর লোকদেরই একজন।"[৩]

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

---

১. আল কুর'আন, ০৬: ১৫৩

২. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৭৩৯, খন্ড- ৩০, পৃ. ২৮৯

৩. *আল কুর'আন*, ১২: ০৩

Dhaka University Institutional Repository

"(হে মুহাম্মদ,) এ কাহিনীগুলো তুমি (তাদের) পড়ে শোনাও, হয়তো বা তারা চিন্তা-গবেষণা করবে।"[১]

সংস্কৃতি ও নৈতিকতা

ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে নৈতিকার গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণভাবেও নৈতিকতার এই গুরুত্ব সর্বকালে ও সর্ব সমাজে স্বীকৃত। সুদূর অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল চিন্তাবিদ ও দার্শনিকই নৈতিকতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর দুনিয়ায় প্রচলিত সকল ধর্মসূমহের ভিত্তিই রচিত হয়েছে এই নৈতিকতার ওপর এবং সে কারণে প্রত্যেক ধর্মই তার অনুসারীদের জন্যে অলংঘনীয় নৈতিক নিয়ম-বিধান পেশ করেছে। কেননা ধর্মের দৃষ্টিতে মানবজীবনের সাফল্য এই নৈতিকতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।[২] উপরন্তু দুনিয়ার শান্তি, স্বস্তি, সুখ ও সাচ্ছন্দ্য, প্রগতি ইত্যাদি নির্বিঘ্নতা, নিরাপত্তা ও নৈতিকতা ছাড়া আদৌ সম্ভবপর নয়। এটা অস্বীকার করার সাধ্য কারোর নেই। যে ব্যক্তি বা জাতি উত্তম ও নির্মল চরিত্রগুনে গুণান্বিত সেই সর্বপ্রকার কল্যাণ ও খোদায়ী রহমত ও বরকত লাভের অধিকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বা জাতি তা থেকে বঞ্চিত তার পক্ষে কল্যাণ লাভ তো দূরের কথা, কালের ঘাত-প্রতিঘাতে টিকে থাকাই অসম্ভব; কেননা সামাজিক ও তামাদ্দুনিক শৃংখলা কেবলমাত্র উত্তম নৈতিকতার দরুনই সংরক্ষিত হতে পারে। আর তা না থাকলে সে শৃংখলা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে গোটা সমাজের উচ্ছৃংখলতা ও অরাজকতার অতল গহ্বরে নিপতিত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। সমাজতত্তবিদ ও ইতিহাস-দার্শনিক আল্লামা ইব্ন খালদুনের দৃষ্টিতে জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের মূলে নিহিত আসল নিয়ামক হচ্ছে এই নৈতিকতা। তিনি লিখেছেন :

'আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতি, বংশ-গোষ্ঠী বা দলকে দেশ-নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র-কতৃত্ব দিয়ে মহামান্বিত করতে চান, তখন সর্বপ্রথম তার নৈতিক অবস্থার সংশোধন করে নেন আর তারপরই এই মর্যাদা তাকে দান করেন। অনুরূপভাবে কোন জাতি,গোষ্ঠী বা দলের হাত থেকে নেতৃত্ব ও কতৃত্ব যদি কেড়ে নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন, তাহলে পূর্বেই তাকে চরিত্রহীনতা ও দুরাচারে উদ্বুদ্ধ করে দেন। তার মধ্যে এনে দেন সব রকমের দুষ্কৃতি, অশ্লীলতা ও উচ্ছৃংখলতা আর অন্যায় ও খরাপের পথে তাকে বানিয়ে দেন দ্রুত অগ্রসরমান। এরই ফলে সে নেতৃত্ব, কতৃত্ব ও প্রশাসনিক যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তার শাসন-দন্ড শক্তিহীন হয়ে ক্রমশ তার হস্তচ্যুত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আসল শাসন ক্ষমতাই তার হাত থেকে চলে যায় আর তার স্থানে অন্যরা ক্ষমতাসীন হয়ে বসে ।'[৩]

দুনিয়ার প্রতিটি ব্যক্তিই তার জীবনে সাফল্য লাভের অভিলাষী। এই অভিলাষ কেবল মাত্র দুটি জিনিসের সাহায্যেই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে। একটি হল আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় ঈমান আর দ্বিতীয়টি হল সদাচার ও সৎ কর্ম অর্থাৎ নেক আমল। অন্যকথায়, জীবন ও জগত সংক্রান্ত মৌলনীতি ও বিশ্বাসসূমহের প্রতি অবিচল প্রত্যয়েরই অপর নাম হচ্ছে ঈমান আর তদনুযায়ী বাস্তব কাজই হল সৎ কর্ম, সদাচার বা নেক আমল। জীবনের সাফল্যের জন্যে এ দুটির সমন্বয় অপরিহার্য। ইসলাম মানুষের মুক্তি এ দুটি জিনিসের ওপর ভিত্তিশীল করে দিয়ে এ তত্ত্বেরই

---

১. *আল কুর'আন*, ০৭: ১৭৬

২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়ন চেয়েছে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুটি অবিচ্ছেদ্য–ওতপ্রোত জড়িত। তবে ঈমান হল বীজ বা ভিত্তি আর নেক আমল হল তার ওপর গড়ে ওঠা প্রাসাদ।[১] ঈমান হল বীজ বা ভিত্তি আর নেক আমল হল সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত বিরাট মহীরুহ। 'নেক আমল' এক বিরাট ও বিশাল তাৎপর্যমন্ডিত বিশেষ পরিভাষা। মানব জীবনের সব রকমের কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও একে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি ভাগের সম্পর্ক সরাসরি আল্লহ্‌র সঙ্গে আর অপর ভাগটির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হচ্ছে মানুষ তথা সৃষ্টিকুলের সঙ্গে। প্রথমটির প্রচলিত নাম 'ইবাদত' আর দ্বিতীয়টিকে বলা যায় 'মুআমালাত'। দ্বিতীয়টিকেও দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তার কতকগুলো হচ্ছে মানবীয় কর্তব্য বিশেষ, যাকে বলা হয় আখলাক বা নৈতিকতা আর অন্যগুলো আইনগত দায়িত্ব পর্যায়ের। সাধারণত একেই বলা হয় মু'আমালাত।

এই ইবাদাত ও নৈতিকতার সমন্বয়েই ইসলামী জীবন বিধান গঠিত। এ দুটি বিষয় ইসলামী জীবন বিধানের দুটি বাহু বিশেষ। তাই এর কোনটিরই গুরুত্বকে কিছুমাত্র হাল্‌কা করে দেখা যেতে পারে না। নিছক ইবাদাত মানুষকে পূর্ণ মুসলমান বানাতে পারে না যেমন, তেমনি এককভাবে শুধু নৈতিকতাও তা সম্পাদন করতে অক্ষম। কুর'আন মাজীদ এ সত্যকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। তাতে যেখানেই ইবাদাতের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই বলা হয়েছে সৎ কর্ম ও সদাচার তথা নৈতিকতা অবলম্বনের কথা–বলা হয়েছে সমান গুরুত্ব সহকারে। নিম্নোল্লিখিত আয়াতে এরই প্রমাণ পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ্‌র ভাষায় :

يايهاالذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون -

"হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আল্লাহ্‌ তায়ালার সামনে রুকু করো, সিজদা করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের যথাযথ ইবাদাত করো, নেক কাজ করতে থাকো, আশা করা যায় এতে করে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে।"[২]

বিশ্বনবীর এ দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতিকে নৈতিক বিধান, কর্মনীতি ও আদর্শবাদিতা শিক্ষা দেয়া এবং এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ তৈরী করা, চরিত্রবান মানুষকে আল্লাহ্‌র বন্ধু বানিয়ে দেয়া। নবী কারীম (স.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন :

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة -

"সেই মহান আল্লহ্‌ই নিরক্ষর লোকদের ভেতর তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল রূপে পাঠিয়েছেন। সে রাসূল তাদের সামনে আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও বাণীসমূহ তুলে ধরবে, তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও সুষ্ঠু জ্ঞান-বুদ্ধি শিক্ষা দিবে।"[৩]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

২. *আল কুর'আন*, ২২: ৭৭

৩. *আল কুর'আন*, ৬২: ০২

Dhaka University Institutional Repository

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এখানে 'হিকমাত' শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র বা নৈতিকতা। ইসলামে চরিত্রের গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা নিম্নোদ্ধৃত আয়াত থেকে আরও সুস্পষ্টভবে বুঝতে পারা যায়। সূরা আহযাবে বলা হয়েছে ঃ

لقدكان لكم في رسول الله اسوة حسنة-

"আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে, এতে কোনই সন্দেহ নেই।"[১]

সূরা ক্বালামে বলা হয়েছে ঃ

انك لعلى خلق عظيم

"নিশ্চয় তুমি চরিত্রের অতীব উচ্চ মানে অভিষিক্ত।"[২]

এ আয়াতে খোদ রাসূলে কারীম (স.)-কে বিশ্ব-মানবের জন্যে আদর্শ চরিত্রবান ব্যক্তিরূপে পেশ করা হয়েছে।

স্বয়ং রাসুলে কারিম (স.) ইরশাদ করেছেন :

بعثت لاتمم حسن الاخلاق-

"অতীব সুন্দর ও নির্মল চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।"[৩]

انمابعثت لاتمم مكارم الاخلاق-

"উত্তম গুণাবলীকে পূর্ণত্ব দানের উদ্দেশ্যেই আমাকে পাঠনো হয়েছে।"[৪]

রাসূলে কারীম (স.)-এর এই সব উক্তি থেকে স্পষ্টত : প্রমাণিত হয় যে, চরিত্রেরই অপর নাম হচ্ছে ইসলাম আর দ্বীন-ইসলামের সমগ্র বিষয়ই হচ্ছে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর উৎস।

এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (স.)-এর আরও কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করা হলো :

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا-

১. তোমাদের মাঝে ঈমানের বিচারে পূর্ণ মুমিন সে, চরিত্রের বিচারে তোমাদের মাঝে যে উত্তম ব্যক্তি।[৫]

ان خياركم احاسنكم (احسنكم) اخلاقا -

---

১. *আল কুর'আন*, ৩৩: ২২

২. *আল কুর'আন*, ৬৮: ০৪

৩. আল্লামা জলীল আহসান নদভী, *রাহে আমল*, হাদীস নং- ২৮৬, অনুবাদ: হাফেয আকরাম ফারুক (ঢাকা: মক্কা পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রী.), পৃ. ৬৭, খন্ড- ০২

৪. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৬৪ খ্রী.), পৃ. ১৬৪, খন্ড- ০১

৫. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব নং- ১৪

Dhaka University Institutional Repository

২. তোমাদের মাঝে সৎ সেই ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়ে তোমাদের সকলের তুলনায় ভাল।[১]

ان افضل شيئ فى الميزان الخلق الحسن-

৩. কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাহর পাল্লায় উত্তম ও ভাল চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী জিনিস আর কিছু হবে না।[২]

ومن حسن خلقه بني له فى اعلاها-

৪. জান্নাতের উচ্চ পর্যায়ে একখানি ঘর তাকে দেয়ার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি, যে নিজের চরিত্রকে উত্তম ও নিষ্কলুষ বানাবে।[৩]

৫. কিয়ামতের দিন তোমাদের মাঝে আমার প্রিয়তর ও নিকটতর হবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মাঝে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে। আর আমার অপছন্দনীয় ও কিয়ামতের দিন আমার থেকে অনেক দূরবর্তী হবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মাঝে খারাপ চরিত্রের অধিকারী।[৪]

التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة -

৬. আমানত রক্ষাকরী ও সত্যনিষ্ঠ মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদের সঙ্গী হবে।[৫]

৭. মানুষ উত্তম চরিত্রগুণে এমন মর্যাদা লাভ করতে পারে যা সারাদিন রোজা রেখে ও সারা রাত ইবাদাত করেই লাভ করতে পারে।[৬]

৮. উত্তম চরিত্রেরই অপর নাম হচ্ছে দ্বীন।[৭]

৯. সচ্চরিত্র ইবাদাতের অপূর্ণতা ও অপর্যাপ্ততার ক্ষতিপূরণ করে। কিন্তু চারিত্রিক দুর্বলতার ক্ষতি ইবাদত দ্বারা পূরণ হয় না। মানুষ তার সুন্দর চরিত্রের বলে জান্নাতের উচ্চতর ও উন্নততম মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে, যদিও সে একজন 'আবেদ' নামে পরিচিত হয় না। আর নিজের চরিত্রহীনতার কারণে দোজখের সর্বনিম্ন অংশে পৌঁছে যায়, যদিও সে একজন ইবাদতকারী ব্যক্তি রূপে পরিচিত।[৮]

১০. প্রতিটি জিনিসের একটা ভিত্তি থাকে আর ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে সৎ চরিত্র। [ইব্ন 'আব্বাস (রা.)][৯]

---

১. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৬০০, খন্ড- ০৫, পৃ. ৪১১

২. *জামে আত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররি, হাদীস নং- ৬১,৬২

৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৮

৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

৫. অধ্যাপক ড.এ.আর.এম.আলী হায়দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

৭. প্রাগুক্ত

৮. প্রাগুক্ত

৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১১. লোকদের সাথে ভাল চরিত্র নিয়ে মেলামেশা কর এবং (খারাপ) কাজের দরুনই তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হও।[১]

১২. চরিত্রের বিশালতা ও উদারতায়ই নিহিত রয়েছে জীবিকার সম্ভার।[২]

১৩. চারটি জিনিস মানুষকে উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে দেয়–যদিও তার আমল ও জ্ঞান-বিদ্যা কম আর তা হল : ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, বিনয়, দানশীলতা ও সৎ চরিত্র। (হযরত জুনাইদ বাগদাদী)[৩]

১৪. চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য মানুষের স্বভাবগত গুণাবলীকে পূর্ণ মাত্রায় উৎকর্ষতা দান করে, লোকদের অন্তরে মমতা ও ভালবাসার বীজ বপন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকটতর করে দেয়। (ইমাম গাজ্জালী)[৪]

চরিত্র ও ঈমান

মুসলিম হওয়ার প্রথম ও মৌল শর্ত হচ্ছে ঈমান। কিন্তু ঈমান মন-মানস ও হৃদয়-মনের একটা বিশেষ অবস্থা ও ভাবধারা এবং প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত ব্যাপার। আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর অস্তিত্ব ও অবস্থা সম্পর্কে কেউই অবহিত হতে পারে না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সৎ ও নিষ্কলংক চরিত্রকে মুমিনের ঈমানের মানদন্ড রূপে নির্ধারণ করেছেন। ইমাম গাজ্জালীর মতে ইসলামে ঈমানের সাথে চরিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও নিবিড়। মানব-মনে হীন, নীচ ও অসৎ ভাবধারা লালিত-পালিত হয় বিধায় তার ক্ষতি ও অনিষ্টকারিতা প্রবৃদ্ধি লাভ করে। ফলে এমন একটা অবস্থা দেখা দেয়, যখন মানুষ দ্বীনকে পরিত্যাগ করে বসে। তখন সে কার্যত নিজেকে লোকদের মানসে উলঙ্গ করে দেয়। এরূপ অবস্থায় তার ঈমানের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সূরা 'আল-মু'মিনূন'-এ ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে ঈমানদার লোকদের জরুরী গুণপণা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ দুটির ওপরই মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

قدافلح المؤمنون -الذينهم في صلاتهم خاشعون والذينهم عن اللغو معرضون والذينهم لزكواة فاعلون والذينهم لفروجهم حافظون الاعلي ازواجهم اومامملكت ايمانهم فانهم غيرملومين فمن ابتغى وراءذالك فاولئك هم العادون والذينهم لاماناتهم وعهدهم راعون والذينهم على صلوا تهم يحافظون -

"এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সেসব মুমিনরাই প্রকৃত সাফল্য লাভ করেছে যারা নিজেদের নামাযে ভীত-সন্ত্রস্ত অন্তরে দন্ডায়মান হয়, যারা অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে, যারা রীতিমত যাকাত প্রদান করে, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে (হারাম ব্যবহার থেকে) রক্ষা করে, যারা তাদের আমানতসমূহ ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণ করে আর যারা নিজেদের নামাযসমূহের ব্যাপারে (সমধিক) যত্নবান হয়।"[৫]

---

১. প্রাগুক্ত

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

৫. *আল কুর'আন*, ২৩: ১-৯

Dhaka University Institutional Repository

স্বয়ং নবী করীম (স.) বহু সংখ্যক হাদীসে বহু সংখ্যক গুণ-বৈশিষ্ট্যকে ঈমানদার লোকদের অপরিহার্য বিশেষত্ব রূপে গণ্য করেছেন। সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে যতটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে, ঈমানের অবস্থায়ও সেই অনুপাতে তারতম্য ঘটবে। তার অর্থ এই যে, আমাদের বাহ্যিক চরিত্র ও আচার-আচরণ আমাদের অন্তর্নিহিত ঈমানী অবস্থার মাপকাঠি বা পরিমাপ যন্ত্র। কোন লোকের ঈমানী অবস্থা বাস্তবিকপক্ষে কি তা এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়। নবী কারীম (স.) বর্ণনা করেছেন :

الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان -

১. ঈমানের ষাটেরও অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার একটি হচ্ছে লজ্জা।[১]

الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان –

২. ঈমানের বহু সংখ্যক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাওহীদের ঘোষণা আর সবচাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লোকচলাচলের পথ থেকে পীড়াদায়ক জিনিসের অপসারণ। আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি বিমেষ শাখা।[২]

৩. তিনটি কথা ঈমানের অংশ। দরিদ্রাবস্থায়ও আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা, দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসারতা বিধান এবং স্বয়ং নিজের বিরুদ্ধে হলেও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر مانهى الله عنه -

৪. মুসলিম সে, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যান্য মুসলিমগণ নিরাপদে থাকবে আর মু'মিন সে যার ওপর এতটা বিশ্বাস ও আস্থা হবে যে তার নিকট নিজের জান ও মাল আমানতরূপে অক্ষুণ্ন থাকবে।[৩]

৫. মু'মিন সে, যে অন্যকে ভালবাসে। যে লোক অন্যকে ভালবাসে না এবং তাকেও কেউ ভালবাসে না তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।[৪]

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذى -

৬. মু'মিন কারোর ওপর অভিশম্পাত করে না, কাউকে বদদো'আ দেয় না, কাউকে গালাগাল করে না এবং কারোর সাথে মুখ খারাপও করে না।[৫]

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده -

১. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ০৮, খন্ড- ০১, পৃ. ৫৯

২. *সহীহ আল মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬১, খন্ড- ০১, পৃ. ১৩০

৩. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ০৯, খন্ড- ০১, পৃ. ৬০

৪. *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

৫. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রগুক্ত, হাদীস নং- ১৯২৭, খন্ড- ০৩, পৃ. ৪০১

৭. মুসলিম সে যার মুখ ও হাত থেকে লোকেরা নিরাপদ থাকবে।[১]

اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان -

৮. তিনটি জিনিস দ্বারাই বেঈমান ও মুনাফিকের পরিচিতি পাওয়া যায়। তাহল, যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করবে এবং তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তা বিনষ্ট করবে।[২]

ان من شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه -

৯. নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে যাকে লোকেরা তার খারাপ মুখের দরুন পরিত্যাগ করেছে।[৩]

১০. মানুষকে যা কিছুই দেয়া হয়েছে, তাতে উত্তম জিনিস হল সৎ বা শুভ চরিত্র।[৪]

১১. ইসলামে অশ্লীল কথাবার্তা বলার কোন স্থান নেই। উত্তম মুসলমান সে, যে চরিত্রের দিক দিয়ে অতীব উচ্চ মর্যাদাবান।[৫]

চরিত্র ও আল্লাহ্ প্রেম

ভালবাসা মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ্ তা'আলার একটি মূল্যবান অবদান। বিশেষ করে আল্লাহ্র ভালবাসা একটি অতিবড় সম্পদ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মহামূল্য সম্পদ অর্জনের উপায় কি ?

যে সব উপায়ে এই মহামূল্য সম্পদ লাভ করা যেতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল চরিত্র। আর যেসব কারণে এই মহামূল্য সম্পদ অপহৃত হয় তন্মধ্যে চরিত্রহীনতা ও অসদাচরণ অন্যতম।

কুর'আনের দৃষ্টিতে নিম্নোদ্ধৃত নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রেম ভালোবাসা অর্জিত হতে পারে :

১. দয়া ও অনুগ্রহ। কুর'আনে বলা হয়েছে :

ان الله يحب المحسنين-

"দয়া-অনুগ্রহকারীদের আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন।"[৬]

২. সুবিচার ও ন্যায়পরতা :

ان الله يحب المقسطين-

---

১. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ০৯, খন্ড- ০১, পৃ. ৬০

২. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩২,৩৩, খন্ড- ০১, পৃ. ৭০

৩. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৯৪৬, খন্ড- ০৩, পৃ. ৪১০

৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

৬. *আল কুর'আন*, ০২: ১৯৫, ০৩: ১৩৪, ০৫: ১৩

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচার ও ইনসাফকারী লোকদেরকে ভালোবাসেন।"[১]

৩. নৈতিক ও দৈহিক পবিত্রতা বা নিষ্কলুষতা :

ان الله يحب المطهرين-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পবিত্রতা রক্ষাকারী ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারী লোকদেরকে ভালোবাসেন।"[২]

৪. ধৈর্য ধারণ করা :

والله يحب الصابرين -

"আল্লাহ্ রাব্বুল আলামী ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসেন।"[৩]

৫. একমাত্র আল্লাহ্র ওপর নির্ভরশীল হওয়া :

ان الله يحب المتوكلين-

"অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা (তাঁর ওপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন।"[৪]

৬. আল্লাহ্ভীতি অর্জন করা :

ان الله يحب المتقين -

"অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন।"[৫]

নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলো আল্লাহ্র ভালবাসা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে ঃ

১. আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন :

ان الله لايحب المعتدين-

"আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।"[৬]

২. বিশ্বাসঘাতকা ও আমানতে খিয়ানত করা :

ان الله لا يحب الخائنين-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।"[৭]

ان الله لايحب من كان خوانا اثيما-

---

১. *আল কুর'আন*, ০৫: ৪২, ৪৯: ০৯, ৬০: ০৮

২. *আল কুর'আন*, ০৯: ১০৮

৩. *আল কুর'আন*, ০৩: ১৪৬

৪. *আল কুর'আন*, ০৩: ১৫৯

৫. *আল কুর'আন*, ০৯: ০৪,০৭

৭. *আল কুর'আন*, ০২: ১৯০, ০৫: ৮৭

৭. *আল কুর'আন*, ০৮: ৫৮

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে বেশি খিয়ানতকারী ও পাপিষ্ঠ।"[১]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা কখনো বিশ্বাসঘাতক ও না-শোকর বান্দাকে ভালোবাসেন না।"[২]

৩. বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করা :

ان الله لا يحب المفسدين-

"অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।"[৩]

৪. উচ্ছৃংখলতা, অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি করা :

ان الله لايحب المسرفين-

"আল্লাহ্ বাড়াবাড়ি , উচ্ছৃংখলতা ও অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৪]

৫. অহংকার ও আত্মম্ভরিতা :

ان الله لايحب كل مختال فخور-

"কোন অহংকারী ও দাম্ভিক লোককে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।"[৫]

"অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা এমন মানুষকে কখনো পছন্দ করেন না, যে অহংকারী ও দাম্ভিক।"[৬]

৬. অন্যায় ও অত্যাচার করা :

والله لا يحب الظالمين -

"আল্লাহ্ তায়ালা যালেমদের কখনো ভালোবাসেন না।"[৭]

আল্লাহ্র গুণাবলী ও চরিত্র

বস্তুত ইসলাম উত্তম ও শুভ চরিত্রের একটি অতীব উন্নত মান ও চিন্তা-চেতনা উপস্থাপন করেছে আর তা হচ্ছে উত্তম শুভ চরিত্র। এটি মূলত খোদায়ী গুণাবলীর ছায়া এবং তারই সামান্য প্রতিফলন মাত্র। রাসূলে কারীম (স.) বলেছেন :

حسن الخلق خلق الله الاعظم

"শুভ চরিত্র আসলে আল্লাহ্ তা'আলার মহান ও সুউচ্চ চরিত্রেই প্রতিফলন মাত্র।"[৮]

---

১. *আল কুর'আন*, ০৪: ১৫৭

২. *আল কুর'আন*, ২২: ৩৮

৩. *আল কুর'আন*, ২৮: ৭৭

৪. *আল কুর'আন*, ০৬: ১৪১, ০৭: ৩১

৫. *আল কুর'আন*, ৩১: ১৮

৬. *আল কুর'আন*, ০৪: ৩৬

৭. *আল কুর'আন*, ০৩: ৫৭

৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দৃষ্টিতে উত্তম চরিত্র তা-ই যা আল্লাহ্‌র মহান গুণাবলীর প্রতিবিম্ব আর খারাপ চরিত্র বলতে আমরা বুঝি সেই সবকে, যা আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পরিপন্থি। ইসলাম মানুষের আত্মিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের উপায় রূপে নির্দিষ্ট করেছে চরিত্রকে। তার কারণ হল, চরিত্র খোদায়ী গুণাবলীর জ্যোতিমালা থেকে গৃহীত ও নিঃসৃত। এই গ্রহণ ও অর্জনে আমরা যতটা অগ্রগতি লাভ করব, আমাদের আত্মিক ও অধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ততই বেশী নিশ্চিত হবে এবং তার ধারাবাহিকতা থাকবে অব্যাহত।

চরিত্র ও ইবাদত

ইসলামী আদর্শে গুরুত্বের দিক দিয়ে চরিত্রের স্থান যদিও তৃতীয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিবেচনা করলে জানতে পারা যাবে যে, ইবাদাতসমূহ মূলত মানুষকে আদর্শ চরিত্রবান বানাবারই উপায় মাত্র। মানুষ সত্যনিষ্ঠ, সততাবাদী ও নিষ্কলুষ চরিত্রগুণের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠুক, এক মহান নৈতিক গুণাবলী আয়ত্ত ও আত্মস্থ করে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের যোগ্যতা অর্জন করুক, সেই সঙ্গে নিজের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আঞ্জাম দিক-ইবাদতসমূহের এই তো পরম ও চরম উদ্দেশ্য আর এরই অপর নাম হল চরিত্র।

বস্তুত মানব-মনের নৈতিক প্রশিক্ষণের একটা কার্যকর মাধ্যম রূপেই ইবাদাতের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরই সহায়তায় মানুষ নিজের হৃদয়াবেগ ও কামনা-বাসনা সংযত করতে সক্ষম হতে পারে । আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা ও তাঁর সামনে মস্তক অবনত করার অর্থ হচ্ছে, আমরা একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে মন-মানস ও কামনা-বাসনার স্বাধীনতাকে ত্যাগ করেছি। ইবাদাতের সময় এই অনুভূতি না জাগলে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, বিমুক্ত ও সেচ্ছাচারী মনে করলে ইবাদাতের কোন সুফল অর্জিত হতে পারে না। কেননা ইবাদাতের মর্মই হচ্ছে, মহান আল্লাহ্‌ই আমাদের একমাত্র মা'বুদ এবং আমরা একান্তভাবে তাঁরই দাসানুদাস। তাই তাঁর মুকাবিলায় আমাদের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই–কিছু থাকতে পারে না। আমাদের কামনা-বাসনা, আশা-আকাংখা ও প্রয়োজনাবলী আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক লক্ষ্যানুগও তাঁরই অধীন। কোরআনের একটি আয়াতে সালাত তরক করা ও লালসা-বাসনার অনুসরণ করার কথা এক সঙ্গে উল্লেখ করে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কামনা-বাসনা-লালসার আনুগত্য ও অনুসরণ সম্ভব ও সহজ হয়ে ওঠে ইবাদাত ত্যাগ করলে। ইবাদাত যথাযথ পালন করা হলে তা হতে পারে না।

-

সাধারণত লোকদের ধারণা হল, ঈমানের পরই সালাত, রোজা, যাকাত ও হজ্জ এই চারটির স্তম্ভের ওপরই ইসলামের সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত। নৈতিক চরিত্রের কোন গুরুত্ব এতে আছে বলে মনে করা হয় না। অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং নৈতিক চরিত্রের গুরুত্বকে কিছু মাত্র উপেক্ষা করেন নি। তাই যেখানে কোন ইবাদাত ফরয হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের উত্তম ও উন্নত চরিত্র গড়ে তোলা ও তার পূর্ণত্ব বিধানই মানুষের চরমতম লক্ষ্য। সালাত ফরয হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে,

ان الصلاة تنهى عن الفحشاءو المنكر

Dhaka University Institutional Repository

"নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে সর্বপ্রকার অন্যায়, পাপাচার ও নির্লজ্জতা থেকে বিরত রাখে।"[১]

রোজা ফরজ করেই বলে দেয়া হয়েছে, "তা মানুষের মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতির সৃষ্টি করে।"[২] যাকাত বিত্তবানদেরকে মহানুভবতা ও সহৃদয়তার শিক্ষা দেয় এবং হজ্জও বিভিন্নভাবে মানুষের নৈতিক সংশোধন ও উৎকর্ষ বিধানের কাজ করে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সালাত সম্পর্কে রাসূলে কারীম (স.) ইরশাদ করেছেন ঃ যার সালাত তাকে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার সালাত তাকে আল্লাহ্র নিকট থেকে আরও দূরে নিয়ে যায়।

সওম সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছে :

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه -

"রোজা রেখে যে লোক মিথ্যা ও প্রতারণা পরিহার করেনি, নিজের পানাহার সে বন্ধ রাখুক–তাতে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজনই নেই।"[৩]

একটি হাদীসের কথা হল,

ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم -

"মুমিন তার উত্তম ও শুভ চরিত্রের বলে (নফল) রোযাদার ও (নফল) নামাযীর মর্যাদা লাভ করতে পারে।"[৪]

যাকাত ও হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয় বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, নিজের বংশ ও পরিবার-পরিজনের মৌল অধিকার যথাযথ আদায় না হওয়া পর্যন্ত কারোর উপর তা ফরযই হয় না। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাহ্র উপর নিজের অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব করেন না, যতক্ষণ সে বান্দাহ্দের অধিকারসমূহ আদায় না করেছে।

---

১. *আল কুর'আন*, ২৯: ৪৫

২. *আল কুর'আন*, ০২: ১৮৩

৩. জামে আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬৫৭, ২য় খন্ড পৃ. ৫৫

৪. সুনান আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৭৯৮, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য

পৃথিবীর সব জিনিসের মতো সংস্কৃতিরও একটা লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যহীন সংস্কৃতি আদপেই সংস্কৃতি নামের যোগ্য নয়; তা নিতান্ত তামাসা মাত্র–তা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও উদ্দেশ্যহীনতাই বর্তমান সভ্যতার মৌল ভাবধারা; সর্ব-প্রযত্নে উদ্দেশ্যবাদকে (Objectivity) পরিহার করে চলাই এখনকার সমাজের একটা ফ্যাশান। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলবার মতো সময় এখন উপস্থিত যে, উদ্দেশ্যহীনতা নেহাত পশুকুলের বিশেষত্ব; পক্ষান্তরে মানুষের বৈশিষ্ট্যই হল তার উদ্দেশ্যবাদিতা। তাই উদ্দেশ্যবাদকে হারালে মানুষে আর পশুতে কোন পার্থক্য থাকে না। উদ্দেশ্যবাদ তথা উদ্দেশ্যর বিচারে ভুল-নির্ভুল নির্ধারণ এবং ভুল-কে বাদ দিয়ে নির্ভুল-কে গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিযে যাওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। তাহলে মানবীয় সংস্কৃতির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি ? সংস্কৃতি শব্দটিই উদ্দেশ্যের প্রবণতা ব্যক্ত করে। বাংলা সংস্কৃতি, ইংরেজী কালচার (Culture) এবং উর্দু-আরবী তাহযীব কিংবা সাক্বাফাত-এ শব্দ তিনটির যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সংস্কৃতির একটা-না একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকতেই হবে। অন্যথায় তার কোন অর্থ হয় না- হতে পারে না তার কোন বাস্তব রূপ এবং মানব জীবনেও তার কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সংস্কৃতি বলতে বুঝায় সংস্কার, সংশোধন, পরিশুদ্ধকরণ ও পরিচ্ছন্নতা বিধান। আর কালচার বলতে বুঝায় কৃষিকাজ । তাহযীবও পরিচ্ছন্নকরণ ও উন্নয়নকে বুঝায় আর সাক্বাফাতের অর্থ হল তীক্ষ্ণ, শানিত ও তেজস্বী করে তোলা। এর প্রতিটি অর্থেই উদ্দেশ্যের ব্যঞ্জনা বিধৃত। 'সংশোধন' শব্দ শোনামাত্রই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভুলগুলোকে বাদ দিয়ে তদস্থলে সঠিক ও নির্ভুল জিনিস সংস্থাপন। পরিশুদ্ধকরণ তখনি বলা চলে, যখন অপবিত্র ও অশুদ্ধ জিনিস দূর করে দেয়া হবে। আর কৃষিকাজ হল জমির আগাছা-পরগাছা ও ঝড়-জঙ্গল কেটে ফেলে, অবাঞ্ছিত তৃণ-লতা উপড়ে ফেলে লাঙ্গল দিয়ে হাল চালিয়ে জমিকে নরম-মসৃন করে সেখানে বীজ বপন করা। এসব ক্ষেত্রেই ভাঙ্গা-গড়ার ন্যায় নেতিবাচক কাজের পর ইতিবাচক কাজের অপরিহার্যতা সুস্পষ্ট। একদিকে ছাঁটাই-বাছাই ও বর্জন এবং অপরদিকে মনন, আহরণ ও গ্রহণ। বস্তুত এসব কাজের নির্ভুল, যৌক্তিক বিচক্ষণ সম্পাদনেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। তাই সংস্কৃতি অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক।[১]

সংস্কৃতির উদ্দেশ্যমূখীনতা অনুধাবনের জন্যে কৃষিকাজের কথাটা অধিকতর সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। জমিতে যেসব আবর্জনা, ঝাড়-জঙ্গল, ঘাসের শিকড় ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকে, চাষী সেগুলোকে লাঙ্গলের ফলার সাহায্যে উপড়ে ফেলে মাটির সাথে গুড়িয়ে মিশিয়ে দেয়। আর যেগুলো মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতে রাজী নয়, সেগুলোকে সে নিড়িয়ে আলাদা করে রাখে, যেন তা ফসলের চারা গজাতে ও তাতে ফসল ফলতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করতে না পারে।

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

এরপর শুরু হয় তার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। এপর্যায়ে মাটিকে অত্যন্ত নরম তুলতুলে করে তার ওপর বীজ বপন করা হয়, যেন মাটি সহজেই বীজকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে এবং তার শিকড় গজাতে ও অংকুর বের হতে কোন প্রকার অসুবিধা দেখা না দেয়, বরং একাজে মাটি পুরোমাত্রায় অনুকূল ও সহায়ক হয়।

এখানেই চাষীর কাজ শেষ হয়ে যায় না। জমিতে বপন করা বীজ যাতে করে পচে যেতে না পারে, উড়ো পাখী বা পোকা-মাকড় তা খেয়ে না ফেলে এবং নোনা পানি বা কচুরীপানা এসে গোটা ক্ষেতকে ধ্বংস করে না দেয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও তার জন্যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। চাষীর এ গোটা কর্মধারারই অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। সংস্কৃতির ব্যাপারটিও অনেকটা তাই।[১]

সংস্কৃতির ক্ষেত হল মানুষের মন-মগজ, রুচিবোধ, আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবন ও চরিত্র। এ সমগ্র ক্ষেত্রব্যাপী মানুষের একক ও সামষ্টিক প্রচেষ্টাই সংস্কৃতির সাধনা। চাষীর শ্রম-মেহনত, চেষ্টা-সাধনা ও সতর্কতা যেমন উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না, তেমনি সংস্কৃতির সাধনাও কোন পর্যায়েই উদ্দেশ্যবিহীন হওয়া কাম্য নয়। চাষীর লক্ষ্য যেমন ক্ষেত-ভরা সোনার ফসল ফলানো, তেমনি সংস্কৃতি-সাধনারও লক্ষ্য পরিচ্ছন্ন, সুস্থ মার্জিত, ভদ্র এবং আদর্শবান, রুচিশীল ও চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলা।

জমিতে কিছু একটা ফলাতে হলে চাষ করা অপরিহার্য। অবশ্য ফসলের তারতম্যের কারণে চাষের ধরন ও মাত্রায় পাথর্ক্য হওয়া স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে যে-ধরনের মানুষ সৃষ্টি লক্ষ্য হবে, সেই ধরনের সংস্কৃতি-চর্চা করা ছাড়া উপায় নেই। আর মানুষ সম্পর্কিত ধারণা বিভিন্ন হওয়ার কারণে সংস্কৃতির ধারণা, তার অনুশীলন ও অন্তর্নিহিত ভাবধারায়ও আকাশ-পাতালের মতো পার্থক্য হওয়া অবধারিত। চাষী যে ফসল ফলাতে ইচ্ছুক তাকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই জমিতে অনুরূপ চাষই দিতে হবে, তারই বীজ সংগ্রহ করে বপন করতে হবে এবং তার পক্ষে যা ক্ষতিকর তার প্রতিরোধও করতে হবে। অন্যথায় তার সব শ্রম-মেহনত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সংস্কৃতি মানুষ গড়ায় প্রধান হাতিয়ার। তাই যে ধরনের মানুষ সৃষ্টি লক্ষ্য হবে, তারই অনুরূপ ধারণা-বিশ্বাস, মূল্যমান, রুচিবোধ ও ভাবধারার বীজ মানুষের হৃদয়ে বপন করতে হবে; তার লালন, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আর তার পক্ষে ক্ষতিকর যেসব মূল্যবোধ ও আকীদা-বিশ্বাস, তাকে রোধ করার ও তার হামলা থেকে জন-সমাজকে রক্ষা করার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে চিন্তা-বিশ্বাস, শিক্ষা প্রচার এবং শাসন ও জন-জীবন গঠনের ক্ষেত্রে। এরূপ করা সম্ভব হলেই আশা করা যেতে পারে যে, বাঞ্ছিত মানুষ গড়ে ওঠবে।

এভাবে যেসব মানুষ গড়ে ওঠে কিংবা বলা যায়, যাদের জীবনে ও চরিত্রে এভাবে সংস্কৃতির রূপায়ন ঘটে–প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতির স্বচ্ছ ও পূর্ণ-পরিণত ভাবধারা, তারাই হল সংস্কৃতিবান মানুষ (Cultured man)।[২]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত সংস্কৃতির লক্ষ্য যেমন মানুষের অভ্যন্তরে বিশেষ গুণাবলী সৃষ্টি করা, তেমনি মানুষের বাহ্যিক জীবনকে তার আচার-আচরণকে একটি বিশেষ আদর্শে রূপায়িত করে তোলাও তার লক্ষ্যের মধ্যে শামিল। যেসব জ্ঞান, বিশ্বাস, রুচি ও ভাবধারা মানুষের মনোলোককে বিশেষ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণে আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে এবং যে সব বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান মানুষের অন্তরে সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করে, যেসব কর্মকান্ড দ্বারা মানুষের বাহ্যিক জীবনকে–ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনকে–বিশেষ আদর্শের ভিত্তিতে প্রোজ্জ্বল করা সম্ভব, তা-ই হল সংস্কৃতির বাহন।

প্রচলিত ধরনের শিক্ষা, জ্ঞানানুসন্ধান, শিক্ষণীয় বিষয়াদির অনুশীলন এবং বিশেষভাবে প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নির্মাণ, চিত্র-শিল্প, কাব্য-সাহিত্য চর্চা, নৃত্য-সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় এবং এ-পর্যায়ের অন্যান্য ললিতকলা হচ্ছে সংস্কৃতির বিশেষ উপাদান ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান। একটা নাচ-গানের অনুষ্ঠানকে যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলা হয়, তেমনি ডিবেট, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ফ্যাশান শো, সৌন্দর্য প্রতিযেগিতা, মীনা কার্টুন ইত্যাদি অনুষ্ঠানকেও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়। এসব বাহ্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্ত-বিনোদন, মনের তৃপ্তি-স্বস্তি এবং সুখ ও আনন্দ লাভই হচ্ছে এর মূলে নিহিত আসল লক্ষ্য। তাই বলা যায়, আধুনিক ধারণামতে সংস্কৃতির এই হল লক্ষ্য এবং কম-বেশি এক'টি জিনিসকেই সংস্কৃতির মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু আসল ব্যাপার হল, সংস্কৃতি কেবলমাত্র এক'টি অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, নয় কেবলমাত্র এক'টি তার নির্দিষ্ট মাধ্যম। বস্তুত সংস্কৃতির পরিধি অতীব ব্যাপক। তার মাধ্যম হল মানুষের সমগ্র জীবন, জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগ,সমস্ত কাজ, ব্যস্ততা, ও তৎপরতা। শুধুমাত্র চিত্তবিনোদন ও আনন্দ-সুখ লাভ করাকেই সংস্কৃতির লক্ষ্য মনে করা এবং কেবলমাত্র উপরোক্ত অনুষ্ঠান ক'টিকেই সংস্কৃতির মাধ্যম বলে ধরে নেয়া সংস্কৃতিরই অপমান।

ফিলিপ বাগবীর কথায় এরই পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেছেন:

'কালচার বলতে যেমন চিন্তা ও অনুভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি তা কর্মনীতি, কার্যপদ্ধতি এবং চরিত্রের সবগুলো দিককে পরিব্যাপ্ত করে।'[১]

বাগবীর এ উদ্ধৃতিতে সংস্কৃতির একটা ব্যাপক ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। আসলে সংস্কৃতির এ ব্যাপক সংজ্ঞাতেই তার তাৎপর্য নির্ভুলভাবে বিধৃত। ইসলামের সংস্কৃতি চেতনা তেমনি ব্যাপক ও সর্বাত্মক। তা বিশেষ কয়েকটি কিংবা নির্দিষ্ট কতকগুলো উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কয়েকটি বাহ্যিক অনুষ্ঠানই নয় তা একমাত্র অভিব্যক্তি।

কিন্তু সংস্কৃতির মৌল উদ্দেশ্য কি ? সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে যে মানুষ গড়তে হবে, সে মানুষ কেমন হবে–কি হবে তার নৈতিক মূল্যমান ? তার ভালো কি মন্দ কি–কি গ্রহণীয় এবং কি বর্জনীয় ? তার উচিত বা অনুচিত বোধের ভিত্তি কি হবে ? কোন জিনিস তার মনে আনন্দের সাঞ্চার হওয়া উচিত এবং কোনটায় দুঃখ ও ব্যথা ? এ সবের জবাব এক-একটা আদর্শের দিক দিয়ে এক এক রকম। এ বিষয়ে ইসলামী ধারণা ও আধুনিক চিন্তাধারায় মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা রাজপথ। যে কোন দিকে যেতে হলে ও পথ দিয়েই যেতে হবে সবাইকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যাওয়া হবে কোন দিকে কিভাবে এবং কেন ? এই কোন দিকে, কিভাবে এবং কেন'র প্রশ্ন নিয়েই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে আধুনিক চিন্তাধারার যত বিরোধ ও সংঘাত। এ কথাটি খুবই বিস্তারিতভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। সংস্কৃতিকে মনে করা যেতে পারে একটা প্রবাহমান নদী। নদীতে যেমন স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত হয়, তেমনি প্রবাহিত হয় কাদা পানি–ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি।

যে লোক এ নদী থেকে স্বচ্ছ পানি গ্রহণ করতে চায়, তাকে অন্ধের মত নদীর যে কোন স্থান থেকে পানি তুলে নিলে চলবে না। তাকে অবশ্যই তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে হবে, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন পানি কোনখানে প্রবাহিত হচ্ছে। মাঝ নদী কিংবা গভীর তলদেশ–যেখানেই তা পাওয়া যাবে, সেখান থেকেই তাকে পানি তুলে নিতে হবে। এ স্বচ্ছ পানি তুলে নেয়ার সময়ও লক্ষ্য রাখতে হবে, তার সাথে যেন কোন ময়লা, আবর্জনা কিংবা সাপ-বিচ্ছু চলে না আসে। তা না হলে শুধু কাদা পানি কিংবা ময়লা-আবর্জনাযুক্ত পানিই তাকে পান করতে হবে অথবা স্বচ্ছ পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গে সাপ-বিচ্ছুর দংশনে ও জর্জরিত হতে হবে।[১]

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সংস্কৃতির ব্যাপারে মূল লক্ষ্য ও দৃষ্টিকোণের গুরুত্ব সব চাইতে বেশী। আসলে এটাই হল খাঁটি স্বর্ণ ও কৃত্রিম স্বর্ণ যাচাইয়ের কষ্টিপাথর।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ ছাঁটাই-বাছাই এর প্রশ্নটির গুরুত্ব কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। কেননা সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষ সংস্কৃতি নামের প্রচলিত আবর্জনাকে গ্রহণ করতে কখনো রাজী হতে পারে না। সে তো যচাই-বাছাই করে এক ধরনের সংস্কৃতি বজর্ন করবে আর অপর এক ধরনের সংস্কৃতিকে মন-প্রাণ-হৃদয় ও জীবন দিয়ে গ্রহণ করবে। সত্যিকার সংস্কৃতিবান মানুষের এইতো পরিচয়। সংস্কৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বর্জন-গ্রহণের এ মানদন্ড হচ্ছে প্রত্যেকের জীবন দর্শন। যার জীবন দর্শন যেরূপ তার সংস্কৃতি তারই অনুরূপ–তার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কেননা জীবন-দর্শনের উৎস থেকেই সংস্কৃতি উৎসারিত।

দুনিয়ার প্রায় সব মানুষেরই একটা জীবন দর্শন রয়েছে। আর জীবন-দর্শনে যেহেতু পার্থক্য রয়েছে সেই কারণে সংস্কৃতি-বিষয়ক ধারণা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতেও মৌলিক পার্থক্য হওয়া অবধারিত। এখানে স্মর্তব্য যে, জীবন-দর্শন উদ্ভুত হয় জীবনাদর্শ থেকে। জীবনাদর্শ যা, জীবন-দর্শনও তাই। আর দুনিয়ার মানুষের জীবনাদর্শ যেহেতু বিভিন্ন, তাই জীবন-দর্শনেও বিভিন্নতা স্বাভাবিক। জীবন-দর্শনের এই বিভিন্নতার কারণে সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ ও পরস্পর বৈসাদৃশ্য একান্তই অনিবার্য।

তাই তো দেখতে পাই, জাতীয়তাবাদ যাদের জীবনাদর্শ, তাদের সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত; আন্তর্জাতিকতা সেখানে সযত্নে পরিত্যক্ত আবার জাতীয়তাবাদের ভিত্তিও বিভিন্ন রূপ। ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার সংস্কৃতিতে অন্য ভাষার প্রতি বিদ্বেষ তীব্রভবে বর্তমান; আঞ্চলিক জাতীয়তায় অপর অঞ্চলের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এক স্বাাভাবিক ব্যাপার। বর্ণভিত্তিক জাতীয়তার অবস্থাও অনুরূপ। সর্বোপরি জাতীয়তাবাদ

১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

একটা বস্তু-নির্ভর ব্যাপার বলে সেখানে বস্তুর প্রাধান্য সর্বত্র। নির্বস্তুক (Abstract) আদর্শমূলক সংস্কৃতির সেখানে কোন স্থান নেই।

কেবল জাতীয়তাবাদেই নয়, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রেও অনুরূপ অবস্থাই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী সংস্কৃতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না; বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্তমান। একটি অপরটির মূলোচ্ছেদে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

ইসলামী আদর্শবাদীদের নিকটও তাই সংস্কৃতির একটা ইসলামী ধারণা নির্মাণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে ছাঁটাই-বাছাই তথা বর্জন ও গ্রহণের নীতি অবলম্বন অতীব স্বাভাবিক। সংস্কৃতি নামে চলমান যে কোন জিনিসকেই ইসলামী জনতা সংস্কৃতি বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হতে পারে না।বস্তুত প্রতিটি জীবন-ব্যবস্থাই তার নিজস্ব মানে ব্যক্তি ও সমাজ গঠন করে। তাই যে ধরনের মানুষ ও সমাজ গঠন তার লক্ষ্য সেরূপ মানুষ ও সমাজ গড়ে ওঠতে পারে যে সংস্কৃতির সাহায্যে, তা-ই সে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করে তোলে পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগ করে এবং তার বিপরীত সংস্কৃতিকে প্রতিহত করে কার্যকর ব্যবস্থাপনার সাহায্যে।[১]

ইসলামও একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ–একটি পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। তাই তার ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের মান (Stndard) সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে এবং তার পরিকল্পিত মানুষ ও সমাজ গঠনের উপযোগী সংস্কৃতি তাকে অবশ্যই গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হবে। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে পশুর উত্তরাধিকারী এক বিশেষ জীবমাত্র মনে করে; তা বিশ্বলোককে মনে করে খোদাহীন, স্বয়ম্ভু। তাই এই দর্শনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌কে মেনে চলার এবং আল্লাহ্‌র দেয়া কোন বিধান তথা ধর্মমত মেনে নেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা মানুষের নেই। আর মানুষ নিতান্ত পশু বলে তার কোন মূল্যবোধ (Sence of Value) ও মূল্যমান থাকারও প্রয়োজন নেই।

এই মৌলিক কারণেই সংস্কৃতি নিছক চিত্ত-বিনোদনের উপায় ও মাধ্যম বলে পাশ্চাত্য সমাজে বিবেচিত এবং যে সব অনুষ্ঠানে এই চিত্ত-বিনোদন পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে তা অবশ্য গ্রহণীয়। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে চিত্তের দাবির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সেখানে তো প্রতি মূহূর্ত আরো চাই, আরো দাও, এ দাবিই উচ্চারিত হতে থাকে। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেখানে নিত্য-নতুন ধরনে ও অভিনব ভঙ্গিতে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে জনগনের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা নিবৃত করার চেষ্টা করা হয় অবিশ্রান্তভাবে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাথমিক উপকরণ হল গান-বাজনা ও নৃত্য। আসলে এগুলো প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও হিন্দু সমাজের ধর্মীয় পূজা-অর্চনার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বহুকাল থেকে চলে এসেছে। দেবতার সামনে সুন্দরী যুবতী রমণীর আরতি দান দেব-পূজারই এক বিশেষ অনুষ্ঠান। হাতে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে নৃত্যের তালে তালে মিষ্টি মধুর-কাণ্ঠে গান গেয়ে গেয়ে দেবতার পদতলে অর্ঘ্যের ডালি সঁপে দেয়া হিন্দু সমাজের এক বিশেষ ধরনের পূজা অনুষ্ঠান। উত্তরকালে সংস্কৃতি-পূজারীর এ পূজা অনুষ্ঠানকেই মন্দিরের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে বের করে এনে একে বিশাল হল ঘরের সুসজ্জিত ও সুউচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। যা ছিল দেবতার সম্মুখে নিজকে পূর্ণমাত্রায়

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

নিবেদিত করার একটা বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান, উন্মুক্ত মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে তাকেই বানানো হল চিত্তবিনোদন তথা রস-পিপাসু মানুষের সম্মুখে উপভোগ্য রূপে নিজেকে নিবেদন করার প্রধান মাধ্যম। অতঃপর নাচ-গান ও বাজনার এ অনুষ্ঠান মঞ্চের ওপর এসে ক্রমশ বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করতে করতে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। একক নৃত্য, যুগলনৃত্য, বল নাচ, ফ্লোর-নাচ ইত্যাদি নানা বৈচিত্রময় নাচ-গানের সঙ্গে এসে মিশেছে অভিনয় এবং তা অবশ্যই প্রেমাভিনয়। এ সব দ্বারা চিত্তবিনোদন হয় বলে এখন এটা পাশ্চাত্য ও বস্তুবাদী জীবন-দর্শনপ্রসূত সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত।

প্রথম দিকে ছিল একক গান, এখন তা যুগ্ম ও সমবেত। এর সাথে শুরু হল নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতীর সহ-অভিনয়–প্রেমাভিনয়, কিন্তু তাতেও চিত্তবিনোদনের কাজ সম্পূর্ণতা পেল না। ফলে শুরু হল অর্ধ নগ্ন ও প্রায়-উলঙ্গ নৃত্য-সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান। নারী-পুরুষের প্রকাশ্য চম্বুন, আলিঙ্গন ও যৌন মিলনের অনুষ্ঠানও মঞ্চের ওপরই দেখানো শুরু হল। শত-সহস্র নারী-পরুষ ও যুবক-যুবতীর বিস্ফোরিত ও বিস্মিত চোখের সামনে। কেননা এটা না দেখানো পর্যন্ত চিত্তবিনোদনের অন্তত ক্ষুধা, নিবৃত হতে পারে না–চরিতার্থ হতে পারে না। মনের অসীম-উদগ্র কামনা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আলোচ্য সংস্কৃতি দর্শনে মানুষ পশু শ্রেণীরই একটি জীবমাত্র এবং সে কারণেই তাদের নৈতিকতা ও চরিত্রের কোন প্রশ্ন ওঠতে পারে না বলে মানুষের লজ্জা ও শরমেরও কোন বলাই থাকার কথা নয়। তাই সংস্কৃতির-মঞ্চে বেশী বেশী নির্লজ্জতা ও নগ্নতা প্রদর্শন শিল্প-সৌকর্যেরই পরাকাষ্ঠা হয়ে দাঁড়াল। আর যে তা যত বেশী দেখাতে পারবে, সে সকলের নিকট বরিত হবে তত বেশী সার্থক শিল্পি রূপে। সংস্কৃতি জগতের সে হবে একজন বিরাট 'হীরো বা হীরোইন'।[১]

পশ্চিমা সমাজে যে যুবক-যুবতীরা যুগ্ম ও সমবেতভাবে প্রায়-নগ্ন কিংবা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে রৌদ্রকরোজ্জ্বল উম্মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্রস্নান এবং সমুদ্র-সৈকতে সমুদ্র-স্নানের উৎসব পালন করছে, তারা তো চিত্তবিনোদনেরই নানা অনুষ্ঠান উপভোগ করছে। এতে কোন লজ্জা নেই–নেই কারোর একবিন্দু আপত্তি; বরং সমগ্র শিক্ষা ও পরিবেশ থেকেই তা নিত্য বাহবা পাচ্ছে। কেননা এসব নিতান্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বৈ তো কিছু নয় !

এভাবে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শন–যার একটি শাখায় রয়েছে পুঁজিবাদ এবং অপর দিকে রয়েছে সমাজতন্ত্র–আর সেই সঙ্গে স্থানীয়ভাবে পাওয়া গেছে হাজার হাজার বছরের পৌত্তলিক সংস্কৃতি; এই সব মিলে আজকের মানুষকে ঠিক পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। কেননা এ দর্শন মানুষকে নিতান্ত পশু বা পশুর বংশধর ছাড়া কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সৃষ্টি মনে করে না। আর পশুকে অধিক পাশবিকতা শিক্ষা না দিলে তাকে যেমন সত্যিকার পশু বানানো যায় না, তেমনি পাশবিকতার কাজে অগ্রগতি ও উৎকর্ষ লাভ ও সম্ভবপর হয় না। তাই বর্তমান কালের সংস্কৃতিতে এ পর্যন্ত যতটা উৎকর্ষ লাভ করা গিয়েছে, তা সবই পাশবিকতারই উন্নতি সাধন করেছে। এ 'পশুকে' মনুষত্বে রূপান্তরিত করার কোন চিন্তাই এখানে করা হয়নি–মনুষ্যত্বের দিকে প্রত্যাবর্তনের কোন খেয়ালই জাগেনি এই পশুত্ববাদীদের সংস্কৃতি চর্চায়।[২]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা আগাগোড়াই তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আলাদা পথে অগ্রসরমান এক আদর্শ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ শুধু মাত্র একটি সৃষ্টিমাত্র নয় যেমন অন্যান্য হাজারো সৃষ্টি; বরং মানুষ হল আল্লাহ্‌র এক বিশেষ সৃষ্টি–বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক দায়িত্বশীল সৃষ্টি। মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোন্নত ও সর্বোত্তম প্রজাতি–আশরাফুল মখলুকাত। অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র এক বিশেষ দায়িত্ব পালন করাই মানুষের এ জীবনের একমাত্রা লক্ষ্য। সে লক্ষ্য এ দুনিয়ায়ই অর্জিত হতে হবে–সে দায়িত্ব পালন করতে হবে এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার মধ্যেই। কিন্তু তার সবটাই এখানে শেষ হবে না, তার পূর্ণ পরিণতি ও প্রতিফল ঘটবে এই জীবনের অবসান ঘটার পর অপর এক জগতে। সেজন্যে এই জগতের জীবনকে মানুষ পরকালীন জীবনে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে একান্তভাবে উৎসর্গ করে দেবে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনের মাধ্যমে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়ায় মানুষের বসতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের রচিত জীবন বিধান (ইসলাম) নাযিল করেছেন তাঁরই মনোনীত ব্যক্তিদের মারফতে।

ইসলামের লক্ষ্য হল মানুষকে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাহ রূপে গড়ে তোলা। আর আল্লাহ্‌র মনোপুত কাজের মাধ্যমে তাঁর সন্তোষ লাভের অধিকারী হওয়াই হল ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। তাই নিজেকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ্‌র উপযুক্ত বান্দাহ রূপে গড়ে তোলাই হল ইসলামের দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কুরআন মাজীদে এ কথাই বালা হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় :

قدافلح من تزكى-وذكراسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خيروابقى

"যে 'তায্‌কিয়া' লাভ করল এবং তার আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করল সেই সঙ্গে নামাযও পড়ল, সে-ই সত্যিকার কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করল। কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিচ্ছ, যদিও পরকালই হচ্ছে অধিক উত্তম এবং চিরস্থায়ী।"[১]

এ আয়াতে যে 'তাযকীয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার মানে হল পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধি লাভ–চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিচ্ছন্নতা, মন-মানস, আকীদা-বিশ্বাস দৃষ্টিকোণ ও মূল্যমান তথা মন ও দেহের পরিশুদ্ধতা আর ইসলামী সংস্কৃতিও এটাই।

অতএব যে সব কাজে সে পরিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়, তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি। যাতে তা হয় না, বরং যাতে মন-মানস তথা জীবন ও চরিত্র হয় কলুষিত তা ইসলামী সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এ আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাকে স্মরণ করা, তাকে কখনো কোন অবস্থায়ই ভুলে না যাওয়া, তাঁর বন্দেগীর প্রবল তাগিদে রীতিমত নামায পড়া–এগুলোই হল ইসলামী সংস্কৃতির বাছাই করা অনুষ্ঠান। এ সবের মাধ্যমে নর-নারীর আত্মা, মন-মানস ও জীবনের যে পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা বিধান হয় তা-ই হল ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য।

---

১. *আল কুর'আন*, ৮৭: ১৪-১৭

Dhaka University Institutional Repository

অতএব এ বৈষয়িক জীবনকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া, বস্তুসর্বস্ব আয়েশ-আরাম, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং পরকালীন জীবনের অনিবার্য সত্যকে বেমালুম ভুলে যাওয়া কিংবা তা উপেক্ষা করে চলা ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী ভাবধারা। পক্ষান্তরে পরকালকে সম্মুখে রেখে–পরকালের কল্যাণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে আদর্শবাদী জীবন যাপন করা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদনই হল ইসলামী সংস্কৃতির অনুকুল জীবনাচরণ। অন্যকথায়, আত্মার প্রকৃত কল্যাণ ও তৃপ্তির পরিবর্তে দেহের ক্ষণস্থায়ী আরাম ও তৃপ্তি লাভ ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য নয়। তা হল পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সংস্কৃতির লক্ষ্য। একে এক কথায় বলা যায় ভোগবাদী সংস্কৃতির লক্ষ্য।

তাই বলে ইসলামী সংস্কৃতিতে বৈষয়িক ও দৈহিক পরিতৃপ্তির কোন স্থান নেই, এটা মনে করাও ভুল। কেননা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী দুনিয়ার সর্ব প্রকারের করণীয় কাজ সুসম্পন্ন করা, আল্লাহ্‌র দেয়া যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ-ব্যবহার করা এবং তার শোকর আদায় করা ইসলামী সংস্কৃতিরই ঐকান্তিক দাবি। কিন্তু যে ধরনের দৈহিক ও বস্তুগত ভোগ-বিলাস ও আচার-আচরণে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘিত হয়–আল্লাহ্‌র অসন্তোষ উৎক্ষিপ্ত হয়, তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অন্যথায় বৈষয়িকতা-রূপ দানবের পদতলে দলিত-মথিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ইসলামী সংস্কৃতির সব সুকোমল কুসুম-কলি।

বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি কোন সংকীর্ণ জিনিস নয়–নয় কোন নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষের জীবন যত ব্যাপক ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রও ততই বিস্তীর্ণ। জীবনের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়েই প্রতি মুহূর্তে ইসলামী সংস্কৃতির ভাবধারা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে, মূর্ত হয়ে ওঠে প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে, ধ্বনি-মর্মরিত হয়ে ওঠে প্রতিটি পদক্ষেপে। বালবের (Bulb) স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়ে বিদুৎছটা যেমন করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে সব কিছু, সংস্কৃতির তেমনি প্রতিফলন ঘটে সমগ্র জীবনে। অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিও সে জীবন-দর্শনের অনুসারী লোকদের প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে থাকে। ফলে প্রতিটি মানুষের কথাবার্তা, কাজকর্ম, চলাফেরা, ওঠা-বসা এবং এই সবের ধরন, পদ্ধতি ও কর্মকৌশলের মাধ্যমেই জানতে পারা যায় সে কোন সংস্কৃতির ধারক।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খাবার খায় সবাই–মানুষ মাত্রই খাদ্য গ্রহণে বাধ্য। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির ধারক 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করবে, ডান হাত দিয়ে খাবে খাওয়ার সময় সে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করবে ও তাঁর শোকরের ভাবধারায় তার অন্তর ভরপুর হয়ে থাকবে। বাহ্যত সে হাতে ও মুখে খাবে; কিন্তু তার মন তাকে বলতে থাকবে, এ খাবার একান্তভাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই পাওয়া গেছে। তিনি না দিলে খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর হতো না। তাই সে খাবারের প্রতি কোন অবহেলা বা উপক্ষো প্রদর্শন করবে না, অহঙ্কারীর মত বসে খাবে না এবং খেয়ে মনে কোন অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা জাগতে দেবে না; বরং খাওয়া শেষ করে সে আন্তরিকভাবে বলবে :

الحمدلله الذي اطعمناوسقاناوجعلنا من المسلمين

Dhaka University Institutional Repository

"সমস্ত শোকর ও তারীফ-প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।"[১]

খাওয়া মানুষের জীবন ধারনের এক অপরিহার্য কাজ। না খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। মানুষকেও খেতে হয়–খেতে হয় জন্তু জানোয়ারকেও। কিন্তু মানুষের খাওয়া ও গরুর খাওয়া কি একই ধরনের, একই ভাবধারার ও অভিন্ন পরিণতির হবে ? তা হলে মানুষ ও পশুতে পার্থক্য থাকল কোথায় ? তাই মানুষের মতো খাওয়া এবং খেয়ে মানবোচিত পরিণতি লাভই হল খাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি। পক্ষান্তরে গরুর মতো জাবর কাটা এবং কোনরূপ আত্মিক সম্পর্কহীনভাবে খাদ্য গ্রহণ হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিশেষত্ব।

ইসলামী সংস্কৃতিবান ব্যক্তিও পথ চলে, যেমন চলে দুনিয়ার হাজারো মানুষ। কিন্তু তার পথ চলা নিরুদ্দেশ, দিশেহারা ও লক্ষ্যহীন নয়; পথ চলার সময় তার মনে জাগে না অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা ও অস্বাভাবিক ভাবধারা। পথ চলতে গিয়ে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাকে সে কখনো লংঘন করে না। প্রতিটি পদক্ষেপে পথি-পার্শ্বের দৃশ্য অবলোকনে, লক্ষ্য নির্ধারণে এবং সহযাত্রীদের সাথে আচার-আচরণে কোথাও সে মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে হারায় না। হারাম পথে তার পা বাড়ায় না, অন্যায় কাজে সে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয় না। পথ চলা কালে সে কোন মুহূর্তে ভুলে যায় না আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ :

ولاتمش فى الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا

"দুনিয়ায় অহঙ্কারী হয়ে পথ চলো না। কেননা যত অহঙ্কারই তুমি করো না কেন, না তুমি ভূপৃষ্ঠকে দীর্ণ ও চূর্ণ করতে পারবে, না পারবে পর্বতের ন্যায় উচ্চতায় পৌঁছতে।"[২]

এ কারণে ইসলামী সংস্কৃতির ধারক যখন পথে বের হয়, তখন তার দ্বারা কারোর কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। সে নিজেকে হাজারো মানুষের সমান কাতারে একাকার করে দেয়, নিজের বড়ত্ব দেখাবার মতো কোন কথাও সে বলে না–কোন কাজও করে না; তেমন কোন আচার-অনুষ্ঠানকেও সে হাসি মুখে বরণ করে নিতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-বিশ্বাসী লোকের আচার-আচরণ, কথা কাজ, ভাবধারা ও আনুষ্ঠানাদি হয় এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তার চলার ভঙ্গি দেখে সাধারণ মানুষের মনে ধারণা জাগে, কোন দৈত্য-মানব যেন ছুটেছে সব কিছু দলিত-মথিত করে–সকলের জীবনে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তার এ পথ চলায় সাধারণ মানুষের মনে জাগে ভীতি ও আতংক। আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনা ও ব্যক্তিগত বড়াইসূচক জয়ধ্বনি সে পায় প্রচুর; কিন্তু তাতে আন্তরিকতার খুশবু থাকে না একবিন্দুও।

ইসলামী সংস্কৃতির ধারকও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করবে,শিখবে ও চর্চা করবে। কিন্তু গর্দভের বোঝা বহনের মতো হবে না। তার মাধ্যমে বস্তুর পুতুলনাচে মুগ্ধ হয়ে পুতুল-পূজায় মেতে উঠবে না সে। বস্তুর বিশ্লেষণে ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদির সন্ধান পেয়ে সে বিস্মিত হবে

১. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৮৫০, খন্ড-০৫, পৃ. ২৬৫

২. *আল কুর'আন*, ১৭: ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

এবং আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের সামনে নিজেকে করে দেবে বিনয়াবনত। তার কণ্ঠে স্বতঃই উচ্চারিত হবে অল্লাহ্‌র প্রশংসা :

ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنك فقنا عذاب النار

"কত পবিত্র মহান তুমি হে খোদা কত সুন্দর উত্তম সৃষ্টিকর্তা তুমি! হে খোদা! তুমি কোন একটি বস্তুও অর্থহীন, তাৎপর্যহীন ও উদ্দেশ্যহীন করে সৃষ্টি করো নি"[১]

কিন্তু পাশ্চত্য সংস্কৃতি তথা পৌত্তলিক সংস্কৃতিতে এর বিপরীত ভাবধারার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। একটা গরুর চোখের পাতায়ও প্রতিফলিত হয় এ পৃথিবীর মনোরম দৃশ্যাবলী, একজন মানুষের চোখেও তাই। কিন্তু মানুষের চোখের প্রতিফলন ও গরুর চোখের প্রতিফলন কি কোন দিক দিয়েই এক হতে পারে ? এখানে যে পার্থক্য ধরা পড়ে বস্তু বিজ্ঞান বিশ্লেষণে, ঠিক সেই পার্থক্যই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য তথা পৌত্তলিক সংস্কৃতির মাঝে।

জীবিকা নির্বাহের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ও শ্রম-মেহনত সবাইকে করতে হয়। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির ধারক এ সব ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলে নিজের মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে–ঈমানের তাকীদে। এ সবের মাধ্যমে সে যা কিছু অর্জন করে, তাকে আল্লাহ্‌র দান মনে করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয়-মন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তা দিয়ে সে একদিকে যেমন নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণ করে, সেই সঙ্গে তাতে সমাজের অন্যান্য অভাবগ্রস্ত মানুষেরও প্রাপ্য রয়েছে বলে সে মনে করে। ফলে তার অর্থব্যয়ে এক অনুপম ভারসাম্য স্থাপিত হয়। সে না নিজেকে বঞ্চিত রাখে, না অন্যকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে; বরং সে নিজ থেকেই পৌঁছে দেয় যার হক তার কাছে।

সেজন্যে সে কারোর উপর না স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়া-দাক্ষিণ্যের বাহাদুরী দেখায়, না তার বিনিময়ে কাউকে নিজের গোলাম বানাতে চেষ্টা করে। তার মনোভাব হয় এই যে, তার একার শ্রম-শক্তিই তা অর্জন করেনি; বরং তাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহও শামিল রয়েছে। (এ শ্রম শক্তিও তো তার নিজস্ব কিছু নয়, তাও তো আল্লাহ্‌রই প্রদত্ত) তাহলে তার মাধ্যমে লব্ধ সম্পদ তার একার ভোগাধিকারেব বস্তু হবে কেন ? তাতে কেন স্বীকৃত হবে না আল্লাহ্‌র এমন সব বান্দাহদের অধিকার, যারা তার সমান কিংবা প্রয়োজন অনুরূপ উপার্জন করতে পারেনি ? তাই সে নিজের একারই ভোগ-বিলাস, আয়েশ-আরাম ও সুখ-সজ্জায় তার যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করে নিঃশেষ করে দিতে পারে না; বরং নিজের মধ্যম মানের প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা সে তুলে দেবে তারই সমাজের হাজারো বঞ্চিত মানুষের হাতে তাদের ন্যায্য অধিকার হিসেবে। মহান আল্লাহ্‌র ভাষায় :

وفى اموالهم حق للسائل والمحروم -

"(এরা বিশ্বাস করতো) তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[১]

---

১. *আল কুর'আন*, ০৩: ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ধারকদের মাঝে সৃষ্টি হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারা ও অবস্থা। সেখানে মানুষ অর্থোপার্জনেও ন্যায়-অন্যায় ও হক না হকের তারতম্য করে না, বাছ-বিচার করে না ব্যয় করার বেলায়ও । অর্জিত সম্পদ–পরিমাণ তার যা-ই হোকনা কেন–একান্তভাবে মালিকেরই ভোগ্য; তাতে স্বীকৃত হয় না অন্য কারোর একবিন্দু অধিকার। শোষণ বঞ্চনা ও ব্যয়-বাহুল্যই সে সংস্কৃতির অনিবার্য প্রতিফল। এর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় সমাজের সর্বদিকে। কিংবা ও বিদ্বেষের প্রচন্ড আগুন জ্বলে ওঠে বঞ্চিত লোকদের মন-মগজে। তখন তাদের বিরুদ্ধে ধূর্ত শোষকরা আর একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সর্বহারাদের রাজত্বের দোহাই দিয়ে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করা হয়, যেখানে এ বঞ্চিত ও সর্বহারাদের চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত, নির্যাতিত ও শোষিত হয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। তখন তারা না পারে তার বিরুদ্ধে টু শব্দ করতে, না পারে বিদ্রোহ করে সে সমাজ ব্যবস্থাকে খতম করতে। ফলে শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের অবসান ঘটে না, তার রূপটা বদলে যায় মাত্র। পরিবর্তিত অবস্থায় তার তীব্রতা হয় আরো নির্মম, আরো মারাত্মক এবং মনুষ্যত্বের পক্ষে চরম অবমাননাকর।[২]

যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে ইসলামী সংস্কৃতির ধারক বিবাহ সম্পর্ককে একমাত্র মাধ্যম বা উপায়রূপে গ্রহণ করে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ড এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। এর বাইরে কোথাও বিচরণকে সে সম্পূর্ণ হারাম ও পরিত্যজ্য মনে করে। তাই হাজারো সম্মুখবর্তী সুযোগ পেয়েও সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে–পবিত্র রাখে। কোনক্রমেই সে এ হারাম কাজে নিজেকে কলঙ্কিত ও পথভ্রষ্ট হতে দেয় না। তার মন তার বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা স্বামীতেই পরিতৃপ্ত। ভিন্ন মেয়ে বা পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকানোকেও সে ঘৃণা করে। সব মেয়ের ইজ্জত-আবরুই তার নিকট সম্মানার্হ ও সংরক্ষিতব্য। স্বামী ছাড়া সব পুরুষই তার নিকট হারাম ও পরিত্যজ্য।

কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারকদের নিকট বিবাহের বিশেষ কোন দাম, গুরুত্ব বা মর্যাদা নেই। যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নিজের স্ত্রী বা স্বামী কিংবা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হওয়ার কোন শর্ত নেই। পরস্ত্রী, পরপুরুষ, রক্ষিতা, বন্ধুর স্ত্রী, স্বামীর বন্ধু অথবা স্ত্রীর বান্ধবী ও পুরুষ বন্ধু এসবকে নিজ স্ত্রী বা স্বামীর মত বিবেচনা করতে কোন দ্বিধা বা লজ্জা-শরমের অবকাশ নেই।

এজন্যেই পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে অবিবাহিত যুবকদের মেয়ে-বন্ধু ও অবিবাহিতা মেয়েদের পুরুষ-বন্ধু একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা যেন ক্রমশ অংকের হিসাবকেও হার মানতে বাধ্য করেছে। এ সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের যৌন ক্ষুধা উন্মত্ততার সৃষ্টি করে এবং তা যে কোন স্থানে গিয়ে আঘাত হানার অধিকার রাখে; উভয় পক্ষের রাজী হওয়াটাই কেবল সেখানে একমাত্র শর্ত। এ ক্ষুধা এতো ব্যাপক ও প্রবল যে, সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থাই যেন তার নির্বাধ পরিতৃপ্তি লাভের আয়োজনে নিয়োজিত। তাই যুবক-যুবতী বা নারী-পুরুষের একক ও যুগল সংগীত-নৃত্য সে সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ।

ইসলামী সংস্কৃতি সার্বিকভাবে এক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ভাবধারার উদ্বোধক। কেননা পরিচ্ছন্ন ও চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলাই তার লক্ষ্য। তাই যেসব কাজ, অনুষ্ঠান ও ভাবধারা এরূপ মানুষ

---

১. *আল কুর'আন*, ৫১: ১৯

২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

Dhaka University Institutional Repository

গড়ার পথে বাঁধার সৃষ্টি করে তা ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। ইসলাম মানুষকে সংস্কৃতির প্রবাহমান নদী থেকে স্বচ্ছ পানি সন্ধান করে তুলে নিতে বলেছে, অন্ধের ন্যায় ময়লা, আবর্জনা ও কাদাযুক্ত বিষাক্ত পানি খেতে বলেনি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং সেজন্যে রীতিমত নামায পড়া, কেবল পরকালের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যের সব কাজ আঞ্জাম দেয়া এবং নিছক বৈষয়িক আনন্দ বা তৃপ্তি-সুখ লাভের জন্যে কোন কাজ না করাই হলো ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা। একারণে ইসলামী সমাজে মস্‌জিদ হল প্রধান সংস্কৃতি-কেন্দ্র–রঙ্গালয় বা নৈশ ক্লাব নয়। ইসলামী সংস্কৃতির ধারকরা দিন-রাত পাঁচবার এখানে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে দাঁড়ায়, কুর'আন পাঠ করে এবং রুকু ও সিজদায় সম্পূর্ণরূপে অবনমিত হয়ে ইসলামী সংস্কৃতিরই এক বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে। বছরের এক মাস কাল রোযা পালন ও দুটি ঈদের নামায ও উৎসব পালন মুসলিম সমাজের সর্বজনীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বস্তুত আল্লাহ্‌র সামনে সমষ্টিগতভাবে অবনমিত হওয়াই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির সামাজিক রূপ।

বিয়ে-শাদীর উৎসব, সন্তানের নামকরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন, খাদ্য-পানীয় বাছাই, পরীক্ষিত বন্ধু ও আত্মীয় গ্রহন, রুজি-রোজগারের জন্যে পেশা গ্রহণ, দিন-রাত্রির জীবন অতিবাহন–এ সব ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিফল ঘটা আবশ্যক; কেননা তার ব্যাপক প্রভাব থেকে এর একটিও মুক্ত থাকতে পারে না। এ সব ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব ভাস্বর হয়ে ওঠে। আর এ সব কিছুর মধ্য দিয়েই এ বিশাল মানব-সমুদ্রের মাঝে এক বিশিষ্ট মানব সমাজ গড়ে ওঠে। তাই ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সূর্যের মতই দেদীপ্যমান এবং তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে কি ইসলামী সংস্কৃতি কেবল নিরস ও শুষ্ক উপকরণ দিয়ে গড়া ? অথচ সংস্কৃতিতে রসের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। রসই যদি না থকল তা হলে আর সংস্কৃতি কি ? সংস্কৃতি হলেও তা দিয়ে আমাদের কি লাভ ?

সংস্কৃতি 'রস-ঘন' হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু রসের তো বিশেষ কোন রূপ নেই। রস আপেক্ষিক। এক ব্যক্তি সেখানে রসের সন্ধান পাবে, অন্যের কাছেও তা-ই যে রসের আকর হবে, এমন কথা জোর করে বলা যায় কি ? এক জনের কাছে যা রস, অন্যের নিকট তা বিরসও তো হতে পারে ? আসল জিনিস হল মনের তৃপ্তি। যেখানে যার তৃপ্তি, তা-ই তাকে অফুরন্ত রসের যোগান দেয়। এক ব্যক্তি যে সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তাতেই সে তৃপ্তি পায়, স্বাদ পায়–পায় আনন্দ ও অমৃত-রসের সন্ধান। ইসলামী সংস্কৃতিতে এ তৃপ্তি, এ স্বাদ, আনন্দ ও রস সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌র যিক্‌র। তাই কুর'আন আজীদ বলা হয়েছে :

الابذكر الله تطمئن القلوب

"জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র স্মরণই মানুষের মনকে পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তিময় করে তোলে।" [১]

মনের তৃপ্তিই যদি কাম্য হয়, লক্ষ্য হয় যদি চিত্তবিনোদন, তা হলে ইসলামী সংস্কৃতিতে রয়েছে তার অপূর্ব সমাবেশ। তাবে পার্থক্য হল এই যে, কেউ কাঁচা গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করে, কেউ

১. *আল কুর'আন*, ১৩: ২৮

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসে প্রচুর মসলা সহযোগে পরিপাটী রূপে রান্না করা গোশ্ত খেতে। আবার এমন খাদকেরও অভাব নেই এ দুনিয়ায়, যারা পচা-গলা পুঁতিগন্ধময় গোশ্তকেও পরম তৃপ্তিদায়ক ও রুচীকর খাদ্য বলে মনে করে এবং তা খাওয়ার সময় স্ফুর্তির ফোয়ারা ছোটাতেও লজ্জাবোধ করে না।[১]

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৫ম অধ্যায়

বিশ্বজনীন সংস্কৃতি

আধুনিক সভ্যতা এক বিশ্বজনীন সংস্কৃতিরই বিকশিত রূপ। তাতে বিভিন্ন সংস্কৃতির নির্যাস ও বাছাই-করা উপাদান নিঃশেষে লীন হয়ে রয়েছে। গ্রীক, রোমান, তুরান প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতির উত্তরাধিকার এতেই একীভূত। তার কারণসমূহ এই:

১.দূরত্বের ব্যবধান নিঃশেষ হওয়া
২.নিকটতর সম্পর্ক-সম্বন্ধ
৩.অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা
৪.রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিন্ন ধারণা
৫.অভিন্ন ও সদৃশ ভাষা ব্যবহার

যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তনশীলতা দেশ ও জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। পূর্বের যে দূরত্ব লোকদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিবন্ধক ছিল, এক্ষণে তা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা পরস্পরের ঘনিষ্ট ও নিবিড়তম সান্নিধ্যে আসতে সক্ষম হয়েছে। তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও যোগাযোগ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুলাংশে। তার ফলে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতি পারস্পরিক দেখাদেখি ও রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে খুবই স্বাভাবিকভাবে। সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির মধ্যে একারণেই টাগ-অব-ওয়ার চলছে। সম্পর্ক স্থাপনে ভাষার অভিন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার কথা বিশেষভবে উল্লেখ্য। কেননা দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে তুলনামূলকভাবে খুব বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে এ দুটি ভাষা। ফলে জাতি ও মিল্লাতসমূহ নিজেদের একক ও সামষ্টিক বিরোধ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও একটি বিরাট পরিবারে রূপ পরিগ্রহ করেছে। এক্ষেত্রে স্বার্থের অভিন্নতা এবং আবেগ অনুভূতিতে একই ভাবধারার প্রবাহ উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রেখেছে।[১]

বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে একটি পারিবারিক বা ঘরোয়া পরিবেষ্টনীর একান্ত প্রয়োজন। পরিবার পরিবেষ্টনী একটি সংক্ষিপ্ত একক (Unite) আইনগত ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও বংশানুক্রমিক মূল্যমানের (Values) ওপর এই পরিবার পরিবেষ্টনীর ভিত্তি সংস্থাপিত। পরিবার পরিবেষ্টনী একটা ক্ষুদ্রায়তন সংস্থা। প্রচার ও শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিক অব্যাহত রাখা এই পরিবার পরিবেষ্টনীর ওপরই নির্ভরশীল।[২]

বিভিন্ন ভঙ্গি, প্রয়োগ পদ্ধতি, ধরন-ধারণ দ্বীনী চিন্তা-চেতনা , নৈতিক মূল্যমান, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ উত্তরাধিকার নিয়মে এক বংশ থেকে আর এক বংশে উত্তরিত হয়। এর সংরক্ষণের জন্যে নিম্নোদ্ধৃত পদক্ষেপসমূহ জরুরী :

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

১. ব্যভিচার বা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধকরণ।
২. পারিবারিক দায়িত্বসমূহের মান-সম্ভ্রম রক্ষা ও সামাজিক কর্তব্য পালন।
৩. পারিবারিক আইন-বিধান ও নিয়ন্ত্রণ পূর্ণ মাত্রায় প্রতিপালন।

ব্যভিচার তথা অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে একদিকে বংশগত পবিত্রতা বিনষ্ট হয়, অপরদিকে গোটা সমাজ-পরিবেশ নোংরামী, পংকিলতা, নগ্নতা, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও পারস্পরিক হিংসা দ্বেষ, শত্রুতা, নরহত্যা ও রক্তপাত ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়। পারিবারিক ও বংশীয় একত্ব ও ঐতিহ্য চুর্ণ হয়ে বংশের ধারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। আত্মীয়তা এবং তার মান-সম্ভ্রম ক্ষুন্ন ও বিলীন হয়। যে সমাজে ব্যভিচার সমর্থন পায়, তা অনিবার্যভাবে উন্নত মানবীয় ও সাংস্কৃতিক মুল্যমান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় । সেখানে ব্যক্তিদের মধ্যে স্বার্থপরতা, হিংসা বিদ্বেষ ও আত্মকেন্দ্রিকতার পরিবেশ জেগে ওঠে; ফলে সামাজিক উন্নতি ও বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রেমাভিসার বা কোর্টশিপ (Court Ship) প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন, বর্তমান যুগে ও পরিস্থিতিতে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং এখন তা নিতান্তই কাম-লিপ্সা ও যৌন স্পৃহা চরিতার্থ করার একটা প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা ও সম্ভ্রম এবং মানসিক ধৈর্য ও শান্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ব্যভিচারের এই ব্যাপকতা দৈহিক রোগ-ব্যধির মারাত্মক প্রকোপ সৃষ্টি করেছে এবং আত্মিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিচারে চরম অধঃপতন ঘটিয়েছে।[১]

পারিবারিক পরিবেষ্টনীকে পবিত্র, সুশৃংখল ও নির্ঝঞ্ঝাট রাখার জন্যে স্বামী-স্ত্রীকে নিজেদের কর্তব্য পালনে পূর্ণমাত্রায় আন্তরিক ও সদাতৎপর হতে হবে। নর-নারীর দায়িত্বহীন সম্পর্ক সমাজে নানারূপ জটিল নৈতিক, মানবকি ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে দায়িত্বানুভূতি তিক্ত ও বিষাক্ত মুহুর্তগুলিতে উৎকট মানসিক অবস্থা বিদূরণে সফল সঞ্জীবনীর কাজ করে। এর অনুপস্থিতি জীবনকে একটা স্থায়ী অগ্নিকুন্ডে পরিণত করে দেয়।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য বা ভুল বোঝাবুঝি অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ, মনোমালিন্য ও ঝগড়া-ঝাটি নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। এরূপ অবস্থা দেখা দিলে তার প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানমূলক আইন-কানূন ও বিধি-বিধানের উপস্থিতি অপরিহার্য। তার সুষ্ঠু প্রয়োগে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ কার্যকরভাবে রোধ করা এবং পরিবারের লোকদের মধ্যে পূর্ণ মিলমিশ ও মতৈক্য অক্ষুন্ন রাখা ও কোনরূপ বিভেদ সৃষ্টি হতে না দেয়া সম্ভবপর । লোকদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও চেষ্টা প্রচেষ্টামূলক ভাবধারা জাগিয়ে রাখা একান্তই জরুরী। আর তা সম্ভবপর কেবল তখন, যখন ব্যক্তিগণ সামষ্টিক স্বার্থের তাগিদে ব্যক্তিগত স্বার্থ কুরবানী দিতে প্রস্তুত হবে, যখন সামাজিক নিয়মবিধির প্রতি সদাজাগ্রত থাকবে অবিচল সম্ভ্রমবোধ। মূল্যমানের (Values) যথার্থ প্রয়োগ একটি প্রাত্যহিক প্রয়োজন আর সম্মিলিত সামাজিক ব্যতিব্যস্ততা ও আমোদ-প্রমোদমূলক নিয়ম-শৃংখলা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক ।

---

১. পাশ্চাত্যের তথাকথিত উদার ও যৌন-শিথিল সমাজে ব্যাভিচার প্রাবল্য একদিকে পরিবার ব্যবস্থাকে প্রায় অকার্যকর করে দিয়েছে অপরদিকে এইডস্ (AIDS)-এর ন্যায় ভয়াবহ যৌন-ব্যাধি মানব জাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। এ কারণে সেখানকার চিন্তশীল ব্যক্তিরা এখন এইডস্ এর প্রতিরোধের জন্যে পরিবার ব্যবস্থার সুরক্ষা ও যৌন পবিত্রতা সংরক্ষণের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সাহায্যে লোকদের মধ্যে সভ্যতা-ভব্যতা, শালীনতা, সুষ্ঠুতা ও আদব-কায়দা সংরক্ষণ প্রবণতার সৃষ্টি করতে হবে। এমনিভাবেই ঐতিহ্যের সাহায্যের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকতে পারে আর এজন্যে অক্ষর বা বর্ণমালাই প্রথম অবলম্বন। ভাষা ধ্বনি ও ভঙ্গির ধারক। সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা সেখানে সুপ্রকট। প্রাচীন মানুষের মধ্যে মৌখিক বর্ণনা-ধারার সাধারণ প্রচলন ছিল। কিন্তু উন্নত সংস্কৃতিতে লেখন শিল্পকেও শামিল করা হয়েছ। এক কথায় সংস্কৃতির উজ্জীবনে অর্থনৈতিক সংগঠন সংস্থা, আইন-বিধান ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বরারই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।[১]

ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার জন্যে মানুষের মন-মানস তথা বুদ্ধি-বিবেক, চিন্তা-বিবেচনা ও গবেষণা শক্তি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে–লাভ করেছে সুদীর্ঘ ও সুব্যাপক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা । কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্মুখবর্তী অবস্থা, পরিস্থিতি ও নিত্য-সংঘটিত ঘটনাবলী মানুষকে বিব্রত, দিশেহারা ও কিংবর্তব্যবিমুঢ় করে দেয় । তখন সে হয়ে যায় অসহায় নিরুপায়। তার অনেক বিদ্যা-বুদ্ধি, চিন্তা-শক্তি ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে দিশা করতে পারে না, এখন তার কি করা উচিত !

মানুষ মহাসমুদ্রে চলাচল করার উদ্দেশ্যে বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করেছে। এই জাহাজ চালানোর জন্যে সে বাতাসের গতির ওপর নির্ভরশীল থাকেনি। সে আপন শক্তি বলেই সমুদ্রের বুকে যে দিকে ইচ্ছা জাহাজ চালিয়ে দিতে সক্ষম। জাহাজের গতি ও স্থিতি পূর্ণমাত্রায় তার নিয়ন্ত্রনাধীন।

কিন্তু হঠাৎ উত্থিত প্রচন্ড ঝড় ও উত্যুঙ্গ তরঙ্গমালার সম্মুখে সে নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়ে। সে সময় তার সব শক্তিমত্তা ও জ্ঞান-বুদ্ধির অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে সে মর্মে মর্মে অনুভব করে ও স্বীকার করে। যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি অত্যাধুনিক ও শত্রু হননকারী দুরপাল্লার শক্তিশালী অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়। তার নিজের বীরত্ব, সাহসিকতা ও যুদ্ধ-কৌশলের ওপর সে পুরাপুরি আস্থাবান। তার সৈন্যসংখ্যাও শত্রু পক্ষের আত্মরক্ষা কাঁপিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু এতৎসত্তেও যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তাকেই হতে হয় পরাজিত । কিন্তু এটা কেন ? এর নির্ভুল জবাব সে সন্ধান করেও জানতে পারে না। তার বিবেক-বুদ্ধি তাকে এ ব্যাপারে কোনই সান্ত্বনা দিতে সক্ষম নয়। কৃষক ক্ষেতে-খামারে সোনালী ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে প্রাণ-পণ চেষ্টা করে, নিঃশেষে শ্রম প্রয়োগ করে। হাল চালিয়ে, কোদাল মেরে মাটির বক্ষ সে বিদীর্ণ ও ওলট পালট করে দেয়। এজন্যে নিজের দেহের রক্ত পানি করে দিতে, মাথার ঘাম পায় ফেলতেও এতটুকু কুন্ঠিত হয় না। চেষ্টা ও শ্রমেও সে একবিন্দু ত্রুটি থাকতে দেয় না। ফলে সুন্দর শ্যামল ও সতেজ অংকুর ফুটে বের হয় গাঢ় সবুজে মাঠ একদিক থেকে অন্যদিকে ভরে যায়। সে মনোরম দৃশ্য দেখে কৃষকের চোখ জুড়িয়ে যায়, কলিজা শীতল হয়। কিন্তু সহসাই ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা এসে মাথা তুলে উঁচু হয়ে ওঠা ফসলের চারাগুলো জাপটে ধরে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সবগুলো খেয়ে ফেলে। মাঠের সবুজ-শ্যামল শোভা অন্তর্হিত হয়ে পান্ডুবর্ণ ধারণ করে, গাছগুলো নিঃশেষে মরে পঁচে যায়।

অনুরূপভাবে সহসা উদ্বেলিত হয়ে আসা বন্যা-প্লাবনে স্রোতে ক্ষেতের ফসল ভেসে যায়। বৃষ্টি কম বা বেশী হলেও এর পরিণতি অত্যন্ত খারাপ করে দেয়। এটা দেখে কৃষক নৈরাশ্য ও

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। এ সময় মনে দুঃখ দুশ্চিন্তার মেঘপুঞ্জ জমে ওঠে। তা দূর করার কি উপায় থাকতে পারে ? এ এমন দুঃখ যা মানব জীবনের তিক্ত বাস্তব ও তার আশাব্যঞ্জক প্লান-পোগ্রামের মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের ফলে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মৃত্যুর অবিচল মহাসত্য মানুষের সমস্ত রঙ্গীন স্বপ্ন, শক্তি ও পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। ঘটনাবলীর মৌল উপাদানসমূহের এই বিশ্লিষ্টতা এবং মৃত্যুর এই অমোঘ আক্রমন দেখে সে বিদ্রোহ করতে উদ্ধত হয়; এমনকি কখনো-সখনো হতাশায় তার আত্মহত্যা করার ইচ্ছা জাগে। এই সময় একটি বিশ্বাসই তাকে আশ্রয় ও সান্ত্বনা দেয়। তা হচ্ছে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস । এই বিশ্বাসই তার সম্মুখে জমাটবাঁধা পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা হয়ে পথ দেখায়–আশার প্রতীক হয়ে তাকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুত এই বিশ্বাসই মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল অবস্থায় সব রকমের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। তাই মানুষের জীবন-ধারাকে নৈতিক ও ধর্মীয় বিধি-বন্ধনের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা অপরিহার্য।

আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্য করে চলার মানসিক প্রস্তুতিই তার এই প্রয়োজন পূরণ করে–জীবনকে সুন্দর, সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল করে তোলে। এই বিশ্বাসই তার জীবনে এনে দেয় কাংক্ষিত গতিময়তা, অপরিসীম শক্তি-সাহস। এভাবেই সংস্কৃতিতে আল্লাহ্-বিশ্বাস, অন্যকথায় ধর্মবোধ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে বসেছে। কেননা যে জ্ঞান-বিদ্যা মানুষকে দূরদর্শীতা ও আলো দান করে, নিয়তির উপরিউক্ত জটিল আবর্তে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন এই বোধ ও বিশ্বাসই হয় তার একমাত্র অবলম্বন। তার কারণ হল, যে সব পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সম্বন্ধ সারা জীবন ধরে সুদৃঢ় হয়ে রয়েছে তা মানব মনে একটা আবেগ ও উচ্ছাসের সৃষ্টি করে আর এই আবেগ উচ্ছাসই তাকে এসব ব্যর্থতার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। মানুষের এ সব প্রয়োজনের দরুনই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের একটা উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব স্বীকৃত। ধর্মের ভিত্তিতে সংস্কৃতি যেমন পায় দৃঢ়তা ও পরিপক্কতা, তেমনি লাভ করে নতুন জীবন-প্রেরণা ও শক্তিমত্তা।

আত্মীয় স্বজনের প্রতি ভালবাসা বংশীয় আনুগত্যের প্রাণ-কেন্দ্র। স্থায়ী সহানুভূতি ও কল্যাণ-কামনামূলক আবেগ-উচ্ছাস, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বংশীয় সম্পর্ক-সম্বন্ধের ওপর সংস্কৃতি-প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপিত। এ সবের সমন্বয়ে সৃষ্টি রকমারি ব্যস্ততা ও উৎসব-অনুষ্ঠান চিত্তবিনোদনের উৎস। লোকদের স্নায়ুবিক শ্রান্তি বিদূরণের সুসংগঠিত পন্থা হচ্ছে প্রতিদিনকার খেলা-ধুলা ও শিল্প-কলা সংক্রান্ত নৈপুন্য ও দক্ষতা। এগুলো প্রাত্যহিক চিন্তা-ভাবনা ও ব্যতিব্যস্ততার ঝঞ্ঝাট থেকে মানুষকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের মনে এনে দেয় গভীর প্রশান্তি, স্থিতি ও চিরসতেজতা। শিশু তার কণ্ঠে ধ্বনি তুলে আপন পিতা-মাতা, আত্মীয় স্বজন ও বংশ-পরিবারের অন্যান্য লোকদের সাথে নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে। তার জীবনকে বিভিন্ন স্তরে তার খেলা-ধুলাও হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের। অন্য কথায়, তার খেলা-ধুলায় নিত্য পরিবর্তন সূচিত হয়ে থাকে। এই সময় কালেই শিশুর মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়, ধীরে ধীরে চরিত্রের সুস্পষ্ট বিশেষত্ব ও গুণাবলী ও প্রকাশ পেতে থাকে। অন্যদিকে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্কও গড়ে ওঠতে শুরু করে অনেকের সাথে। নিজেদের মধ্যে গোপন বন্ধুতা এবং বয়স্ক সহচরদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিশালতা লাভ করে। শিশুরা যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাদের মেজাজ- প্রকৃতি অনেকখানি বদলে যায়। তখন সামান্য বিষয়াদি নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়া হয়। অভিনয় ও নৃত্যের অনুশীলন কিংবা কোন শৈল্পিক দক্ষতাজনিত ব্যস্ততা,তা

Dhaka University Institutional Repository

সাজসজ্জামূলক অলংকরণ হোক কি চাকচিক্যপূর্ণ ছবিই হোক–তাতে একটা সৃজনশীল ও চিত্তবিনোদমূলক ভাবধারা নিহিত থাকে। এ ভবধারা স্বাভবতঃই পূর্ণতা ও ক্রমন্নোয়নের দাবি রাখে আর এ সবের মাধ্যমে সামাজিক ঘনিষ্ঠতা, পরিপক্কতা ও জাতীয় চরিত্র রূপ পরিগ্রহ করে।

সমগ্র সাংস্কৃতিক তৎপরতায় শিল্পসাধনা আন্তর্জাতিক ও আন্ত-বংশীয় মূল্যায়নে সর্বাগ্রগণ্য। গান-বাজনা এ সমস্ত শিল্প সাধনা একটা বিমূর্ত ও পরিচ্ছন্ন শিল্প রূপে গণ্য। তাতে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কলা-কৌশলগত ব্যাপারের বিশেষ কোন সংমিশ্রণ নেই। তাতে সুর ও তাল বা ধ্বনির উত্থান-পতনের দিকেই লক্ষ্য আরোপ করা হয়। নৃত্যে এই ভাবধারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময় ও হাত-পা সঞ্চালনের দ্বারাই প্রকাশ পায়।

অবয়ব ও মুখাকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সুসজ্জায়নে বিভিন্ন রং এর প্রয়োগ ও নানা রকমের নিপুন অংকন , পোশাক-পরিচ্ছদের নানা স্টাইল, দ্রব্যাদির নানা রং ও বর্ণময় ছবি, মিনা রচনা ও কারুকার্যখচিত আলপনা ইত্যাদির সমন্বয় ঘটে। ভাস্কর্য, কাঠের ওপর কারুকার্য সংক্রান্ত সমস্ত কাজে সৌন্দর্য ও রুচিশীলতাই প্রকট। কবিতা রচনা, কবিতা আবৃত্তি, ভাষার সচলতা ও নাটকীয় শৈল্পির অভিব্যক্তি উন্নতমানে সম্ভবত সমান ব্যাপকতা লাভ করেনি; কিন্তু তা সত্বেও সম্পূর্ণরূপে বিলীনও হয়ে যায়নি। এসব শিল্প-কুশলতার বহিঃপ্রকাশ ইন্দ্রিয়নিচয়কে প্রভাবিত করে। সৌন্দর্য বিষয়ক রুচিশীলতা এখান থেকেই পায় প্রাণ-স্পর্শ। নানা ধরনের সুগন্ধিময় ও সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য-পানীয়ও এ পর্যায়ে গণ্য।

একজন দক্ষ শিল্পী ও কারিগর যেসব জিনিস তৈরী করে, তাতে সমাজের লোকদের বিশেষ আর্কষণ থাকা স্বাভাবিক । একারণেই শিল্পীদের উচ্চ মান-মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। শিল্পীর নৈপুণ্যের দরুন এসব দ্রব্যে অর্থনৈতিক মূল্যমানও বৃদ্ধি পায়। সৌন্দর্য স্পৃহা ও রচিশীলতার চরিতার্থতা বিধানের দরুন সামাজিক সন্তোষ ও পৃষ্ঠপোষকতা অর্জিত হয় এবং ক্রমশ এসব দ্রব্য জনগণের সৌন্দর্যবোধ এবং অর্থনৈতিক ও প্রকৌশলী মানদন্ড প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। দুলর্ভ কারুকার্যখচিত শাল, কার্পেট, কম্বল, চাটাই ও পিতল নির্মিত তৈজসপত্র ও মিনা-করা-থালা-বাসনও এর মধ্যে শামিল।

অতি-প্রাকৃতিক (Super natural) সত্তায় মানুষের রয়েছে দৃঢ় প্রত্যায়। এ প্রত্যয় অতি সুপ্রাচীন। মূর্তি ছবি প্রতিমূর্তি (Statue), কারুকার্য, নকশা, সাধারণ অনুষ্ঠানাদি, মৃত্যু সম্পর্কিত কার্যাদি, কুরবানী বা বলিদান ইত্যাকার কাজগুলো তাকে এসব অতি-প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের নৈকট্য লাভে সাহায্য করে, তার হৃদয়াবেগকে উদ্বেলিত করে। মৃতের জন্য বিলাপ করা, গীত গাওয়া ও শোক-গাথা গাওয়ার ফলে লাশটি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে পরজগতে স্থানান্তরিত হয় বলে মনে করা হয়। প্রাচীন মিশরে মমির চতুঃপার্শে নানা রূপ আলপনা ও মাঙ্গল্য চিত্র অঙ্কন করা হতো। আর এভাবেই এক জগত থেকে অপর জগত পর্যন্তকার পথ অতিক্রম করা হতো। অন্যদিকে বড় বড় জন-সম্মেলনে নৃত্য ও সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের কাজ সম্পন্ন করানো হতো। এখনো খৃষ্টানদের গীর্জায় গীত গাওয়া হয়, হিন্দুদের পূজা-মন্দিরে দেবমূর্তির সম্মুখে আরতি করা হয়, শিখ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতেও অনুরূপ কাজই করা হয়। গান-বাজনা তাদের ধর্মানুষ্ঠান ও পূজা-পার্বন অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অংশরূপে গণ্য।

Dhaka University Institutional Repository

আর এসব শৈল্পিক দক্ষতাপূর্ণ অনুষ্ঠানে সংশিণ্টষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সমবতে হয়ে সমস্ত কাজ-কর্ম একত্রে সম্পন্ন করে।

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অপরিহার্য । শিল্প-কলা পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের আগ্রহ ও উৎসুক্যের সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে শিল্প-কলারই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। ফলে বৈজ্ঞানিক উপায় ও পদ্ধতির উৎকর্ষ লাভে পরোক্ষভাবে শিল্প-কলারও উৎকর্ষের একটা পথ তৈরী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে উপকথা ও গল্প-উপাখ্যান, শিল্প ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ আর এই সব সাংস্কৃতিক সুসংবদ্ধতা কোন বিশেষ জিনিস সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করার জন্যে বর্তমান থাকা জরুরী।

এক কথায় সংস্কৃতি একটি অত্যন্ত কল্যাময় সত্য ও বাস্তবতা। মানুষের প্রয়োজন পরিপুরণে তার প্রয়োগ অত্যন্ত ফসপ্রসু। সংস্কৃতি মানুষকে একটি আপেক্ষিক ও দৈহিক বিস্তৃতি ও বিশালতা দান করে। তার ফলে ব্যক্তিসত্তা লাভ করে সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষার অনুভূতি। পরন্তু ব্যক্তিত্বের সে বিস্তৃতিতে রয়েছে গতিময়তা। তা মানুষকে এমন অবস্থায় সাহায্যে করে যখন তার অন্তঃসারশুন্য ও রিক্ত দেহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

সংস্কৃতি মানুষের সামষ্টিক সৃষ্টি। তা ব্যক্তি মানুষের কর্মক্ষেত্র ও কর্মশক্তি ব্যাপকতর করে দেয়; চিন্তাশক্তিকে দেয় গাম্ভীর্য ও গভীরতা, দৃষ্টিকে করে সম্প্রসারিত। দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তুর মধ্যে তার উপস্থিতি কল্পনাতীত। কেননা এই সব কিছুর উৎস হচ্ছে ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সামষ্টিক রূপ এবং পারস্পরিক চিন্তা ও কর্মশক্তির সমন্বয়।

এ কারণে সংস্কৃতি ব্যক্তি সত্তাকে সুসংগঠিত রূপে ঢেলে গঠন করে এবং এসব জনগোষ্ঠীকে এক অন্তহীন ধারাবাহিক জীবন দান করে। মানুষের কার্যাবলী পারস্পরিক সামঞ্জস্য তার দৈহিক ও স্বভাবগত চরিত্রের কারণে ঘটে, মানুষ এ অর্থে কোন সামষ্টিক সত্তা নয়।

সংগঠন ও সামষ্টিক কর্মপদ্ধতি ঐতিহ্যের নিরবচিছন্নতা ও অক্ষুন্নতার ফসল। তা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। সংস্কৃতি মানুষের স্বভাবগত চরিত্রে বহুবিধ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। আর তা এভাবে মানুষের ওপর কেবল অনুগ্রহই বষর্ণ করে না, তার ওপর নানাবিধ দায়িত্বও আরোপ করে এবং বহু প্রকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা পরিহার করতে উদ্ধুদ্ধ করে। এর অনিবার্য পরিণতি সামষ্টিক কল্যাণ।

নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলা এবং আইন ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মানুষের কতর্ব্য। কর্তব্য পালন ও বলন-কথনকে একটা বিশেষ ছাচে ঢেলে গড়ে নিতে হয় তাকে। তাকে এমন সব কাজ নিস্পন্ন করতে হয়, যার কল্যাণ লাভ করে অন্যান্য বহু লোক। পক্ষান্তরে তার নিজের জরুরী কার্যাবলী সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে তাকে অনুগৃহীত হতে হয় অন্য লোকদের। সংক্ষেপে বলা যায়, মানুষের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দুরদর্শিতা এমন সব কামনা-বাসনার সৃষ্টি করে, যে সবের চরিতার্থতা ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, জ্ঞান-চর্চা পদ্ধতি এবং সাহিত্য ও শিল্পের উকর্ষ সাধন করে।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি মানব প্রকৃতির অন্তর্গত চাহিদার পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতারই ফসল। তা মানুষকে নিছক পশুর স্তর থেকে উন্নীত করে ভিন্নতর এক সত্তা দান করে। ফলে মানুষের নিতান্ত জৈবিক কামনা-বাসনা ও তার পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র ও পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। যন্ত্র নির্মাণকারী ও কর্মীসত্তা হিসেবে মানুষের প্রয়োজন বিপুল ও ব্যাপক। তার ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিক সুস্পষ্ট :

১. একজন ব্যক্তি (Individual) হিসেবে সে এমন সমাজের সদস্য, যার লোকেরা পরস্পর মিল-মিশ ও কথা-বার্তার সূত্রে পরস্পর সংযুক্ত–সম্পর্কশীল। এহেন এক সহযোগিতা-ভিত্তিক শ্রমজীবি এককের (Unite) সদস্য হিসেবে মানুষ ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের যিম্মাদার। অতীতের স্মৃতি তার মানসপটে চির-জাগ্রত । এ স্মৃতির সাথে রয়েছে তার মায়ার সম্পর্ক। কিন্তু তার সামনে রয়েছে অনাগত ভবিষ্যত। তারই ওপর নিবদ্ধ তার সমস্ত সত্তার লক্ষ্য-দৃষ্টি। এই ভবিষ্যতই হৃদয়-মনে আশা-আকাংক্ষার নির্মল আলো বিকীরণ করে। শ্রমবন্টন ও ভবিতব্যের সীমাহীন সম্ভাবনা এমন সব সুযোগ মানুষের সম্মুখে নিয়ে আসে, যার রূপ-সৌন্দর্য, চাকচিক্য ও সুর-ঝংকারে তার হৃদয় মন পরম উল্লাসে হয় চিরনৃত্যশীল।

২. ইসলামী সংস্কৃতির দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে মানবতার সম্মান। মানুষ মানুষ হিসেবেই সম্মানার্হ। মানবতার এই সম্মান নির্বিশেষ–পার্থক্যহীন। মানুষে মানুষে নেই কোনরূপ তারতম্য। উচ্চ-নীচ ও আশরাফ-আতরাফের বিভেদ মানবতার পক্ষে চরম অপমান স্বরূপ। সমাজের সব মানুষই সমান মর্যাদা ও অধিকার পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতেও কোনরূপ পার্থক্য ও বৈষম্য করা চলতে পারে না। ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ধনী, গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ পদাধিকারী ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী, গ্রামবাসী ও শহরবাসী, নারী আর পুরুষ–ইত্যাদির মধ্যে কোনই পার্থক্য বা বৈষম্য স্বীকৃতব্য নয়। ইসলামী সংস্কৃতি এ ধরনের কৃত্রিম ভেদ-বৈষম্যকে নিঃশেষ ও নির্মূল করে দিয়ে সব মানুষকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। বংশ বর্ণ, ভাষা, স্বদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, শাসন, সংস্থা প্রভৃতি দিক দিয়ে মানুষের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করা ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী। ইসলামী সংস্কৃতিতে সব মানুষের সম্মান, মর্যাদা অধিকার, ক্ষমতা সর্বতোভাবে সমান। এখানে পার্থক্য কেবলমাত্র একটি দিক দিয়েই করা হয়। তাহল মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনধারা। অন্য কথায় কুফর ও ইসলাম এবং ইসলামী সমাজে তাকওয়ার বিভিন্ন মানগত অবস্থা হচ্ছে পার্থক্যের মাপকাঠি। ইসলামী সংস্কৃতি উচ্চ-নীচের অন্য সব ব্যবধান নিশ্চিন্ন করে দিয়েছে। মানবতার ইতিহাসে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এ সাম্যের কোনই তুলনা নেই। সামাজিক ও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের ও সাম্য দুনিয়ার অপর কোন সংস্কৃতিই কায়েম করতে পারেনি।

৩. ইসলামী সংস্কৃতি এক সর্বজনীন সংস্কৃতি। তা বিশেষ কোন গোত্র বর্ণ, শ্রেণী, বংশ, কাল বা অঞ্চলের উত্তরাধিকার নয়। তার সীমা-পরিধি সমগ্র বিশ্বলোক এবং গোটা মানববংশে পরিব্যাপ্ত ও বিস্তীর্ণ। তাতে বিশেষ ভাষা বা বংশের দৃষ্টিতে কোন সংকীর্ণতার অবকাশ নেই। ইসলামী সংস্কৃতির এ হল তৃতীয় বৈশিষ্ট্য।

৪. আল্লাহ্‌র একত্ব ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর রিসালাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সংস্কৃতির অধিকারী–সে যে ভাষায়ই কথা বলুক, তার গায়ের বর্ণ যা-ই হোক, সে প্রাচ্য দেশীয় হোক, কি পাশ্চাত্য দেশীয়। তার আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রা ইসলামী ভাবধারায় পুরিপুষ্ট, ইসলামী রঙ্গে রঙ্গীন এটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলামী সংস্কৃতি ব্যাপক ও সর্বাত্মক ভূমিকার অধিকারী।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হল দ্বীন। রক্ত সম্পর্ক এর তুলনায় একেবারেই গৌণ। তাই এ দুটির কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রশ্ন উঠলে দ্বীনী সম্পর্কের দিকটিই প্রাধান্য পাওয়ার অধিকারী হবে। ইতিহাসে এ সংস্কৃতির প্রথম প্রকাশ ঘটেছে হিজরতের পরে নবী করীম (স.) রচিত সমাজ সংস্থায় বহিরাগত এবং স্থানীয় লোকদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব- সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। এ ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল রক্ত-সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়–ভাষার, বর্ণের বা স্বাদেশিকতার ভিত্তিতেও নয়; বরং তা গঠিত হয়েছিল একমাত্র দ্বীনের ভিত্তিতে। এরা সবাই ছিলেন একই দ্বীনে বিশ্বাসী, একই জীবনাদর্শের অনুসারী একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও একই লক্ষ্য পথের যাত্রী। হাবশার (আবিসিনিয়া) বেলাল, রোমের সুহাইব, পারস্যের সালমান, মক্কার আবু বকর, উমর (রা.) ও মদীনার আনসারগণ এ আদর্শভিত্তিক ও সংস্কৃতিবান সমাজে নিঃশেষে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। এভাবে একটি মানব সমাজে তার সাংগঠনিক পর্যায়ে একই সংস্কৃতির অনুসারী একটি মহান মিল্লাতে পরিণত হয়েছিল। এ মিল্লাতটি ছিল যেন একটি পূর্নাঙ্গ মানব-দেহ। এর যেকোন অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হলে পুর্ণ দেহটিই সে ব্যথায় জর্জরিত হয়ে উঠত। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতির এটাই হয়ে থাকে পরিণতি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

"পরস্পর বন্ধুত্ব, দয়া, একের প্রতি অপরের আকর্ষণ ও ঐক্যের ক্ষেত্রে মু'মিনের উদাহরণ হলো একটি শরীর। যখন শরীরের কোন একটি অংশ পীড়িত হয়ে পড়ে তখন শরীরের অবশিষ্ট অংশের ঘুম আসে না। অস্বস্তিবোধ হয় এবং জ্বর এসে যায়।"[১]

৬. ইসলামী সংস্কৃতির পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। সমাজে অকারণ রক্তপাত কিংবা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া এবং প্রতিবেশী জাতি বা রাজ্যের সাথে নিত্য সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী । যা কিছু ভালো–কল্যাণময়, তার সম্প্রসারণ এবং যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর, তার প্রতিরোধই হল এ সংস্কৃতির ধর্ম। অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠলে তাকে এড়িয়ে না যাওয়াও এর বৈশিষ্ট্য। বিশ্বশান্তি স্থাপনে ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা চিরকালই সুস্পষ্ট ও বিজয়দৃপ্ত। বিশ্ব সমাজকে যুদ্ধের দাবানল থেকে মুক্ত রাখতে হলে ইসলামী সংস্কৃতির ভাবধারাই হল একমাত্র উপায়।

৭. মানবতার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে হলে মানুষের পরস্পরিক ঐক্য অপরিহায। ঐক্য ছাড়া যেমন মানবতার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার ধারণা করা যায় না, তেমনি বিশ্বশান্তিরও বিঘ্নিত ও বিনষ্ট হওয়া অবধারিত। বিশ্ব-মানবের পরস্পরে পরিপূর্ণ ঐক্য সৃষ্টি করতে হলে চিন্তার ঐক্য বিধান সর্বপ্রথম কর্তব্য; তারপরই হল কর্মের ঐক্য ও সামঞ্জস্য। অন্যকথায়, মানব সমাজের সার্বিক ঐক্য তাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত মানুষের মনন- চিন্তা ও মানসিকতার ঐক্য ও সামঞ্জস্যই হচেছ বিশ্ব-মানবের কাংক্ষিত ঐক্যের একমাত্র উপায়।

৮. ইসলাম যে 'কালেমায়ে শাহাদাত' মানব-সাধারণের নিকট উপস্থাপন করেছে এবং তার যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করেছে, চিন্তায় ভারসাম্য রক্ষার জন্যে তা-ই হল প্রধান হাতিয়ার। এর সাহায্যে চিন্তা-বিশ্বাস ও মননশীলতায় যে ঐক্য দানা বেধে ওঠে, তা-ই বাস্তব

১. সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬৪০০, খন্ড- ০৮, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

কর্মে নিয়ে আসে ঐক্যের ধারবাহিকতা। বিরোধ ও বিভেদের সমস্ত প্রাচীর এর বন্যা-প্রবাহে চূর্ণবিচূর্ণ হতে বাধ্য। মানুষ এরই ভিত্তিতে সমান মর্যাদার অধিকারী হয়ে এক আল্লাহ্‌র বান্দাহ হয়ে ওঠতে পারে এবং মানব-সমাজের ওপর থেকে এক আল্লাহ্ ছাড়া অপর শক্তিগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে উৎখাত করে মানুষ সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। তাই তওহীদ হচ্ছে মানবতার মুক্তি সনদ। শির্‌ক হচ্ছে এর বিপরীত অশান্তি ও বিপর্যয়ের সর্বনাশা বীজ, তা মানুষকে নানাভাবে বিভক্ত করে। এসব থেকে মানুষ যখন মানসিক দিক দিয়ে পবিত্রতা লাভ করে, তখনই আসে মন ও মননশীলতার ঐক্য এবং তখন বাহ্যিক ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক ঐক্যের সৃষ্টি করা আর কঠিন হয়ে দাঁড়ায় না। তাই এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ইসলামে বিশেষ কর্মনীতি ও সুফলদায়ক কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন

কোন মুমূর্ষূ বা মৃত সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন কি সম্ভবপর ? এ একটা গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এবং সূধী সমাজে এ জিজ্ঞাসা নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রচন্ড আলোচনার ঝড় তোলা হয়। দুনিয়ায় এমন অনেক লোক আছেন যারা মনে করেন যে, একটি সংস্কৃতিকেও একজন ব্যক্তি-মানুষের জীবনের ন্যায় বিভিন্ন স্তর পার হয়ে অগ্রসর হতে হয়। প্রথমে তা থাকে শৈশাবস্থায়, তারপর যৌবনে পদার্পন করে এবং সব শেষে তা বলবান ও সতেজ হয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়-কালের মধ্যে সংস্কৃতি ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে এবং পরিপক্কতার পর্যায় অবধি পৌঁছে। তখন সম্মুখে আসে শিল্প ও অংকনের স্বর্ণযুগ। তারপর অতীন্দ্রিয় পদ্ধতিতে একটা পতনের যুগ সূচিত হয়ে যায়। শিল্পে অংকনে ও লেখনে প্রেরণার প্রবাহমান স্রোতধারা খুব দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে সাম্প্রতিক শুষ্কতার রূপ ধারণ করে। প্রতিটি জীবন্ত সংস্কৃতিই এর অপেক্ষা করে–এটাই হচ্ছে সমস্ত ঐতিহাসিক পতনের মর্মকথা ও মৌলতত্ত্ব। গুরুত্বহীন পরিবর্তন সহ ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, মিশরীয়, গ্রীক এবং আরবদের জীবন-ইতিহাস এমনিভাবে গড়ে ওঠেছে। ইতিহাসের পূর্ণতার মধ্যে এই দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় যে, বিপুল সময়ের বিস্মৃতির মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে সীমাহীন অভিন্ন মানবীয় সংস্কৃতির স্রোত-তরঙ্গ । সেই সবগুলোই নাটকীয়ভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল দীপ্তিমান পথে, বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়েছে, পুনরায় ধ্বংস হয়েছে এবং সময়ের উপরিতলে আর একবার একটা ঘুমন্ত ধ্বংস আত্মপ্রকাশ করেছে।[১]

এই তত্ত্বটির একটি যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ হিসেবে বলা যায়, সমস্ত মানবীয় সংস্কৃতির একটা সূচনা ছিল। তা পুরোপুরি বিকশিত হওয়ার পর সেগুলোর একটা অন্তহীন রাত্রির মৃত্যুগর্ভে বিলীন ও নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে। এক্ষণে সেগুলোর পুনরুজ্জীবনের কথাবার্তা একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির বাল্যকাল পুনরুজ্জীবনের মতই হাস্যকর ব্যাপার মনে হয়, যা কেবলমাত্র ধারণা বা কল্পনার জগতেই সম্ভব–কঠিন বাস্তবতায় তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু এই তত্ত্বটির গভীর ও সুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ একজন সাধারণ মানুষের নিকটও প্রকাশ করে দেবে যে, এসব তত্ত্বের প্রস্তাবকরা সংস্কৃতি বলতে মনে করেন শুধু ভালোর মানের বাহ্যিক প্রকাশ, যা একটা জনগোষ্ঠী বা একটা জাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারা তাদের লক্ষ্য আরোপ করেন, শুধু বাহ্যিক প্রকাশের ওপর। তারা একথা কখনই অনুধাবন করেন না যে, সংস্কৃতি মূলত একটা আভ্যন্তরীন তাগিদের বাহ্য প্রকাশ মাত্র, যা মানবীয় হৃৎপিন্ডে ধুক্ ধুক্ করতে থাকে অনির্বাণ দীপ-শিখার মত। রেডিও, টেলিভিশন ও উড়োজাহাজ প্রভৃতি বস্তু নিজস্বভাবে কোন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে না। এগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতির লক্ষণ মাত্র। এগুলো শুধু একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষ তার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা করছে। প্রকৃত পক্ষে বৈষয়িক জীবন সংস্কৃতি প্রকাশের সত্যিকার মাধ্যম নয়। মানুষের মনই হচ্ছে সমস্ত মানবীয় কর্মতৎপরতার আসল উৎসস্থল।

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতিরও উৎস ও লালন ভূমি হচ্ছে মন। কাজেই সংস্কৃতি বলতে মানুষের জীবনযাত্রার বিশেষ কোন ধরন বুঝায় না। আসলে তা হচ্ছে মনের একটা বিশেষ ধরনের আচরণভঙ্গি, চিন্তার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া, যা মানবীয় চরিত্রের একটা বিশেষ ধরন গড়ে তোলার জন্য চুড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহন করে। অন্যকথায় সংস্কৃতি হচ্ছে একটা জাতির বিশেষ ধরনের মানসিক গঠন–প্রকৃতি।

আমাদের বর্তমান নৃ-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক স্থলভাগীয় চিত্রের একটা জরিপ প্রমাণ করে যে, আধুনিক ইতিহাস প্রজাতিসমূহের মানবীয় সমাজ উৎপাদন করতে গিয়ে নিজেকে প্রায় বিশবার পুনরাবৃত্তি করেছে। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ তা থেকেই উৎসারিত। প্রাচীন রোমান, গ্রীক এবং আজকের পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সেই ঐতিহাসিক পটভূমিই বহন করে চলেছে। সময় ও স্থানের বিরাট আবর্তন সত্ত্বেও তারা সংস্কৃতির সেই একই পরিমন্ডলে অবস্থান করছে।

এমন কি বর্তমান সময়েও বিশ্বের বহু সংখ্যক জাতি–যদিও তারা জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জর্জরিত–মানবজীবনের মৌলিক সমস্যাবলীর ব্যাপারে পরস্পর একমত হবে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান বা জার্মানী সবাই ব্যক্তি মূলধন ও শ্রম, শিল্পপতি ও শ্রমিক, ব্যক্তি ও সমাজ প্রভৃতি সামষ্টিক মৌল সমস্যাবলীর সমাধান করতে চেষ্টা করছে এক বাস্তব ও অভিন্ন পদ্ধতিতে। এখানে তাদের পরস্পরের মধ্যে এই বিস্ময়-উদ্দীপক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় কেন ? এর প্রকৃত কারণটা খুঁজে বের করা খুব কঠিন নয়। সেটা এই যে, বস্তুবাদের একই প্রাণ-শক্তি কাজ করছে তাদের বিচিত্র ধরনের জীবনের বহু দিকের বুনট ও গড়নে। জীবনের হট্টগোল ও দৌড়ঝাঁপে যেভাবেই হোক তারা বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু হৃদয়াবেগ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব, তাৎক্ষনিক চাহিদার চাপ ও বলপ্রয়োগে স্বার্থ লাভের গোলমালে তারা তাদের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই হারিয়ে ফেলেনি। আর সেটা হচ্ছে বস্তুগত সুবিধা অর্জন। তারা নিজেদের জন্যে এমন একটা আদর্শ লাভ করার ইচ্ছা রাখে যা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কাঠামোর সর্বপ্রধান বিভাগগুলোতে–তাদের শিল্পে ও বিজ্ঞানে দর্শনে ও ধর্মে আইনে ও নৈতিকতায়, স্বভাবে ও আচরণে, পরিবার ও বিবাহে খাপ খাইয়ে চলবে। সংক্ষেপে এ এমন একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা পাশ্চাত্য সমাজ জীবন পদ্ধতিতে, চিন্তা ও চরিত্রে ধুক্ ধুক্ করে চলতে থাকবে।

একটা মহান সংস্কৃতি কোন অবসাদগ্রস্ত স্থানে নয়, বরং অসম সাংস্কৃতিক বাহ্য প্রকাশের জনারণ্যে ও পাশাপাশি এবং একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কহীনভাবে অবস্থান করতে পারে। তা একটা ঐক্য কিংবা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য উপস্থাপন করে যার বিভিন্ন অংশ সমর্থিত হয়েছে সেই একই ভিত্তিগত মৌলনীতি থেকে এবং সেই একই মৌলিক মুল্যমান গ্রন্থিবদ্ধ করেছে। এই মূল্যমান এর প্রধান মুখবন্ধ ও মানসিকতার কাজ করে। আমরা যদি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার উপরি-কাঠামোটি ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করি, তাহলে দেখতে পাব তা এমন একটা ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে যা পূর্ণমাত্রায় ও খাঁটিভাবে সংবেদজ অভিজ্ঞতালব্ধ বৈষয়িক ও এই পৃথিবীকেন্দ্রিক। তা এই নতুন মৌল মূল্যমানকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ এবং তার ভিত্তিতেই তা গড়ে ওঠেছে। সন্দেহ নেই, যুগে যুগে নতুন নতুন সভ্যতা এসেছে এবং বিস্মৃতির অতল-গহ্বরে তা বিলীন হয়ে গেছে; কিন্তু সংস্কৃতি সব সময়ই রক্ষা পেয়েছে ও ক্রমশ সাফল্য লাভ করেছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিজেকে বারবার পুনরুজ্জীবিত করে।

চীনের প্রাচীন সভ্যতা খৃষ্টপূর্ব সপ্ত শতকে যখন ভেঙ্গে পড়ল তখন তা প্রাচীন পৃথিবীর অন্য সীমান্তে অবস্থিত গ্রীক সভ্যতাকে তার উচ্চতর লক্ষ্যপানে ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হওয়া থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বিরত রাখতে পারল না। অনুরূপভাবে যখন গ্রীক-রোমান সভ্যতা শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গলে খৃষ্ট যুগের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর দীর্ঘকালীন যুদ্ধ ও শ্রেণী বিদ্রোহের রোগে, তাও এই প্রায় তিনশত বছর সময়ের মধ্যে দূরপ্রাচ্যে এক নতুন সভ্যতার জন্মলাভকে ঠেকাতে পারল না।[১] বস্তুত এভাবেই সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। কেননা কোন জনসমষ্টি কিংবা জাতি যখনই জীবনের কোন দৃষ্টিকোণ বা মূল্যমান গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে, তখন তার বাস্তবায়ন তার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব থাকে না; বরং তখন এই দৃষ্টিকোণ বা মূল্যমান তার সমস্ত কর্মতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত ও নতুন রঙ্গে রঙ্গীন করে তুলতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

কোন জনসমষ্টিই যদি একটা বিশেষ ধরন ও পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তবে তা-ই তাদের সংস্কৃতিকে রূপায়িত করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবশালী দৃষ্টিকোণ বা মূল্যামানের প্রতিষ্ঠা। তা-ই একটা বিশেষ ধরনের আকার-প্রকারে অভ্যস্ত কার্যকলাপের সৃষ্টি করে। সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতার পটভূমি আর সভ্যতা বলতে সাধারণত 'পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার মধ্যে সংস্কৃতির অভিব্যক্তি' বুঝায়। তাই সভ্যতায় সামান্য ব্যতিক্রম ঘটতে পারে সময়ের ও স্থানের পার্থক্যের কারণে; কিন্তু জীনব সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য হতে বাধ্য। সময়ের ভাগ্য পরিবর্তনের দরুন মানব-প্রকৃতি কখনই বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি। ইতিহাস তার অকাট্য সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছে। ক্ষমতা-লিপ্সা, জ্ঞান-অন্বেষা, নির্মাণ-প্রীতি, সঙ্গী-সাথীদের জন্য ত্যাগ স্বীকার–এই সবই প্রত্যক্ষভাবে মানবীয় তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আজকের দিনেও এই কথার সত্যতার কোনই সন্দেহ জাগেনি। এতো সেই প্রাচীনতম অতীতের কথা, যা আমাদের সম্মুখে এসেছে ভবিষ্যতের পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে। আমরা ভাবি, হয়ত নতুন কিছু জেগে ওঠেছে মানুষের করোটিতে, প্রাচীনের অস্তিত্বে এবং এই পুরাতন ও নতুনের পরস্পরের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই; কিন্তু এটা প্রকৃত সত্যের অপলাপ মাত্র। যুদ্ধ এবং শ্রেণী-বিভেদ আমাদের চিরসঙ্গী আদিকালের মানুষের জীবনে প্রথম যে সভ্যতা জেগে ওঠেছিল সেই সময় থেকেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন কালে গৃহযুদ্ধ ছিল একটা তুলানাহীন ঘটনা। আমরা দেখি অন্যান্য এমন সব ঐতিহাসিক ঘটনা, যা আমাদের সম্মুখে যথেষ্ট সাদৃশ্য তুলে ধরে। ঘটনাবলীর অসংখ্য শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে এতে ইতিহাস নিজেকে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছে।

মার্কিন ইতিহাসে গৃহযুদ্ধ যে সংকট সৃষ্টি করে তা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটায় জার্মান ইতিহাসের সমসাময়িক সংকট রূপে, যা উপস্থাপিত হয়েছে ১৮৬৪–৭১ সনের বিসমার্কের যুদ্ধরুপে। উভয় ঘটনায়ই একটা অপরিপক্ক রাজনৈতিক সংস্থা সবকিছু লন্ড-ভন্ড করে দেয়ার ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উভয় ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংস্থা ভেঙ্গে দেয়ার ও তার কার্যকর প্রতিষ্ঠা লাভের মধ্যে মূল সমস্যার সমাধানকারী ছিল এই যুদ্ধ। উভয় ঘটনায়ই কার্যকর সংস্থার পক্ষসমূহ নিজেরাই এবং দুটিতেই তাদের ইতিহাসের কোন একটি কারণে ছিল বিরুদ্ধ পক্ষের ওপর তাদের প্রকৌশলী ও শৈল্পিক ক্ষমতার প্রাধান্য। শেষ পর্যন্ত উভয় ক্ষেত্রেই স্ব স্ব সংস্থার বিজয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল একটা বিরাট শৈল্পিক সম্প্রসারণ দ্বারা যা, দুটিকেই–যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানীকে–গ্রেটবৃটেনে একটা ভয়াবহ শৈল্পিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বানিয়ে দিয়েছিল।

---

১. *A,Toyenbee. Civilization on Trial*. p.313; উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

Dhaka University Institutional Repository

আমরা ইতিহাসের আর একটি পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি ১৮৭০ সন নাগাদ শেষ-হওয়া সময় কালের মধ্যে। গ্রেটবৃটেনের শিল্প বিপ্লব সম্ভবত একটা বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, যাতে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তার প্রকৃত ও খুব-দ্রুত-সঙ্ঘটিত অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটেছিল। ঘটনাবশত তা আরো বহু সংখ্যক ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য দেশেও সঙ্ঘটিত হয়েছিল। উপরন্তু , শিল্পায়নের সাধারণ অর্থনৈতিক অবয়ব থেকে আমরা যদি আমাদের দৃষ্টি ফেডারেল ইউনিয়ন ধরনের রাজনৈতিক অবয়বের দিকে ফিরাই, তাহলে আমরা দেখব, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর ইতিহাস এই ক্ষেত্রে নিজেদের আর একবার পুনরাবৃত্তি করেছে তৃতীয় শতকের ইতিহাসে। এক্ষেত্রে গ্রেটবৃটেন নয়, কানাডা, তার সংযোগকারী প্রদেশগুলিসহ তাদের বর্তমান ফেডারেশনে প্রবেশ করেছে ১৮৬৭ সনে–১৮৬৫ সনে যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যের বাস্তব (De-facto) পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুই বছর পর এবং ১৮৭১ সনে দ্বিতীয় জার্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চার বছর পূর্বে।

বর্তমান পাশ্চাত্য জগতে বহু সংখ্যক যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠেছে। এগুলোর ও অন্যান্য দেশসমূহের শিল্পায়নে আমরা দেখতে পাই, ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে একই মানবীয় সাফল্যের বহুসংখ্যক সমসাময়িক দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে। বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সমসাময়িকতা অনুমানাতীত নয়। গ্রেট বৃটেনে শিল্প বাহ্যত একটা একক ঘটনা হিসেবেই সংঘটি হয়েছে, আমেরিকা ও জার্মানীতে তা সংঘটিত হওয়ার অন্তত দুই যুগ পূর্বে। এ ঘটনা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে,এটা মূলত একটা পুনরাবৃত্তিকারী বাহ্য প্রকাশ। অ-নিরাপদভাবে যুক্ত গৃহযুদ্ধ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র চার সাফল্যাংক ও সাত বছর এবং জরাজীর্ণ নেপোলিয়ণ-উত্তর জার্মান কনফেডারেশন অর্ধ শতাব্দীর জন্যে ১৮৬০-এর মারাত্মক ঘটনার পূর্বে প্রমান করে যে, ফেডারেল ইউনিয়টা মূলতই একটা পুনরাবৃত্তিকারী ধরন ছিল, যা পুনরায় ঘটল কেবল কানাডায়ই নয়, অষ্ট্রোলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলেও।[১] উচ্চস্তরের পরিবর্তন তার অভ্যন্তরভাগেও পরিবর্তন সাধনের তাৎপর্য বহন করবে, তা জরুরী নয়।

সভ্যতার যে কারাভাঁ অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর থেকে অগ্রসর হয়েছিল প্রাসাদোপম ঘরবাড়ি, গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ থেকে উড়োজাহাজে আরোহণ পর্যন্ত, প্রায় ন্যাংটা অবস্থা থেকে উন্নতমানের সুন্দরতম কাট-ছাঁটের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান পর্যন্ত, তা একটি মাত্র সত্যই প্রমাণ করে। আর সে সত্যটি হচ্ছে, তা অগ্রাযাত্রার মাধ্যমে শক্তি অনুসন্ধান ও পূনর্গঠনের প্রবল ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়েছে এবং মানুষের সেই প্রবল বাসনা ও সূদৃঢ় সংকল্প, যা মানবতাকে পরিচালিত করেছে এই সমগ্র যুগে–প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদনের বৈদ্যুতিক চাকচিক্যময় যুগ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও মানুষের প্রকৃতিতে এক বিন্দু পরিবর্তন আসেনি। যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবধারা প্রাগৈতিহাসিক গোত্রসমূহে অন্তর্গোত্রীয় সংঘর্ষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে, তা এখন বর্তমান কালের মানুষের মনে সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছে এবং সে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রাদি আবিষ্কার ও নির্মাণে দিনরাত ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে বিশ্ব-মানবতাকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে।

---

১. *Arnold Toyenbee, Civilization on Trial*. উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

সীজার যদিও নিহত হয়েছে অনেকদিন আগে; কিন্তু সীজারবাদ এখনো মানুষ শিকার করছে। ইতিহাসে আধুনিক প্রবণতাকে স্থুল দৃষ্টিতে যারাই লক্ষ্য করেছে তারাই স্বীকার করবে যে, আজকেও নিষ্পেষণ পদ্ধতি, বিদ্রোহ এবং ক্রমশ বিপুল সংখ্যক লোক দ্বারা সমাজের ভিতরে ও বাইরে বেশী বেশী রাজনৈতিক অধিকার লাভ করা মানুষের ইতিহাসে চলমান ঘটনা বিশেষ। এটাই সেই অভিন্ন মানসিকাতা যা আধুনিক মানুষের মধ্যে কাজ করছে। এখানে যদি কোন পার্থক্য থেকে থাকে, তবে তা শুধু গতিবেগ ও কাঠামোগত মাত্র; অন্য কোন দিক দিয়েই একবিন্দু পার্থক্যও লক্ষ্যভূত নয়।

প্রত্যেকটি সংস্কৃতির একটা নিজস্ব ভাবধারা রয়েছে যা স্বতঃই প্রকাশিত হয় সভ্যতার বিভিন্ন দিকে ও শাখা-প্রশাখায়। এই ভাবধারা দুর্বল হতে পারে; কিন্তু কখনই মরে যেতে পারে না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আত্মার মৃত্যুর পর অন্য দেহে তার চলে যাওয়া ও স্থান করে নেয়ার নিয়ম নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলছে। ফলকথা, সভ্যতা জন্ম নেয় এবং কিছু দিন পর বিলুপ্ত হয়ে যায়; কিন্তু সংস্কৃতির আত্মা অন্য কোন সভ্যতার দেহে স্থান গ্রহণ করে অতঃপর বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব চালাতে থাকে; তবু মরে যায় না কিংবা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় না।

আমরা সংস্কৃতির এই আবর্তনমূলক গতিশীলতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করব শিল্পকলা, নীতিদর্শন এবং আইন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে। শিল্পকলা সমাজের খুব বেশী সংবেদনশীল দর্পণ; সংস্কৃতি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজ ও সংস্কৃতি যা, তার শিল্পকলাও তা-ই হবে। এখানে আমরা শিল্পের একটা ধর্মীয় ও সংবেদনশীল ধরনের সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক প্রতিকৃতি তুলে ধরছি।

'আর্ট'কে দু'ভাগে ভাগ করা চলে। একটি হচ্ছে উত্তেজক আর্ট (Sensate Art) আর অপরটি স্বর্গীয় আর্ট (Divine Art)। এই পরিসরে ও এই নমুনার মধ্যে 'ডিভাইন আর্ট' স্বর্গীয় সংস্কৃতির এক বিরাট মুখবন্ধ গড়ে তোলে এবং উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করে যে, প্রকৃত ও বাস্তব মূল্যমান হচ্ছে একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা ও নিয়ন্তা আল্লাহ্ তা'আলা। এই মূল্যমান মানুষকে পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র খলীফা রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কাজেই তা স্বভাবতই মানুষের ভাল দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তা এমন একটা আর্ট যা ইচ্ছা করেই সব অশ্লীল, কুৎসিৎ ও নেতিবাচক জিনিস থেকেই চোখ বন্ধ করে রাখে ও সেসবকে উপেক্ষা করে চলে। কেননা উত্তেজক আর্ট শুধুমাত্র স্থুল চিন্তা-ভাবনার জন্যে দাঁড়ায়। তা মানুষের মধ্যে নীচ উপকরণ নিয়ে আলোচনা করে; সব নীচতাকে প্রকট করে তোলে। তার হিরো সাধারণত দেহপশারিণী, দুস্কৃতিকারী, ভন্ড এবং দুরাত্মা লোকেরা। ইন্দ্রিয় ভোগ-সম্ভোগের চেষ্টা করা, আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত রাখা, শ্রান্ত স্নায়ুমন্ডলিকে উত্তেজিত করা, স্থুল আনন্দ-স্ফূর্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশন এবং ইন্দ্রিয়জ আপ্যায়নই তার একমাত্র লক্ষ্য।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, Sensate Art বা উত্তেজক সংস্কৃতি যেখানেই গেছে, সৈসূর্য শিল্প তাকে অনুসরণ করেছে এবং যে সব জাতি জীবনের একটা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোন গড়ে তুলেছে, তাদের আর্টও সেই একই পথে অগ্রসর হয়েছে–উৎকর্ষ লাভ করেছে। কাজেই এই আর্ট সেই আগের কালের 'প্যানিওলিথিক' মানুষের শিল্পের চলমান রূপ বলা চলে। এরা বহু প্রাচীন গোত্রের মানুষ, ঠিক যেমন আফ্রিকার বুশম্যান। অনেক ভারতীয় ও সিথিয়ান গোত্র তাদের মতই লোক। তারা আসিরীয় সৌন্দর্য শিল্পকে পরিব্যাপ্ত করেছে–অন্তত ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ে এবং প্রাচীনযুগের শেষ দিকের অতি পুরানো মিশরীয়দের থেকে অনেক বেশী। মাঝমাঝি ধরনের

Dhaka University Institutional Repository

রাজত্ব ও নতুন সাম্রাজ্য–বিশেষ করে এদের শেষের দিকের Saite, Polemic ও রোমান যুগ যা Cheto Mycenacan-এর শেষ জানা যুগ এবং Gracco Raoman Culture-এর যুগকে নিশ্চিত রূপে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সমাজে যথেষ্ট প্রভাবশীল হয়ে রয়েছে বিগত পাঁচ শতাব্দীকাল ধরে। ডিভাইন আর্টকে Ideational Art বলা যায়, যা একটা বিশেষ কালে প্রভুত্ব করেছে Tacisi-China Art-এর ওপর তিব্বতের বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং অতি পুরাতন মিশরীয় ও গ্রীক শিল্পের ওপর, খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত । তা ছিল প্রাচীন মধ্যযুগীয় খৃষ্টান-পশ্চিম সংস্কৃতি এবং তা-ই অব্যাহত থাকে বহুদিন পর্যন্ত।

সে যা হোক, ললিতকলা বহু দিক দিয়েই বিভিন্ন, যেমন প্রাচীন ও সভ্য যুগের মানুষ। কিন্তু সে সবের আভ্যন্তরীন বা বাহ্যিক চরিত্রকে ঠিক একই রকমের দেখায় যখন তারা অভিন্ন ধরনে অবস্থান করে। এটা এই সত্যকে প্রমাণ করে যে, ললিতকলার ক্ষেত্রে এই আকৃতির বা ঐ আকৃতির প্রাধান্য শৈল্পিক যোগ্যতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ব্যাপার নয়; বরং তা হচ্ছে বিশেষ ধরনের দৃষ্টিকোণের ফল, যা পর্যায়ক্রমে লোকেরা বিভিন্ন সময়ে ধারণ করেছে।[১]

সত্য ও জ্ঞানের পদ্ধতিতেও ঠিক এই ব্যাপারই রয়েছে। Senate Truth এবং বাস্তবতার যে কোন পদ্ধতি বলতে বুঝায় সম্পূর্ণ বেপরোয়া আচরণ–যে কোন Super-Sensory Reality বা Value-এর অস্বীকৃতি। তাতে বোধশক্তি সম্বন্ধীয় সংস্কৃতি, আল্লাহ্‌র প্রকৃতি ও Super-Sensory Phenomena কুসংস্কার অথবা নিকৃষ্ট ধারণা অনুমান ও ধর্ম হিসেবে গণ্য। তা যদি শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়, তাহলে তা হবে নিছক বৈষয়িক উদ্দেশ্যে এবং তা যদি সহ্য করা হয়, তবে তা হবে ঠিক যেমন অনেক সখ বরদাশ্‌ত করা হয় ঠিক তেমনি। সত্যের এই ব্যবস্থা Sensory World অধ্যয়নের খুব জোরালোভাবে আনুকূল্য করে তার দৈহিক, রাসায়নিক ও জীব-বিজ্ঞানী সম্পদ ও সম্পর্কসহ। সমস্ত জ্ঞানগত উচ্চাভিলাষ কেন্দ্রীভুত হয় এই সব Sensory Phenomena-তে তাদের বস্তুগত ও দৃশ্যমান সম্পর্কতায় এবং প্রকৌশলী আবিষ্কার সেই লক্ষ্য আমাদের অনুভূতি সম্বন্ধীয় প্রয়োজন পূরণ করে। মূলত এর সবটাই বস্তুতান্ত্রিক এবং প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে তা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তার বস্তুগত দিকটির ওপর। শুদ্ধ কিংবা ভুল, ভাল কিংবা মন্দ নির্ধারণের মানদন্ড দাঁড়ায় SensoryUtility অথবা Sensory Pleasure.

সত্যের খোদায়ী ব্যবস্থা, অন্য কথায়, বিশ্বাস বা প্রত্যয় ইতিবাচক নৈতিক মূল্যমানসম্পন্ন। তা অহীর মাধ্যমে পাওয়া ও খোদায়ী প্রেরণার ওপর ভিত্তিশীল। তা যে নির্ভরযোগ্য ও নিরংকুশ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। নৈতিকতা বা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন। যুক্তিযুক্ততা নয়, তার একটা বিশেষ অর্থ আছে–আছে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। তা সময় ও অবস্থার শর্তাধীন নয়, বরং তা চিরন্তন অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত।

ইতিহাসের Objective অধ্যয়ন প্রকাশ করে দেবে সত্যের এ ব্যবস্থাসমূহের প্রতিটি বারংবার প্রচলিত ও পুনঃ প্রচলিত হয়েছে। The sensate truth of Creto Mycenacean সংস্কৃতি খৃষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতকের গ্রীস Ideational truth-কে পথ করে দিয়েছিল;

---

১. P.A.Sorkin, *The Crisis of our age*, উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

পরে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্তকার সময়ে তা Sensate truth দ্বারা উৎখাত হয়ে যায়। তারপর খৃষ্টীয় Ideatioanl truth বা Formation of ideas অনুসৃত হয়েছিল ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যকার সময়কালে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে Ideational truth-আর একবার প্রধান হয়ে ওঠে, যার স্থলাভিষিক্ত হয় তৃতীয় একটা ব্যবস্থা যা ষোল শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। অনুরূপভাবে Sensate truth-এর কথিত প্রগতিশীল সরল প্রবণতা ইতিহাসের গোটা অধ্যায় আঁকড়ে থাকা সত্ত্বেও একটা প্রভাবশালী ব্যবস্থা থেকে অপর ব্যবস্থা পর্যন্ত অব্যাহত দোলা দিতে দেখতে পাচ্ছি।[১]

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ঘূর্ণায়মান আন্দোলনসমূহ বিজ্ঞান,দর্শন ও ধর্ম ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণ উপস্থাপন করেছে এই সত্যের পক্ষে যে, পৃথিবীর সভ্যতায় বহুসংখ্যক পরিবর্তন সাধিত হওয়া এবং সভ্যতার উত্থান-পতন হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সভ্যতার আত্মা যে সংস্কৃতি, তা নিজেকে ইতিহাসে বহুবার পুনরাবৃত্ত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি সেই একই ধরনের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছে–সেই একই ধরনের সত্য ও একই ধরনের দর্শন ও ধর্ম সৃষ্টি করেছে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে। প্রাকৃতিক পরিমন্ডলের যে স্থানে সেই সভ্যতা জন্ম নিয়েছে সেখানে পরিবর্তনের কারণে হয়ত তাতে সামন্য পার্থক্য বা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে; কিন্তু সভ্যতার অন্তঃসলিলা স্রোতধারা এক ও অভিন্নই রয়ে গেছে। Sensory Civilisastion-এর আকৃতিতে Sensate Culture আত্মপ্রকাশ করেছে, তা পঞ্চম শতক হোক, বিংশ শতাব্দীর হোক অথবা আরব কিংবা ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকান শতাব্দী হোক।

বর্তমান সভ্যতার জাঁকালো অট্টালিকা দেখে কিছু লোক এ সিদ্ধান্ত নিয়ে অবাক হয়ে থাকে, যে মানবতা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যার ক্ষেত্রে অতীতে কখনই এ ধরনের লক্ষ্যযোগ্য অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো এই সরল দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, ভূপৃষ্ঠে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক উজ্জ্বলের চাইতেও অধিক উজ্জ্বল বহু সংখ্যক সভ্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সেগুলো বস্তুগত অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল বলে স্পষ্টত মনে হয়। সেগুলো তাদের পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছে তাদের হাস্য-মুখর প্রাচুর্যের পরিমন্ডলে।

এ সভ্যতা পূর্ণমাত্রার বস্তুবাদী ভিত্তির ওপর অবস্থিত এবং তার বাইরে থেকে প্রবিষ্ট হয়ে Sensual Pleasure-এর ভাবধারা দ্বারা একাধিকবার দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্ব করেছে। তার প্রধানতম নীতি সব সময়ই ছিল এই পৃথিবীকেন্দ্রিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সুবিধাবাদ। এই ধরনের একটি Sensoryসংস্কৃতির বুনানির মধ্যে মানব জীবন বহু সময়ই তার জীবন-নাট্যের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। ইতিহাসজ্ঞান যদ্দুর যায়, আমরা জানতে পারছি যে, প্রথমে যে জাতি এই সংস্কৃতির জন্য দাঁড়িয়েছিল তারা ছিল আরবের আদ জাতি। এই জাতির জীবন পদ্ধতি দেখলে স্পষ্টত মনে হয়, এ জাতি শুধুমাত্র বৈষয়িক ও বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থের দ্বারা চালিত হতো। তাদের প্রায় সমস্ত পুত্র কন্যার অন্তর স্বার্থ-প্রণোদিত হওয়ার দরুন স্বার্থের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত হয়েছিল। ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উত্তাপ ও উচ্ছাস তাদেরকে মৃগীরোগে আক্রান্ত করে দিয়েছিল। তারপর এই জাতির পতন ঘটে। তখন সামুদ নামের অপর এক জাতি

---

১. P.A, Sorkin, *The Crisis of our age*, উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

নতুন তেজবীর্য ও উদ্দীপনাসহ ভূ-পৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের মানসিকতার অবস্থা ছিল এই যে, তা কলংকিত করেছিল বস্তুবাদের কালো বর্ণকেও। "No stretch of imagination could her members ever think that there is a life beyond this life" ফলে এ জাতিরও কর্মতৎপতা প্রাথমিক ও মূলগতভাবে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের দিকেই নিয়োজিত হয়েছিল।

এ ক্ষেত্রে রোমানরা অবশ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছিল। জীবনের সংবেদন দর্শন, সংবেদজ নৈতিকতা, সংবেদজ রীতিনীতি তাদের জীবনে পুরোমাত্রায় চালু হয়েছিল। সে যুগের মোটামুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল বিলাসিতামূলক। তখন বিপুল জাতীয় সম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের করায়ত্ত হয়ে বিপুল সংখ্যক লোকের দারিদ্র্যের ওপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালানোর কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। সে পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন এবং অসাম্যকে লঘু করার যে কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে অমানুষিক নির্যাতন দ্বারা দমন করা হয়েছিল। সেখানে ধর্মীয় ও নৈতিক বিধানের প্রতিটি ধারাকে নির্যাতন দ্বারা দমন করা হয়েছিল। সেখানে ধর্মীয় ও নৈতিক বিধানের প্রতিটি ধারাকে লংঘন করা হয়েছিল। যেখানেই মানুষ সততা, দয়ার্দ্রতা, বদান্যতা, ও সহানুভূতির পথ অনুসরণের চেষ্টা করেছে, সেখানেই তারা ভোগ করেছে সীমাহীন নির্মমতা। নির্যাতকরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত বোধ করেছে, অহংকারের অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছে এবং তাদের নির্মমতার একটা অন্তহীন মিছিল চালিয়েছে। এভাবে কিছুকাল অতিবাহনের পর এই রকমের জাঁকালো অট্টালিকা তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছে। অতঃপর সেই একই ধ্বংসস্তুপের ওপর বর্তমান সভ্যতার কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করছি ক্ষমতার দাপট ও ধন-দৌলতের লোভ অভিন্নভাবে তান্ডব নৃত্যে মেতে উঠেছে।

"The average European-he may be democrat or a fascist, a capitalist or a bolshavik, a manual worker or an intellectual- knows only one postitve religion, and that is the worship of material progress."

সাধারণ ইউরোপবাসী হোক সে গণতন্ত্রবাদী অথবা উগ্রজাতীয়তাবাদী পুঁজিবাদী অথবা একজন বলশেভিক, একজন সাধারণ শ্রমিক অথবা একজন বুদ্ধিজীবি নির্দিষ্টরূপে একটি মাত্র ধর্মকেই তারা জানে তাহলে বস্তুবাদী উন্নয়ণের একাগ্র বন্দনা।

বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি হল এই বিশ্বাস যে, এই জীবনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং আকণ্ঠ ভোগ করা ভিন্ন জীবনের আর কোন লক্ষ্য নেই। এই জীবনকে যতদূর সম্ভব সহজতর করা কিংবা আধুনিক ভাবধারায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতাকে অনুসরণ করাই একমাত্র লক্ষ্য। এই ধর্মের মন্দির হচ্ছে বিরাট বিরাট ফ্যাক্টরী সিনেমা, থিয়েটার হল, রাসায়নিক পরীক্ষাগার, নৃত্য-গীত, পানি-বিদ্যুৎ প্রকল্প (hydro-electric works) আর তার ধর্মযাজক হচ্ছে ব্যাংক পরিচালক, প্রকৌশলী, ফিল্মস্টার, শিল্পপতি ও বনিক সম্প্রদায় ক্ষমতা ও সুখের সন্ধানে এই মহাযাত্রার অনিবার্য ফল হচ্ছে বিরুদ্ধবাদী জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা এবং স্বার্থের সংঘর্ষের স্থানে পরস্পর দ্বারা পরস্পরকে ধ্বংস করা আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন ধরনের মানুষ সৃষ্টি করা যাদের নৈতিকতা

Dhaka University Institutional Repository

কেবলমাত্র বৈষয়িক সুবিধা অর্জনের চেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে বস্তুগত সাফল্য যাদের সুউচ্চ মানদন্ড।[১]

এর ফল দাঁড়িয়েছে, দুঃখী মানুষকে মান-সম্মান ও অধিকার নিয়ে বাঁচার সুযোগ দানের পরিবর্তে তার দুঃখজনক অবস্থাকে আরো স্থায়িত্ব দান করেছে। মানবীয় জ্ঞানের প্রবৃদ্ধিলব্ধ বিজ্ঞান আধুনিক মানুষকে যে শক্তি যোগান দিয়েছে এবং তার বাড়াবাড়ির নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্রয় দান করেছে, তা গোটা সভ্যতার শিল্প-নৈপুণ্যকে বিপন্ন করে তুলেছে। জাতীয়তার ভাবধারা ব্যক্তিগণের ও জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সহযোগিতাবোধ জাগ্রত করছে না, বরং তা জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহমিকার সৃষ্টি করে, জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির চেতনা সৃষ্টি করছে এবং প্রতিটি জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধতায় প্রবলভাবে প্রলুব্ধ করছে। দুর্ভাগ্যবশত জাতীয়তাকে একটা অলংঘনীয় খোদায়ী বিধান হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছুকেই বরদাশ্‌ত করা হচ্ছে না। এই লোকদের নিকট তাদের অধিকার ও মর্যাদার অনুকূল যা, তা-ই সত্য এবং তার জন্য যা করা উচিত তা করাই তাদের নৈতিকতা বলে প্রতীত হয়েছে।

আামেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহজ উক্তি হচ্ছে :

"Innocent people and nations are being cruelly sacrificed to the greed for power and supremacy which is devoid of all sense of justice and human consideration"

ক্ষমতা ও প্রভূত্বের লালসার কাছে নিরপরাধ জনগোষ্ঠী ও জাতিসমূহকে নিষ্ঠুরভাবে বলি দেয়া হচ্ছে, যে ক্ষমতা ও প্রভূত্ব সব রকমের ন্যায়বিচার ও মানবীয় বিবেচনা বোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ইন্দ্রিয়-সুখ ও বৈষয়িক সুবিধা একাকীই আধুনিক মানুষের মনের ওপর একচ্ছত্র প্রভূত্ব স্থাপন করেছে আর তা লাভ করার জন্য সে কোন আইনের ধার ধারার প্রয়োজন মনে করে না। সত্যিকার অর্থে তার কোন বিচার নেই–নেই কোন নৈতিকতা।[২]

সংস্কৃতির এই ভাবধারাই বহুসংখ্যক সভ্যতায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদের মধ্যে একটা কাঠামোগত সাদৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। আদ, সামুদ, রোমান, গ্রীক এবং আজকের ইউরোপীয় ও আমেরিকার জাতিসমূহ সেই সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও তাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যায় না। এরা সকলের জীবনকে একই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে আর তা হচ্ছে বস্তুগত স্বার্থ ও সুবিধা।

এরপর আমি মানবজীবনের কতিপয় মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো এবং নিজেদের মতো দেখবো, এগুলো বার বার সম্মুখে কি করে উপস্থিত হল ? আর কি করে সেই ভাবধারা ও রীতিনীতি পরিগৃহীত হল বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা, যারা সবাই একই সংস্কৃতির উপস্থাপন করছিল ? দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটিই ধরা যাক এবং তার বৃত্তাকারে আবর্তনশীল গতিশীলতা লক্ষ্য করা যাক।

---

১. Mohammad Asad, *Islam at the cross road*, উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

২. মাওলাসা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, প্রাচীন সমাজ-স্তরে কোন সুসংঘঠিত রাজনৈতিক সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু তা একথা বুঝায় না যে, সেখানে আদপেই কোন কাঠামো ছিল না; সমাজে তখন শুধু গন্ডগোল উচ্ছৃংখলতাই বহাল ছিল। তখনকার সময়ে যে সমাজ ব্যবস্থা চলমান ছিল তা হয়তো খুব অপরিচ্ছন্ন ও অ-সংস্কৃত ছিল। কিন্তু একটা কিছু যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিরা তখন নিশ্চয়ই কোন সুনির্দিষ্ট নীতিতে নিজেদের জীবন পরিচালিত করতো, যা তখন চালু ছিল। এই ব্যবস্থাপনার এক এক ব্যক্তি বাধাবিমুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করেছে এবং সমাজের বুনট এতটা দুর্বল ছিল যে, এক ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির দুর্বার হয়ে দাঁড়াবার পথে কোন প্রতিকূলতা ছিল না। সমাজের ওপর এই এক ব্যক্তির প্রাধান্য বিস্তারের স্তর পরবর্তীকালে সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেখানে এক একটি লোক হীন-তোষামুদে দাস হয়ে পড়েছে এক একজন স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তার, সেখানে সে একাই গোটা রাষ্ট্রের ওপর নিরংকুশভাবে কর্তৃত্ব করেছে। ফলে প্রজাসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রাষ্ট্রের ইচ্ছা পূরণের অগ্নিকুন্ডে উৎসর্গীকৃত হতে লাগল। দিনগুলো এমনিভাবেই চলে যাচ্ছিল এবং অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিল যে, এই ধরনের সমস্যা অতীতে বোধ হয় আর কোন দিনই উদ্ভুত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন হবে না।

কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনাবলী সর্বাত্মকভাবে প্রমাণ করল ব্যাপারটি অন্যভাবে। এমনকি বর্তমান শতকেও আমরা ব্যক্তি-স্বার্থকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দেয়াল ঘড়ির পেন্ডুলামের মত এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দোদুল্যমান হতে দেখলাম। আধুনিক গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি হচ্ছে ব্যক্তি-স্বার্থের ওপর স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করা। জন স্টুয়ার্ট মিল স্বাধীনতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মন্তব্য করেছেন :

"In the conduct of human beings towards one another, It is necessary that general rules should for the most part be observed in order that people may know what they have to expect, but in each person's own concern his individul spontaneity entitled to free exercise, consideration to aid his judgement, exhortation to strengthen his will, may be offered to him, even abtruded on him by others, but he himself is the final judge, all errors which he is likely to commit against advice and warning are far outweighed by the evil of allowing others to constrain him to what they deem his good."

একে অপরের প্রতি মানুষের আচরণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ নিয়ম-বিধি মেনে চলা প্রয়োজন, যাতে তারা জানতে পারে যে, তাদের কি প্রত্যাশা করতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থে তার ব্যক্তিগত প্রবণতাকেই অবাধ চর্চার জন্যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে সহায়তা, তার ইচ্ছাকে সমর্থন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে। এমনকি অন্যের দ্বারাও এগুলো তার উপর চাপিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু সে নিজেই তার ব্যাপারে চূড়ান্ত বিচারক। অন্যের উপদেশ এবং সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তার দ্বারা যেসকল ত্রুটি হতে পারে তার চেয়েও অনেক বড় অপরাধ হবে যদি সে মঙ্গল বা কল্যাণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে অন্যের মতামতকে প্রশ্রয় দেয়।[১]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই সীমাহীন স্বাধীনতা ব্যক্তি কর্তৃক ভোগ করা অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি নিয়ে এলো। সে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতা পদদলিত করার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল। নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা বিধানের জন্যে গোটা দেশের উপায়-উপকরণ শোষণ করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা পেল। এ অবস্থায় রাষ্ট্র কার্যত ব্যক্তিগণের শৃংখল ছাড়া আর কিছুই থাকে না। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতার পর একটা বড় প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। খুব শীগগীরই এটা অনুভব করা গেল যে, Every man for himself and the devil take the hindmost.

এহেন সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি একটি পরিতৃপ্ত সমাজের জন্যে যথেষ্ট ভিত্তি জোগাড় করে দিতে পারে না; বরং তার বাস্তব প্রয়োগ সংঘটিত দারিদ্র রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের নীতি পর্যন্ত পরিচালিত করলো। শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক কার্য পদ্ধতিতেই নয়, মানব জীবনের সকল বিভাগেই তা সংঘটিত হল। ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজম গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত ও শাসন করেছে। এই দুটি ব্যবস্থার অধীণ সরকারের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা এসে গেল, যা মাত্র এক ব্যক্তির দ্বারা চালিত হয়েছে অথবা খুবই মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা। সাধরণ মানুষকে বুঝানো হল ঃ জাতীয় রাষ্ট্রকে শক্তিশালী সরকার গঠনে অক্লান্তভাবে অবশ্যই কাজ করতে হবে। বিশেষ করে, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংখ্যাগুরুর চাপ বা নিয়ন্ত্রণ নীতির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকবে । সেখানে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না; কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত নিছক একটা সংস্থা–যা প্রাচীন অর্থে Council নামে অভিহিত–তার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কাউন্সিলর হবার অধিকার স্বীকৃত বটে; কিন্তু সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এক ব্যক্তির দ্বারা। হিটলার যা-ই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার কাউন্সিল তাকেই ঠিক মনে করে নিয়েছে–তাদের নিকট তা-ই চিরকাল 'সত্য' হয়ে থাকবে।

তাৎকালীন জার্মান স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী Herr Frick একদা ঘোষণা করলেন :
"To serve Hiteler is to serve Germany, to serve Germany is to serve God."

হিটলারের সেবা করা মানে জার্মানীর সেবা করা, জার্মানীর সেবা করা মানে ইশ্বরের সেবা করা।[১]

কমিউনিষ্ট সমাজ জনগণের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে আরও এক কদম অগ্রসর হয়ে গেল এবং তার সবটাই টোটালিটারীয়ান বা সর্বগ্রাসী। এখানে ব্যক্তিরা প্রধানত রাষ্ট্রের জন্য বাঁচে। তার প্রধানকে যে নামেই ডাকা হোক, তার ক্ষমতা কোন ডিক্টেটরের চাইতে একবিন্দু কম নয়। তার কল্পনা-শক্তি যদ্দূর যায়, তদ্দূরই সে একটা নিয়ন্ত্রণ চাপানোর দাবি করে এবং সেই কল্পনা-শক্তি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলে।

নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌন সম্পর্কের একটা দৃষ্টান্ত আমার বক্তব্যের অনেকখানি ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হবে। মানব ইতিহাসের সেই আদিম স্তরে এই সম্পর্ক মোটামুটি পশুদের মতোই অনিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি যৌন কামনা চরিতার্থকরণে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো বিপরীতা লিঙ্গের ব্যক্তির কাছ থেকে। সময়ের অগ্রগতিতে এক সময় পরিবার-প্রথা স্থাপিত হয়।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

সেই সাথে বিবাহ প্রথাটাও উন্নতি লাভ করতে থাকে। এটা চলমান স্বাধীনতার ওপর সংযম ও নিয়ন্ত্রণ আরোপে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিবার ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে; কিন্তু উত্তরকালে তা একটা গুরুত্বর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং তা প্লেটোর ন্যায় একজন উচ্চমানের দার্শনিকের হাতে। তিনি প্রস্তাব করলেন :

"All healthy men and women should at one time be brougth together at a certain place and be allowed to indulge in sexual intercourse"

সকল স্বাস্থ্যবান পুরুষ এবং নারীকে এক সময়ে একত্রে একটি নির্দিষ্ট যায়গায় আনা হোক এবং ব্যবস্থা করা হোক যৌন সঙ্গমে তাদের স্বাধীন ইচ্ছা চরিতার্থ করার।[১]

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এভাবেই বাচ্চারা নির্দিষ্টভাবে একজন পুরুষ ও একজন নারীর স্নেহ-বাৎসল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে তাদের নির্বিশেষ ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। খুব বেশী দিন যেতে না যেতেই এই Absurdity-র আত্মহত্যামূলক পরিণতি জনগণের নিকট প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তখন তারা বিবাহ ও পরিবার প্রতিষ্ঠানটিকে সুদৃঢ় করার জন্য চেষ্টা শুরু করে দেয়।

এই দিক দিয়ে বিগত তিনটি শতাব্দীকাল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। বলা হয়েছে :

"In the first decade of Bolshevist administration there was a understanding that sexual intercourse was a personal matter, taking by mutual consent between men and women of the same or different races, colour or religion, for which no religion or other ceremony was required whilst even official registraiton of the Union was entirely optional (Where Sprenglarism Fails)"

বলশেভিক শাসনের প্রথম দশকে এই মর্মে একটা ধারণা ছিল যে যৌন সঙ্গম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। যা একই অথবা বিভিন্ন গোত্রের, ধর্ম ও বর্ণে নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে ঘটে থাকে, যার জন্য কোন ধর্মীয় অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, যখন এমন কি রাষ্ট্রীয়ভাবে নিবন্ধন করাটাও নিতান্ত ঐচ্ছিক।[২]

দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে আমরা একটা ক্রমিক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। কামুকদের প্রতি লেনিনের কোন সহানুভূতি ছিল না। রুশ বিপ্লবের পর প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, যৌন মিলন প্রাকৃতিক ব্যাপার, যেমন প্রাকৃতিক ব্যাপার ক্ষুধার পর খাদ্য গ্রহণ। তা পিপাসার দরুন একগ্লাস পানি পান করার কাজটির অধিক কিছু নয়। সামাজিক দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে তাঁর অভিমত যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্তত কমিউনিষ্ট পার্টির জন্যে প্রামাণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেছিলন :

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

"Is marriage a private relation between two legged animals that interest only themselves and in which society has no right to meddle".

বিবাহ একটি নিজস্ব সম্পর্ক দুটি দু'পেয়ে জন্তুর মধ্যে, যা শুধুমাত্র তাদেরই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, এর মধ্যে সমাজের কোন অধিকার নেই হস্তক্ষেপ করার।[১]

Ryazonov লিখেছেন :

"We should teach young communists that marriage is not a personal act, but an act of deep social singificance. Marriage has two sides, the intimate side and social".

তরুন কমিউনিষ্টদেরকে আমাদের এই শিক্ষা দেয়া উচিত যে, বিবাহ নিতান্তই কোন ব্যক্তিগত কর্ম নয় বরং কাজটি গভীরভাবে সামাজিক গুরুত্ব বহনকারী। বিবাহের দু'টি দিক রয়েছে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক।[২]

আর Soltz বলেছেন : "and we must never foreget the soical side. We are against a profligate or disorderly life. Because it affects the children".

এবং অবশ্যই আমরা কখনও সমাজিক দিকটা ভুলে যাবনা। আমরা অগোছালো জীবনের বিরোধী; কেননা তা শিশুদের ক্ষতি করে।[৩] এরপর পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থা আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ইতিহাস আমাদের বলছে : এমনকি যে গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী সিষ্টেমের গভর্ণমেন্ট এ যুগের অবদান হিসেবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে তা-ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডিমের গভীরতম পর্যায়ে প্রচ্ছন্ন নিউক্লিয়াস হিসেবে বিদ্যমান। অনুরূপভাবে একটি সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি এবং তার সমগোত্রীয় সমস্যাবলী সিদ্ধান্তমূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, সভ্যতা যদিও জন্মে ও মরে যায়, কিন্তু সংস্কৃতিতে মৌলিকভাবে কোন পরিবর্তন ঘটে না। তার আন্দোলিত হওয়ার ক্ষেত্র বদলে যেতে পারে বটে; কিন্তু তার মৌল ভাবধারা সর্বত্র নিজেকে প্রকাশ করে। এখানে আত্মার স্থানান্তর আছে, যা সংস্কৃতির ব্যাপারে কাজ করে। মানবীয় যে কোন গোষ্ঠীবদ্ধতায়–যে কোন স্তরে–মনের কোণে একটা নির্দিষ্ট আচরণ অবলম্বিত হতে পারে–তা সুবিধাবাদী হোক কিংবা অন্য কিছু।

তদনুযায়ী সে তার জীবনকে পুনর্গঠিতও করতে পারে–যেমন প্রকৃতি এখন অপরিবর্তিত রয়ে গেছে সময়ের, অবস্থার ও ভাগ্যের শত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও। তাই তার সমস্যাবলীও ঠিক সেই পুরাতনই রয়ে গেছে। পরিবর্তন যা কিছু হয়েছে তা শুধু বস্তুজগতে। দিনের পর রাত্রির অভিন্ন বাহ্য প্রকাশ এবং রাত্রির পর দিনের পুনরাগমন শুধু ঘটছেই না, সেই অপরিবর্তিত বাহ্য

---

১. প্রাগুক্ত

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

৩. Sidney and Biatrice Webbes, Soviet Communism: *A New Civilization*. উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

প্রকাশ মানবীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সেই অভিন্ন অবস্থা বিরাজিত রেখেছে। যেমন পৃথিবীর কতক অংশ অন্ধকারচ্ছন্ন থাকে রাত্রিকালে, অনুরূপভাবে কতকগুলো দেশ ও জাতি Sensate Culture-এর ভৌতিক ডানার নীচে চাপা পড়ে থাকে। রাত্রির অবসানে যেমন দিনের আলোর স্পর্শ ঘটে, Ideational সংস্কৃতির নব প্রভাতও অনুরূপ রীতিতে উদিত হতে থাকে। তবে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, যা উপক্ষো করা উচিত নয়। প্রাকৃতিক ও বস্তুজগতে যা কিছুই ঘটুক, তা প্রকৃতির অনমনীয় বিধান মেনে চলে–যা উপেক্ষা বা লংঘন করার কোন সুযোগই নেই।

প্রকৃতি তার দায়িত্ব পালন করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে,কিন্তু মানবীয় তৎপরতার অবস্থা সেরুপ নয়। তাকে দেয়া হয়েছে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি এবং তা প্রয়োগের স্বাধীনতা। সে পছন্দ করতে পারে, বাছাই করতে পারে, গ্রহণ বা বর্জন তথা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী। কাজেই কোন সংস্কৃতির যদি উত্থান হয় কিংবা পতন ঘটে, তবে তা সবই তার অনুসারীদের গ্রহন বা বর্জনের কারণে।তাদের উত্থান ও অগ্রগতির বা পতনের কোন নির্দিষ্ট সময় আগে থেকে চিহ্নিত করা যেতে পারে না। মানব-সত্তার নৈতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা তার অগ্রগতিকে নিশ্চিত করে। সাফল্য আসে শুধু সেই সমাজ ব্যবস্থার জন্যে যা পবিত্র ও ন্যায়পরতার বৃহত্তর ব্যবস্থায় উপস্থাপন ও পরিগ্রহণ করে। কিন্তু এই পবিত্রতা ও ন্যায়পরতা পাওয়া যেতে পারে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিগণের সচেতন ও ইচ্ছামূলক চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে, যারা একত্রিত হয়ে একটা সমাজ-সংস্থা গড়ে তুলেছে। কাজেই সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন যে সম্ভব, তা এক অনস্বীকার্য সত্য। এই সত্য যারা অস্বীকার করতে চায়, তারা বিজ্ঞানকে অস্বীকার কারার মতই গোঁড়ামী দেখানোর চেষ্টা করে মাত্র।

বস্তুত, এটা বিশ্বমানবতার জন্যে খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, Sensate বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় মানুষকে "merely a complex of electrone and protons, and animal organism, a reflex mechanism, a variety of stimulus response relationship or a psyco-analytical bag filled with psycho-logical libido."

(ইলেকট্রন ও প্রোটনের একটি যৌগিক ছাড়া আর কিছুই নয়। একটি পাষবিক দেহ সংগঠন আর একটি জীবন যন্ত্রের প্রতিবিম্ব। ক্রিয়া পতিক্রিয়া সম্পর্কের একটি বিচিত্র প্রকাশ অথবা একটি মনঃসমিক্ষণ গত ব্যাগ যেটি নানা বিদ্যাগত কর্মপ্রেরণা বা কর্মশক্তিতে ভরা।) বলে আখ্যায়িত করেছে।[১]

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষ একটা নিছক biological organism-এ পরিণত হয়ে গেছে। তাই তো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে মানবীয় জীবনও জন্ম-মৃত্যুর সেই একই আইন মেনে চলছে, যা পশু জীবনের ওপরও সমানভাবে কর্তৃত্ব করছে। এটা অনস্বীকার্য যে, যা পতনের দিকে চলে ও শেষ হতে থাকে তা অবশ্যই শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত মরবেই। প্রধানত জীববিদ্যা সংক্রান্ত সাদৃশ্য (Analogy)-ভিত্তিক এসব তত্ত্ব ভিত্তিহীন। কেননা মানুষ কোনক্রমেই "পশু" নয়, পশুর উর্ধ্বে তার স্থান। তার ভিতরে রয়েছে কাজের তাকীদ, রয়েছে নিজেকে চালিত করার চেতনা। এখানে এমন কোন অভিন্ন আইন নেই যে, সংস্কৃতি ও সমাজকে বাল্যকাল, পরিপক্কতা,

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

বার্ধক্য ও মৃত্যু এই স্তরগুলো পার হতেই হবে। উপরন্তু এই বহু পুরাতন তত্ত্বের কোন প্রবক্তা এমন কিছু দেখান নি, যদ্দারা সমাজের এই বাল্যকাল কিংবা সংস্কৃতি বার্ধক্য অর্থ্যাৎ প্রতিটি যুগ বা স্তরের বিশেষ চারিত্র্য বুঝা যেতে পারে।

একটা যুগ কখন শেষ হবে ও পরবর্তীটি কখন শুরু হবে ? একটা সমাজ কিভাবে মরে এবং সমাজ ও সংস্কৃতির মৃত্যু বলতে কি বুঝায় ? এগুলো নিছক অবান্তর ও অবান্তব দাবি মাত্র। ঠিক যেমন এক ধরনের জীবন যাত্রার অন্যটি স্থলাভিষিক্ত হওয়া থেকে কখনো তার মৃত্যু বুঝায় না। বস্তুত কোন সংস্কৃতির মৌল আকার-আকৃতি ও ধরনের অপরটির স্থলাভিষিক্ত হওয়া সেই সমাজ ও সংস্কৃতির মৃত্যুর সমার্থক নয়, বরং তা এই রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। আসলে সে ভুল ধারণার দরুন দুনিয়ার সংখ্যারিষ্ঠ শিক্ষিত মনীষীরা ভ্রমের মধ্যে পড়েছেন–তা হচ্ছে সংস্কৃতিকে একটি সুনির্দিষ্ট Organism রূপে দেখা তাদের কাছে সংস্কৃতিসমূহের সঙ্গে যোগাযোগের কোন সূত্র না থাকা।

মূলত সংস্কৃতি একটা Organism নয়, তা একটা আন্দোলন তথা চিরন্তন গতিশীলতা। ঐতিহাসিক তথ্য এই সত্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সে একটি সংস্কৃতির সুস্পষ্ট আলোক ধারা যখন গাঢ়ভাবে প্রবাহিত হয়, তখন তা কদাচিৎ শুকিয়ে যায়। তা জনগণের চিন্তা ও জীবনধারার উপর নিজের প্রভাব অব্যাহতভাবে চালিয়ে যায় এবং একটি নতুন সংস্কৃতি উপস্থাপন করে। উপসংহারে Briffault লিখিত Making of Humanity গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায় :

"Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world; but its fruits were slow in ripening-not until long after Moorish culture had sunk back in to darkness did the giant which it had given birth rise in his might, other and manifold influences from the civilization of lslam communicated its first glow to European life."

"For although there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic culture is not traceable nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the permanent distinctive force of the modern world, and the supreme source of its victory, natural science arose in Europe as a result of a new spirit of enquiry of new methods of investigation of the method of experiment, observation measurement of the development of mathematics in form unknown to the Greeks. That spirit and methods were introduced into European world by the Arabs."[১]

আধুনিক বিশ্বে আরব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে বিজ্ঞান; কিন্তু এর সুফল পরিণতি বিলম্বে হয়েছিল। তবে বেশিদিন পরে নয়, যখন স্পেন-বিজয়ী আরবদের সংস্কৃতি

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখন এই বিজ্ঞান প্রভুত শান্তি নিয়ে এক বিশাল সফলতা দেখিয়েছিল, ইসলামী সভ্যতার বহুবিধ প্রভাব এই বিজ্ঞানের প্রাথমিক আলো ইউরোপীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

যদিও ইউরোপীয় উন্নয়নের এমন কোন দিক নেই যেখানে ইসলামী সংস্কৃতির চরম প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না, আধুনিক বিশ্বের মধ্যে স্থায়ী এবং বৈশিষ্ট্যমূলক শক্তি হিসেবে খ্যাত ঐ বৃহৎ শক্তির যে অংশটির মধ্যে এর প্রভাব এত বেশী স্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ যা অন্য কোথায়ও তেমনটা মনে হয় না এবং এর বিজয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যার উদ্ভব ঘটেছে ইউরোপে। পরীক্ষা, নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং গ্রীকদের নিকট অপরিচিত ফর্মে গণিতের যে উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদির পদ্ধতিতে অভিনব অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তদন্ত চালানোর নব্য চেতনার ফলে এই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। ইউরোপীয় বিশ্বে আরবরাই সেই চেতনা এবং পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৭ম অধ্যায়
সংস্কৃতি ও সভ্যতা বা তামাদ্দুন

সংস্কৃতি সম্পর্কিত উপরোল্লিখিত বিস্তারিত আলোচনার পরও শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্যে কিছুটা অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সে জন্য সংস্কৃতি বা Culture শব্দটি অপর কয়েকটি শব্দের সাথে মিলিয়ে একাকার করে দিলে শব্দটি সম্পর্কে আর তেমন কোন গোলক ধাঁধার মধ্যে থাকতে হয় না। যেমন, তামাদ্দুন, Civilization বা সভ্যতা, সমাজ সংগঠন বা সংস্থা (Social structure) ও ধর্মমত (Religion).

উপরোল্লিখিত তিনটি শব্দের প্রতিটিই যেহেতু মানুষের জীবন ও সত্তার সাথে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত, এ জন্যে অনেক সময় সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারণে সভ্যতা, সমাজ সংগঠন বা ধর্মের প্রভাব, ফলাফল ও কর্মনীতির প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তবে সবচেয়ে বেশী গোলক ধাঁধাঁর সৃষ্টি করেছে 'তামাদ্দুন' শব্দটি। কেননা সাধারণত তামাদ্দুন ও সংস্কৃতি– এ দুটো শব্দকে একই অর্থবোধক মনে করা হয়। আর একটি বলে অপরটিকে মনে করে নেয়া হয়। অথবা একটির প্রভাবকে অপরটির ফলাফল গণ্য করা হয়।

এ জন্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে পৃথক করে প্রতিটির স্বতন্ত্র ও পূর্ণাংঙ্গ সংজ্ঞা দান করার জন্য প্রতিটির সীমা নির্ধারণ করা সাধারণ লোকদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। টি,এস এলিয়ট অবশ্য এ দুঃখই প্রকাশ করেছেন। তিনি তার গ্রন্থের সূচনায় স্বীয় অক্ষমতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে নিয়েছেন।

চিন্তাবিদ ফায়জী তামাদ্দুন-এর যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতেও সংস্কৃতি বা Culture শব্দটির পরিচয় স্পষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন– তামাদ্দুন বলতে দুটির একটিকে বুঝাবেঃ একটি হলো সুসভ্য হওয়ার পদ্ধতি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মানব সমাজের পূর্ণাঙ্গ ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত রূপ।

আন্তর্জাতিক ইসলামিক কলোকিয়ম-এর নিবন্ধকারদের মধ্যে কেবলমাত্র এম, জেড সিদ্দিকী কালচার-এর সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে সঠিক কথা বলেছেন। তিনি কালচার-এর কেবল সংজ্ঞাই দেননি, বরং কালচার এর সাথে তামাদ্দুনেরও তুলনা করেছেন।এ তুলনা ছিল সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং এতে করে উভয় শব্দেরই সত্যিকার রূপটি নির্ণয় করা হয়েছে। তিনি বলেছেন :

'সাক্বাফাত' বা সংস্কৃতি পরিভাষাটি দ্বারা চিন্তার বিকাশ ও উন্নয়ন বুঝায় আর তামাদ্দুন বা সভ্যতা সামাজিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায়কে প্রকাশ করে। কাজেই বলা যায়, সংস্কৃতি মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করে আর সভ্যতা বা তামাদ্দুন তারই সমান প্রকাশ ক্ষেত্রকে তুলে ধরে। প্রথমটির সম্পর্ক চিন্তাগত কর্মের সাথে আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক বৈষয়িক ও বস্তুকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে। প্রথমটি একটি অভ্যন্তরীণ ভাবধারাগত অবস্থা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাহ্যিক জগতে তার কার্যকারিতার নাম।[১]

---

১. M.Z.Siddiqui, *International Colloquium*, p.26. উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ অবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৫

ফায়জী সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও নির্ভুল। তিনি বলেছেন : 'সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ ভাবধারার নাম আর তামাদ্দুন বা সভ্যতা হল বাহ্য প্রকাশ।'[১]

এ পর্যায়ে মওলানা মওদূদী যা কিছু লিখেছেন তার সার কথা হল :

"সংস্কৃতি কাকে বলে তা-ই সর্বপ্রথম বিচার্য। লোকেরা মনে করে, জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, নিয়ম-নীতি, শিল্প-কলা, ভাষ্কর্য ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনী, সামাজিক রীতি-নীতি, সভ্যতার ধরন-বৈশিষ্ট্য ও রাষ্ট্র-নীতিই হল সংস্কৃতি। কিন্তু আসলে এসব সংস্কৃতি নয়, এসব হচ্ছে সংস্কৃতির ফল ও প্রকাশ। এসব সংস্কৃতির মূল নয়, সংস্কৃতি-বৃক্ষের পত্র-পল্লব মাত্র। এ সব বাহ্যিক রূপ ও প্রদর্শনীমূলক পোশাক দেখে কোন সংস্কৃতির মূল্যায়ন করা যেতে পারে বটে; কিন্তু আসল জিনিস হল এ সবের অন্তর্নিহিত মৌল ভাবধারা। তার ভিত্তি ও মৌলনীতির সন্ধান করাই আমাদের কর্তব্য।"[২]

টি.এস. ইলিয়ট, এম.জেড, সিদ্দীকী এবং মওলানা মওদূদীর পূর্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে চিন্তা ও মতাদর্শের পরিশুদ্ধি, পরিপক্কতা ও পারস্পরিক সংযোজন, যার কারণে মানুষের বাস্তব জীবন সর্বোত্তম ভিত্তিতে গড়ে ওঠতে এবং পরিচালিত হতে পারে।

১. Faizee; Islamic Culture.উদ্ধৃত,মাওলানা মুহাম্মদ অবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৭

২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

১ম পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে যে পার্থক্য, তা-ও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার। গিস্‌বার্ট (Gisbert) সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ নিরূপণ করেছেন, যথা ঃ

ক) দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে; কিন্তু সংস্কৃতির বিচার হয় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক উৎকর্ষের মানদন্ডে। সভ্যতার পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি, যেমন–হাতেবোনা তাঁতের তুলনায় যান্ত্রিক তাঁতের ক্ষমতা অনেক বেশী। আর শিল্পকলার ক্ষেত্রে মতভেদের কারণে কোন ভাল চিত্র কারোর দৃষ্টিতে সুন্দর, কারোর চোখে তা অসুন্দর–নিন্দনীয়।

খ) সভ্যতার অবদানগুলোকে সহজেই বোঝা যায়-উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃতির অবদান সাধারণ মানুষ অতো সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণ লোক সামান্য শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রাপাতির কলাকৌশল ও ব্যবহার-পদ্ধতি বুঝে নিতে পারে; কিন্তু কোন লোকে কবিতা বা ছবি আঁকা ভালোভাবে শেখালেই যে ঐ বিষয়ে সে দক্ষতা লাভ করবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

গ) সভ্যতার গতি যেমন দ্রুত, সংস্কৃতির গতি তেমন দ্রুত নয়। সংস্কৃতির গতি অনেক বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে একটা থমথমে নিশ্চল ভাব দেখা যায়। কখনো-বা সংস্কৃতি হয় পশ্চাদগামী।

ঘ) সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিণতি বা ফলাফল হল বড় কথা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিণতির বদলে কাজটা হল বড়–সেটাই হল লক্ষ্য। তাছাড়া সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগীতা যত তীব্র, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তত তীব্র নয়। মানুষ সৌন্দর্যকে নানাভাবে উপভোগ করতে পারে–বুদ্ধির সাধনায় নানাভাবে আত্মনিমগ্ন হতে পারে; কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিকতম সভ্যতার অবদান প্রাচীন আবিষ্কারকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে।[১]

বস্তুত ব্যক্তির সুস্থতা, সঠিক লালন ও বর্ধন লাভের জন্যে যেমন দেহ ও প্রাণের পারস্পরিক উন্নতিশীল হওয়া আবশ্যক, ঠিক তেমনি একটি জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুরোপরি সংরক্ষণ একান্তই জরুরী সে জাতির সঠিক উন্নতির জন্যে। বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন বা প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে তার জন্যে দেহতুল্য।

মানব জীবনের দুটি দিক। একটি বস্তুগত আর দ্বিতীয়টি আত্মিক বা প্রাণগত। এ দুটি দিকেরই নিজস্ব কিছু দাবি-দাওয়া রয়েছে–দেহেরও দাবি আছে, মনেরও দাবি আছে। মানুষ এ উভয় ধরনের দাবি-দাওয়া পূরণের কাজে সব সময়ই মশগুল হয়ে থাকে। কোথাও আর্থিক ও দৈহিক প্রয়োজন তাকে নিরন্তর টানছে; জীবিকার সন্ধানে তাকে নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। কোথাও রয়েছে আত্মার দাবি–আধ্যাত্মিকতার আকুল আবেদন। সে দাবির পরিতৃপ্তির জন্যে তার মন ও মগজকে সব সময় চিন্তা-ভারাক্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। মানুষের বস্তুগত ও জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার কাজ করে আর ধর্ম,

১. মাওলানা মুহাম্মদ অবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন তার মনের ক্ষুধা মিটায়। বস্তুত যেসব উপায়-উপকরণ একটি জাতির ব্যক্তিদের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগময় ভাবধারা এবং মন আত্মার দাবি পূরণ করে, তা-ই হচ্ছে সংস্কৃতি।

নৃত্য ও সঙ্গীত, কাব্য ও কবিতা, ছবি আঁকা, প্রতিকৃতি নির্মাণ, সাহিত্য চর্চা, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস এবং দার্শনিকের চিন্তা-গবেষণা একটি জাতির সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশ-মাধ্যম। মানুষ তার অন্তরের ডাকে সাড়া দিতে গিয়েই এসব কাজ করতে উদ্ধুদ্ধ হয়। এগুলো থেকে তৃপ্তি-আনন্দ-স্ফূর্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করে। দার্শনিকের চিন্তা-গবেষণা, কবির রচিত কাব্য ও গান, সুরকারের সঙ্গীত–এসবই মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবধারাই প্রকাশ করে। এসব থেকে মানুষের মন তৃপ্তি পায়, আত্মার সন্তোষ ঘটে আর এই মূল্যমান, অনুভূতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাসই জাতীয় সংস্কৃতির রূপায়ণ করে।

এখানেই শেষ নয়। এই মূল্যামান, অনুভূতি ও হৃদয়াবেগ এমন, যা এক-একটি জাতিকে সাংস্কৃতিক প্রকাশ-মাধ্যম গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ছাঁটাই বাছাই চালানের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। যা মূল্যমান ও মানদন্ডের দৃষ্টিতে গ্রহনযোগ্য প্রমাণিত হয়, তা-ই সে গ্রহণ করে আর যা তাতে উত্তীর্ণ হতে পারেনা তা সর্বশক্তি দিয়ে প্রত্যাখান করে–এড়িয়ে চলে। এ কারণেই দেখতে পাই, পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেনা। অনুরুপভাবে সমাজতন্ত্রীরা পুঁজিবাদী ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে–তাকে নির্মূল করতে চায়। ইসলামী আদর্শবাদীদের নিকট এ কারণেই ইসলামী সংস্কৃতির প্রশ্ন অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়।[১]

ব্যক্তির সার্বিক সুস্থতা ও ক্রমপ্রবৃদ্ধির জন্যে তার দেহ ও প্রাণ বা আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ উৎকর্ষ একান্তই জরুরী। এ যেমন সত্য, তেমিন একটি জাতির উন্নতি তখনি সম্ভব, যখন তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুরোপুরি সংরক্ষিত হবে। কেননা সংস্কৃতি হচ্ছে প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে দেহ।

অথ্যাৎ মানব জীবন দুটি দিক সমন্বিত ঃ একটি বস্তুনির্ভর, অপরটি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক। এ দুটিরই রয়েছে বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও দাবি-দাওয়া। সে চাহিদা পরিপূরণে মানুষ প্রতিমুহূর্ত থাকে গভীরভাবে মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত। একদিকে যদি দৈহিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাকে টানে এবং জীবিকার সন্ধানে সে হয় নির্লিপ্ত, তাহলে তার আত্মার দাবি পরিপূরণ ও চরিতার্থতার জন্যে তার মন ও মগজ হয় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

তাই মানুষের বস্তুনিষ্ঠ বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের জন্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তার সহায়তা কার। আর ধর্ম-বিশ্বাস, সৌন্দর্যবোধ ও দর্শন নিবৃত্ত করে তার আত্মার পিপাসা। অন্যকথায়, ব্যক্তিদের সূক্ষ্ম ও সুকোমল আবেগ-অনুভূতি এবং হৃদয় ও আত্মার দাবি ও প্রবণতা পুর্ণ করে যে সব উপায়-উপকরণ, তা-ই হচ্ছে সংস্কৃতি। সংগীত, কবিতা, ছবি অংকন, ভাস্কর্য সাহিত্য, ধর্ম-বিশ্বাস, দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতি এক-একটা জাতির সংস্কৃতির প্রকাশ-মাধ্যম এবং দর্পন। কোন বাহ্যিক ও বৈষয়িক উদ্দেশ্য লাভের জন্যে এসব তৎপরতা সংঘটিত হয় না। আত্মিক চাহিদা পুরণই এগুলোর আসল লক্ষ্য। এ সব সৃজনধর্মী কাজেই অর্জিত হয় মন ও হৃদয়ের সুখানুভূতি–আনন্দ ও উৎফুল্লতা। একজন দার্শনিকের চিন্তা ও মতাদর্শ, কবির কাব্য ও কবিতা, সুরকার ও বাদ্যকারের সুর-ঝংকার–এসবই ব্যক্তির হৃদয়-বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। এসবের

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমেই তার মন ও আত্মা সুখ-আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। এসব মূল্যমান, মূল্যবোধ, হৃদয়ানুভূতি ও আবেগ-উচ্ছাস থেকেই হয় সংস্কৃতির রূপায়ন। কিন্তু সভ্যতার রুপ এ থেকে ভিন্নতর । এখানে সংস্কৃতির একটা তুলনামূলক পরিচয় দেয়া হচ্ছে ঃ[১]

১. বস্তুনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজন পুরণ ও সাবলীলতা বিধানে যা কিছু সাহায্যকারী তা সভ্যতা নামে অভিহিত। কিন্তু মন-মানস ও আত্মার কামনা-বাসনা ও সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতির চরিতার্থতার উপায়-উপকরণকেই বলা হয় সংস্কৃতি।

২. বস্তুনিষ্ঠ জীবনের রূঢ় বাস্তব ও প্রকৃত উন্নতির স্তর ও পর্যায়সমষ্টি হচ্ছে সভ্যতা। বিশেষ-নির্বিশেষ সকলের পক্ষেই তার মূল্য ও মান হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ও সম্ভব। কিন্তু সংস্কৃতি অদৃশ্য ধারণা ও মুল্যমান সমষ্টি, তার মূল্যায়ন অতীব দুরুহ কাজ।

৩. সভ্যতা ক্রম-বিকাশমান, প্রতি মুহূর্তে উন্নতিশীল। প্রাচীন মতাদর্শের সাথে তার দূরত্ব ক্রম-বর্ধমান। তা নিত্য-নতুন দিগন্তের সন্ধানী। কিন্তু সংস্কৃতি প্রাচীনপন্থী, প্রাচীনতম দৃষ্টিকোণ ও মতাদর্শ থেকে নিঃসম্পর্ক হওয়া তার পক্ষে কঠিন।

৪. সভ্যতা দেশের সীমা-বন্ধনমুক্ত–বিশ্বজনীন ভাবধারাসম্পন্ন। প্রায় সব চিন্তা-বিশ্বাসের লোকদের পক্ষেই তা-গ্রহনযোগ্য।

কিন্তু সংস্কৃতির ওপর পরিবেশ ও ভৌগোলিক বিশেষত্বের ব্যাপক প্রভাব প্রবর্তিত হয়। অর্থ্যাৎ সংস্কৃতির আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহুলাংশে বন্দী; কেবলমাত্র সমমতের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক মেজাজ-প্রকৃতির উপর তাদের বিশেষ ধর্মের সর্বাত্মক প্রভাব বিরাজিত। সেই সঙ্গে উপমমহাদেশের মুসলমানরা একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমানদের থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর।

৫. সভ্যতা স্থিতিশীল ও দৃঢ়তাপ্রবণ। তার প্রভাব সহজে নিশ্চিহ্ন হবার নয়। কিন্তু সংস্কৃতি প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্তই অস্থায়িত্ব ও ক্ষণভঙ্গুরতার ঝুঁকির সম্মুখীন।

৬. সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুগত প্রয়োজনাবলীই তার লীলাক্ষেত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনী ও বিভিন্ন শৈল্পিকার দূর্লভ উপকরণ ও প্রতিষ্ঠানাদি (সভ্যতার মহাকীর্তি) এক দেশ ও জাতি থেকে ভিন্নদেশ ও জাতির মধ্যে চলে যেতে পারে। অনুন্নত জাতিগুলো তা থেকে উপকৃত হতে পারে। স্বভাব-প্রকৃতিগত পার্থক্য তার পথে বাধা হতে পারেনা। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা ব্যবহার করে কল্যাণ লাভ করতে পারে। তার কল্যাণ লাভে কোন প্রতিবন্ধকতাই নেই। বাছাই-প্রক্রিয়াও এখানে অচল।

কিন্তু সংস্কৃতি সাধারণত এক বংশ থেকে তারই অধঃস্তন বংশে উত্তরিত হয়। তা সম্যকভাবে অর্জিত হয় না। বাছাই-প্রক্রিয়া এখানে পুরোপুরি কার্যকর । কেবলমাত্র বিশেষ পরিমন্ডলের

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

লোকদের পক্ষেই তার কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। দার্শনিকসূলভ চিন্তা-গবেষণা ও কবিসূলভ উচ্চমার্গতার অনুভূতি যার-তার পক্ষে আয়ত্তযোগ্য নয়।

৭. সভ্যতা অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। সেখানে তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আপন করে নিয়েছে; কিন্তু এ কার্যক্রমের ফলে তার সাংস্কৃতিক কাঠামো খুব শীগগীর প্রভাবিত হতে পারেনি। উপমহাদেশের জনগণের উপর ইংরেজের শাসনকার্যের ফলে সামাজিক, অর্থনেতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে এখানকার সভ্যতা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার সংস্কৃতি তার আসল চরিত্র বা রুপরেখা হারায়নি।[১]

কেননা সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ জীবন-কেন্দ্রিক। অন্তর্নিহিত জীবনই সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র। এই জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের মাধ্যম হচ্ছে সংস্কৃতি। অর্থ্যাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে মন ও মগজ-কেন্দ্রিক–আবর্তন-বিবর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত বহিঃপ্রকাশ। এই কারণে সংস্কৃতি স্বাধীন-মুক্ত সমাজ-পরিবেশেই যথার্থ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

মোটকথা, আমরা যা ভাবি, চিন্তা করি, বিশ্বাস করি, তা-ই সংস্কৃতি। হৃদয়ানুভূতি, চিত্তবৃত্তি, আবেগ-উচ্ছাস ও মানসিক ঝোঁক-প্রবণতার সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক। কেননা এগুলো মানুষের মধ্যে স্বভাবগত ও প্রকৃতিগতভাবেই বর্তমান। মানব-প্রকৃতি তার সাথে নিঃসম্পর্ক হতে পারে না কখনই। সভ্যতায় রয়েছে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনাবলীর প্রশ্ন। মানব জীবন যদি শিল্প-কারখানা ছাড়াই অবাধে চলতে পারে, এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা হতে থাকে, তাহলে তার জন্যে সামান্যতম কাতর হওয়ারও কোন প্রয়োজন বোধ হবে না কারোর।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ঢালাওভাবে এটা ঠিক নয়। তবে এ দুটির মাঝে মূল্যমানের সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। মোটরগাড়ি সভ্যতার উৎপাদন। সংস্কৃতি তাতে সৌন্দর্য, শোভনতা ও চিত্ত-বিনোদমূলক কারুকাজ ও সূক্ষ্ম উপকরণাদি বৃদ্ধি করেছে। সভ্যতা আকাশচুম্বী প্রসাদ নির্মাণ করেছে; সংস্কৃতি সে প্রাসাদকে সুদৃশ্য মহিমান্বিত এবং বিস্ময়কর প্যাটার্নে সুশোভিত করে দিয়েছে। বস্তুত সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুটিই মানব জীবনের মৌল প্রয়োজন। যে জাতির জীবনে একসঙ্গে এ দুটিরই সমন্বয় ঘটেনি, তার উন্নতি অসম্ভব। সভ্যতা একটা জাতিকে বস্তুনিষ্ঠ শক্তিতে মহিমাময় করে আর সংস্কৃতি তাকে গতিবান করে নির্ভুল পথে । মানব সভ্যতার আধুনিক পর্যায়ে এ দুটির মাঝে গভীর একাত্মতা প্রকট। তাই সভ্যতার অর্থে সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি অর্থে সভ্যতাকে গ্রহন করা কিছুমাত্র অশোভন নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এভাবেই পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।[২]

আমরা প্রায়শ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে এক করে দেখি, কিন্তু এই প্রত্যয় দুটি অভিন্ন নয়। সংস্কৃতির শুরু সৃষ্টিযজ্ঞ তথা "Prologue in heaven"-এর সাথে। সংস্কৃতি তার ধর্ম, নীতি ও দর্শন সহযোগে মানুষ ও মানুষের আদি উৎস পারমার্থিক জগতের পারস্পরিক সম্পর্ককে উচ্চকিত

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

করে। সকল সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি মানুষের স্বর্গীয় উৎপত্তির ধারণার প্রতি স্বীকারোক্তি কিংবা অস্বীকৃতি, সন্দেহ কিংবা স্মৃতিচারণ; সংস্কৃতি এই হেঁয়ালি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং এই হেঁয়ালিই যুগে যুগে নানাভাবে প্রকাশ করে চলেছে সে।

বিপরীতক্রমে সভ্যতা হল প্রণীবিদ্যক ও একরৈখিক জীবনের ধারাবাহিকতা যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বস্তুগত আদান-প্রদান চলে। এখানে মানব জীবনের সাথে পশু-জীবনের পার্থক্য রয়েছে বটে, কিন্তু তা শুধু মাত্রা, স্তর ও সংগঠনের দিক থেকে, গুনগত প্রেক্ষাপটে নয়। এ পর্যায়ে মানুষ পরাজাগতিক রহস্য, হ্যামলেট কিংবা কারামাজোভের মত কালজয়ী চরিত্রের শাশ্বত অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বারা আক্রান্ত নয়। সমাজের অসংখ্য বেনামী সদস্য এখানে প্রকৃতিপ্রদত্ত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার করে এবং পৃথিবীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে থাকে।

সংস্কৃতি হল মানুষের ওপর ধর্মের কিংবা মানুষের ওপর স্বয়ং মানুষেরই (man's influence on himself) প্রভাবের ফলশ্রুতি, যেখানে সভ্যতা হল প্রকৃতি তথা বাহ্য পৃথিবীর উপর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবের ফল। সংস্কৃতি হল "মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার আর্ট" যেখানে সভ্যতার অর্থ হল শৃংখলা, ক্রিয়া ও যথার্থতা। সংস্কৃতি হল "অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করা" সভ্যতা হল পৃথিবীকে পরিবর্তন করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। এখানেই মানুষ ও বস্তু তথা humannism ও chosism এর মধ্যেকার বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়।

ধর্মাচরণ, নাটক, কবিতা, খেলাধুলা, লোকজ সংস্কার, লোককথা, পুরাণগাঁথা, নৈতিক ও নন্দনতত্ত্বীয় ব্যবস্থা, দর্শন, থিয়েটার, গ্যালারী, যাদুঘর, গ্রন্থাগার, রাজনীতি ও বিচার ব্যবস্থা যা মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্য ও তার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করে–এগুলোই মানব সংস্কৃতির অখন্ড ধারাচিত্র, যার শুরু স্বর্গে, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যকার আদি যোগাযোগর সূত্রে। এ হল "এক প্রজ্বলিত আলোক শিখার সাহায্যে গাঢ় অন্ধকার ভেঙে ভেঙে অনতিক্রমে সেই পবিত্র পর্বতে মানুষের আরোহন প্রচেষ্টার ছবি।"[১]

সভ্যতা পারমার্থিক নয়, বরং কলাকৌশলগত প্রগতির ধারাবাহিকতা, ঠিক যেমনটি ডারউইনীয় বিবর্তন মানবিক নয়, জীববিদ্যক প্রগতির ধরাবাহিকতা। সভ্যতা হল আমাদের পূর্বপুরুষদের চারপাশে অস্তিত্বশীল অচেতন, অর্থহীন, প্রাকৃতিক ও যান্ত্রিক উপাদানসমূহের ক্রমাগত উন্নয়ন। কাজেই সভ্যতা নিজে ভালোমন্দ নিরপেক্ষ। মানুষের নিশ্বাস ও খাদ্য গ্রহণ যেমন সহজাত, তেমনি সভ্যতার সৃজনও স্বাভাবিক। সভ্যতা একাধারে আমাদের অন্তর্গত স্বাধীনতার অন্তরায়, আবার আমাদের জন্যে অপরিহার্যও বটে। বিপরীতক্রমে সংস্কৃতি হল মানবিক স্বাধীনতারই নির্বাচন ও প্রকাশন।

সভ্যতায়, বস্তুর উপর মানুষের নির্ভরতা বেড়েই চলছে। এক হিসেব মতে প্রত্যেক মার্কিন প্রতি বছর অন্তত ৮ টন বিভিন্ন ধরনের বস্তুগত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে থাকে। প্রতিনিয়ত নতুন চাহিদার সৃষ্টি ও সেই চাহিদা পূরণের ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে সভ্যতা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বস্তুগত আদান-প্রদান ত্বরান্বিত ও ঘনট করে; সেখানে বাহ্যিক জীবন যাপন ছন্দ উচ্চকিত হয়, কিন্তু অন্তর্নিষ্ঠ জীবনের সুরটি চাপা পড়ে যায় সভতার যান্ত্রিকতার তলে।

---

১. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, *প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম* (ঢাকা: আমান পাবলিশার্স, ১৯৯৬ খ্রী.), পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

"Produce to gain to squander"–সভ্যতায় এই ভাবনা সহজাত। অপরদিকে প্রতিটি সংস্কৃতি তার ধর্মীয় প্রকৃতির কারণে মানুষের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণকে হ্রাস করতে চায়। সে চায় মানুষের অন্তগর্ত স্বাধীনতার সুরকে জোরালো করতে। সকল সংস্কৃতিতে পাওয়া সন্ন্যাসবৃত্তি ও আত্মঅস্বীকৃতির ব্যাপারটি এখানে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধর্মের "সংযত আকাঙ্খার" নীতির পরিবর্তে সভ্যতাকে এই ভিন্নধর্মী মন্ত্রকে লালন করতে হয়েছে: "প্রতিনিয়ত তৈরি কর নতুন আকাঙ্খা"[১] কিন্তু এই দুই দাবির অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য দুর্ঘটনাপ্রসূত নয়: এই দুই বিপরীতমর্ধী দাবি মানব চরিত্রের দুই অপরিহার্য দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃতিরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

'সংস্কৃতির বাহক মানুষ, সভ্যতার বাহক সমাজ। সংস্কৃতির অর্থ সহজাতবোধের পরিচর্যার মাধ্যমে আত্মশক্তি অর্জন, সভ্যতার সংযোগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নগরী ও রাষ্ট্রের সাথে–এর মাধ্যম হল চিন্তা, ভাষা, ও লেখনী। সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্পর্ক স্বর্গজগত ও ইহজগতের বা Civitas Dei ও Civitas Solis-এর সম্পর্কের অনুরূপ। একটি নাটকীয়তার (drama) প্রতিনিধিত্ব করে, অপরটি প্রতিনিধিত্ব করে ইউরোপিয়ার।'[২]

ট্যাসিটাস বলছেন যে, রোমানদের চেয়ে বার্বাররা তাদের দাসদের সাথে তুলনামূলক ভাবে অনেক ভাল আচরণ করত। সাধাণরভাবে সংস্কৃতির ও সভ্যতার মধ্যেকার সীমারেখা বোঝার জন্যে প্রাচীন রোমকে উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। লুণ্ঠন, যুদ্ধ অমানবিক শাসকশ্রেণী ও অসংখ্য নিরাবয়ব মানুষ, নিম্নতম প্রলেতারিয়েত শ্রেণী, মিথ্যে রাজনৈতিক ছলচাতুরি, খ্রিষ্টান হত্যা, গ্লাডিতোরিয়া (রোমের শাসক ও সামন্ত শ্রেণীর মনোরজনের জন্যে প্রদর্শিত দাসদের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রাণপণ খেলা), নীরো ও কালিগুলার আচরণ–এ সবই যে রোমান সভ্যতার সত্য চিত্র সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু সংস্কৃতি কতটা সেখানে ছিল কিংবা সংস্কৃতির অনুষঙ্গ আদৌ ছিল কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ হয়।[৩]

স্পেঙ্গলার তাই বলেছেন, "Hellenic soul and Roman intellect-that is the difference between coulture and civilization."[৪] একইভাবে মায়া সংস্কৃতি, প্রাচীন জার্মান এবং ভারতীয় আদিবাসীদের সংস্কৃতিও রোমানদের সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত।

ইওরোপীয় রেনেসাঁও এই প্রেক্ষিতে ভাল দৃষ্টান্ত হিসাবে গৃহীত হতে পারে। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানবেতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই যুগটি এক এ ধরনের পতনোন্মুখতার যুগ। রেনেসাঁর আগের শতকে ইওরোপে এক সত্যিকার অর্থনৈতিক বিপ্লব সংগঠিত হয়, যা সম্ভব হয় বর্ধিত উৎপাদন ও ভোগের মাধ্যমে এবং জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধির সাথে সাথে। কিন্তু রেনেসাঁর যুগ বলে পরিচিত পরবর্তী দু'শ বছরে (১৩৫০-১৫৫০) এই অর্থনেতিক বিপ্লবের অনেকখানিই হারিয়ে যায়। পৃথিবীর পরিবর্তে শুধু মানুষ ও মানবমুখে একনিষ্ঠ থাকায় বাস্তবতার প্রতি এক অলস ঔদাসীন্য দেখা দেয় এ সময়ে। এই রেনেসাঁর যুগে একের পর এক যখন পশ্চিমা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্মগুলো সৃষ্টি হচ্ছে, তখন অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণ স্থবিরতা ও

---

১. New York Times- এ সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নিবন্ধে এই প্রস্তাবনাকে বলা হয়েছে 'নবযুগের প্রথম সূচক'

২. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪. Oswald Spengler, *The Decline of the West*, p. 32 . উদ্ধৃত,আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিষ্কার অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠছিল যার সাথে যোগ হয় জনসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা। চতুদর্শ শতকের মাঝামাঝি ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল ৪ মিলিয়ন; এক'শ বছর পরে এই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ২.১ মিলিয়নে। চতুর্দশ শতকে ফ্লোরেন্সের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ থেকে ৭০ হাজারে হ্রাস পায়।

কাজেই দুই ধরনের প্রগতি রয়েছে যাদের মধ্যে মূলত কোন আন্তঃসম্পর্ক নেই। অন্য কথায় 'সংস্কৃতির প্রগতি' ও 'সভ্যতার প্রগতি' সমান্তরালবর্তী নয়।[১]

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও ধ্যান

সভ্যতা মানুষকে শিক্ষিত করে, সংস্কৃতি মানুষকে আলোকিত করে। একটির প্রয়োজন জ্ঞানার্জন, অপরটির প্রয়োজন ধ্যান। ধ্যান নিজেকে জানার এবং পৃথিবীতে নিজের স্থানকে বুঝে নেওয়ার অন্তর্নিষ্ঠ প্রচেষ্টা যা জ্ঞানার্জন, শিক্ষা কিংবা বাস্তব উপাত্তসমূহ সংগ্রহ প্রচেষ্টার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধ্যান এগিয়ে নিয়ে যায় বিচক্ষণতা, নমনীয়তা প্রশান্তি বা অন্য কথায় Greek Catharsis -এর দিকে।

এটা হল কতক ধর্মীয়, নৈতিক, শৈল্পিক সত্যকে হৃদয়াঙ্গম করার লক্ষ্যে নিজেকে নিজের মধ্যেই নিবেদন ও নিমজ্জিত করা। অপরদিকে শিক্ষা হল প্রকৃতিকে জানা এবং স্বীয় অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রকৃতির দিকে ফেরা। বিজ্ঞান প্রয়োগ করে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, বিভাজন ও পরীক্ষণ পদ্ধতি যেখানে ধ্যানের অর্থ 'খাঁটি উপলব্ধি' (নব্য প্লেটোবাদে ধ্যান উপলব্ধির পরাবৌদ্ধিক মাধ্যম)। ধ্যানমূলক পর্যবেক্ষণ ইচ্ছা ও আকাঙ্খা থেকে মুক্ত । (সপেনহাওয়ার বলেছেন); এই ধ্যান কোন বৈজ্ঞানিকের পথ নয়, তা একজন কবি, একজন ভাবুক বা একজন শিল্পীর পথ। একজন বৈজ্ঞানিকেরও ধ্যানের রাজ্য অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ মাত্রই বিজ্ঞানী আর বিজ্ঞানী থাকেন না, তিনি হয়ে পড়েন অখন্ডসত্তা এক শিল্পী। ধ্যানে নিজের ওপর আধিপত্য করা যায়, বিজ্ঞান সাহায্য করে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা আমাদের সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়, সংস্কৃতিকে নয়।

আজকের দিনে মানুষ শেখে, অতীতে মানুষ ধ্যানমগ্ন হত। কিংবদন্তী বলে বোধিপ্রাপ্ত হওয়ার আগে মহামতি বুদ্ধ তিন দিন তিন রাত্রি নদীর ধারে ধ্যানমগ্ন হয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ছিলেন, সময়চেতনা বিস্মৃত হয়ে। জেনোফেন সক্রেটিস সম্পর্কে একই রকম কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন : "একদিন সকালে সক্রেটিস একটি জটিল সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলেন যার সহজ সুরাহা হচ্ছিল না; দুপুর গড়িয়ে গেল, তিনি ঠাই দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন কেউ কেউ ঔৎসুক্য সহকারে ঘটনাস্থলের অদূরে তাদের মাদুর এনে অবস্থান নেয় যাতে তারা তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারে। সক্রেটিস দিনাবসানের পর সারা রাত্রিও একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, অতঃপর পরের দিন সূর্যোদয়ের পর তার ধ্যানভঙ্গ হয়। তিনি ফিরে প্রার্থনা করেন, তারপর নিজের পথে পা বাড়ান।"[১]

টলস্টয় তাঁর সারা জীবন অতিবাহিত করেন মানুষ ও মানুষের নিয়তি বিষয়ে চিন্তা করতে করতে, যেখানে ইওরোপীয় সভ্যতার প্রবাদপুরুষ গ্যালিলিও সারা জীবন নিজের চিন্তাকে বেঁধে রাখেন একটি শরীরের পতনজনিত সমস্যার সাথে। ধ্যান করা বা শিক্ষা লাভ সম্পূর্ণ দুই ধরনের কর্মকান্ড বা দুই ধরনের শক্তি যা দুই ভিন্ন লক্ষ্যে নিবেদিত। প্রথমটি বেতোফেনকে তাঁর 'The Ninth Symphony' সৃষ্টির দিকে এগিয়ে নেয়; দ্বিতীয়টি নিউটনকে এগিয়ে নেয় 'The Law of Gravitation' আবিষ্কারের দিকে। এভাবে ধ্যান ও শিক্ষার মধ্যকার বৈপরীত্য

১. Xenephon, *Symposium*, P. 220. উদ্ধৃত,আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

আরেকবার পুনরাবৃত্ত করে মানুষ ও পৃথিবী, আত্মা ও বুদ্ধিমত্তা কিংবা সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যেকার বৈপরীত্যকে।

প্রকৃতিতে বহুবিধ বাস্তব উপকরণ সহজলভ্য যার সাহায্যে মানুষ পৃথিবীর নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে যে জিনিস অনুপস্থিত সেটি হল আত্ম (Self) বা ব্যক্তিত্ব যার মাধ্যমে মানুষের সাথে শাশ্বতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই আত্ম বা অহম বা 'আমিত্ব'–এর মাধ্যমে মানুষ একই সাথে পৃথিবী ও পর জগতের বাসিন্দা হতে পারে। এরই মাধ্যমে দসে পারমার্থিকতা ও অন্তর্গত স্বাধীনতার অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে। কাজেই ধ্যান হল আত্মসমুদ্রে অনবরত অবগাহন করা, নিজেকে নিজের মধ্যে স্থাপিত করা, ধ্যানের সাথে সমাজিক প্রশ্নমালার কোন সম্পর্ক নেই।

ধ্যান বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড নয়। একজন বিজ্ঞানী একটি নতুন মডেলের উড়োজাহাজ তৈরি করতে গিয়ে ধ্যান করেন না; তিনি চিন্তা করেন, গবেষণা, অনুসন্ধান ও তুলনামূলক বিচার করেন। কিন্তু একজন সাধু, একজন কবি বা একজন শিল্পী ধ্যান করেন। তাঁরা সত্যানুসন্ধান ও এক মহিমাময় রহস্যের উন্মোচনের পথে বিচরণ করেন। এই সত্যানুসন্ধান সবকিছু, আবার কিছুই নয়; একটি আত্মার নিকট সবকিছু, বাদবাকি পৃথিবীর নিকট কিছুই নয়।

কাজেই ধ্যান একটি ধর্মীয় কর্মকান্ড। এ্যারিষ্টটলের নিকট যুক্তি ও অনুধ্যানের মধ্যে পার্থক্য মানবিক ও স্বর্গীয়–এর মধ্যকার পার্থক্যের অনুরূপ বৌদ্ধ ধর্মে প্রার্থনার অর্থ ধ্যান। খ্রিষ্টান ধর্মের 'Contemplative Order' একই ব্যাপার। স্পিনোজা অনুধ্যানকে নৈতিকতার চূড়ান্ত ফর্ম ও উদ্দেশ্যরূপে আখ্যায়িত করেছেন:

শিক্ষা মানুষকে অধিকতর ভাল, অধিকতর স্বাধীন বা অধিকতর মানবিক করে না। পরিবর্তে শিক্ষা মানুষকে অধিকতর দক্ষ, অধিকতর সমর্থ ও সমাজের জন্যে অধিকতর উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পশ্চাৎপদ মানুষের চেয়ে শিক্ষিত মানুষেরা অকল্যাণকর কাজে বেশি পটু। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস অধিকতর সভ্য ও শিক্ষিত মানুষ কর্তৃক অল্প শিক্ষিত ও অনগ্রসর মানুষের বিরুদ্ধে অন্যায়, অযৌক্তিক ও বশ্যতামূলক আগ্রাসনের ইতিহাস। শিক্ষার উচ্চ স্তর সাম্যজ্যবাদীদের আগ্রাসী তৎপরতাকে মসৃণ করার জন্যেই সব রকমের সহায়তা করেছে।[১]

১. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

গণসংস্কৃতি

সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক নয়। এখন প্রশ্ন হল: তথাকথিত গণসংস্কৃতি (mass culture) কি সংস্কৃতি নাকি সভ্যতারই একটি প্রকল্প বিশেষ ?

যে কোন সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় বিষয় হল মানুষ, ব্যক্তি হিসেবে, ব্যক্তিত্ব হিসেবে। কিন্তু গণসংস্কৃতির বিষয় হল mass বা man-mass একজন মানুষের আত্মা রয়েছে, কিন্তু একদল জনতার চাহিদা ছাড়া কিছুই নেই। সুতরাং সকল সংস্কৃতি মানুষেরই লালিত সন্তান, যেখানে গণসংস্কৃতি হল শুধু প্রয়োজন পূরণ বা চাহিদার যোগানদার। সংস্কৃতি ব্যক্তিসত্তা অভিমূখী, গণসংস্কৃতি পরিচালিত ঠিক বিপরীতক্রমেঃ সার্বিক সমরূপতা (uniformity) তথা নৈর্ব্যক্তিকরণের দিকে।

একটি সর্বব্যাপ্ত ভূল হল গণসংস্কৃতির (mass culture) সাথে লোকসংস্কৃতিকে (propular culture) এক করে দেখা। এটা লোকসংস্কৃতির জন্যে ক্ষতিকারক কারণ তা গণসংস্কৃতির চেয়ে সন্দেহাতীতভাবে স্বতন্ত্র, খাঁটি, সক্রিয় ও জীবন্ত। এর মধ্যে কোন চটকদারি নেই।

লোকসংস্কৃতি সৃজন ও অংশ গ্রহণের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু গণসংস্কৃতির মূল কথা হল নিপুনতার সাথে অন্যকে বশে আনা। নাচ, গান, ধর্মীয় আচার ইত্যাদি একটি গ্রাম কিংবা উপজাতীয় জীবনের সাধারণ সম্পদ। এগুলো তারা পরিবেশন করে তারাই উপভোগ করে সকলে মিলে, অকৃত্রিম বন্ধন, ও অনুভাবনা সহকারে। কিন্তু গণসংস্কৃতি উপভোগের ক্ষেত্রে মানুষ উৎপাদক ও ভোক্তা-এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দর্শকদের মধ্য থেকে কেউ কি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালাকে প্রভাবিত করতে পারেন? তথাকথিত গণমাধ্যম-সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও অন্যান্য সম্প্রচার মাধ্যম প্রকৃতপক্ষে গণবশীকরণেরই মাধ্যম। একদিকে গুটিকতক মানুষের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদকীয় অফিস, অপরদিকে লক্ষ কোটি নিষ্ক্রিয় দর্শকশ্রোতা।

১৯৭১ সালে নেয়া একটি অনুসন্ধান রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রায় সকল ইংরেজ সপ্তাহে ষোল থেকে আঠারো ঘন্টা ব্যয় করে টেলিভিশন দেখে। প্রতি তিনজন ফরাসির একজন কখনো বই পড়ে না; ফরাসি দেশের শতকরা ৮৭ ভাগেরও বেশি মানুষের সাংস্কৃতিক বিনোদনের প্রধান মাধ্যম টেলিভিশন। ব্যালে ও অপেরার স্থান অনুসন্ধান তালিকার একেবারে নীচে। ১৯৭৬ সালে জাপানে নেয়া একটি অনুসন্ধান রিপোর্টে একই চিত্র পাওয়া যায়। প্রায় ৩০ ভাগ জাপানি কোনরকম বই পড়ে না, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই প্রতিদিন ২.৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করে টেলিভিশন দেখে।

সানফ্রানসিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Horikara দাবি করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গামী উঠতি প্রজন্মের জ্ঞান ধারণ ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ মান থেকে অনেক নীচে। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, টেলিভিশন মানুষের সকল সমস্যার রেডিমেড সমাধান দিয়ে থাকে এবং অত্যন্ত সহজেই তা সাহিত্যের ও চিন্তনের স্থান দখল করে নিয়েছে; ফলত তা সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকান্ড অসম্ভব করে তুলেছে।[১]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখছি কিভাবে সরকারি আধিপত্যের মধ্যে রেডিও-টেলিভিশনের মত গণমাধ্যমগুলো গণপ্রবঞ্চনা করে যাচ্ছে। এখন আর মানুষকে শাসন করার জন্যে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। এখন 'বৈধ' ভাবেই মানুষের ইচ্ছাকে অবশ করে তাদের শাসন, শোষণ ও 'সত্য'র বটিকা সেবন করিয়ে তাদের স্বচিন্তা ও মতামত গঠনে প্রতিহত করা যাচ্ছে সহজেই এবং তা সম্ভব হচ্ছে এই গণমাধ্যম দ্বারা।

গণমনস্তত্ত্ব প্রমান করেছে যে, ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অবাস্তব কোন মীথের ব্যাপারে মানুষকে প্রভাবিত করা সম্ভব। গণমাধ্যম বিশেষত টেলিভিশনকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে, তা মানুষের চৈতন্য ও আবেগ এবং অনুপ্রেরণাময় দিকটিকেই বশীভূত করেনি শুধু, বরং মানুষের মধ্যে এই অনুভূতিকেও সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে যে, আরোপিত মতামতটি যেন তারই।[১]

সকল অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা তাদের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে টেলিভিশনকে বেছে নিয়েছে। ফলত টেলিভিশন স্বাধীনতার শত্রু হবার পাশাপাশি পুলিশ, জেলখানা ও কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হয়েছে। অতীতে শাসকের দাপট হ্রাস করার জন্যে যদি সংবিধান প্রণীত হয়ে থাকে তাহলে বর্তমানে টেলিভিশনের ছদ্মবেশী ক্ষমতা নিবারণের জন্যেও নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

গণসংস্কৃতি মনের এমন অবস্থা দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত যাকে Johan Huizinga বলছেন 'ছেলেমানুষি'। তিনি সমকালীন মানুষের আচরণে শিশুসূলভতা লক্ষ্য করেছেন, যেমনঃ হালকা বিনোদনে ভক্তি, পরিপক্ক হিউমারের অভাব, গণশ্লোগান ও মিছিলের দিকে ঝোঁক, ঘৃণা কিংবা ভালবাাসা, প্রশংসা কিংবা নিন্দা অভিঅভিব্যক্তি ইত্যাদি।[২]

পরিশেষে আমরা যন্ত্রের প্রতি একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দৃকপাত করতে পারি। যন্ত্র ও প্রযুক্তির প্রতি সংস্কৃতির সহজাত ভীতি ও বিরাগ রয়েছে। Berdjajev বলছেন, "যন্ত্রসংস্কৃতির প্রথম পাপ।" এই ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আসছে এই কারণে যে, যন্ত্র প্রথমদিকে বিভিন্ন বস্তুর ওপর আধিপত্য করত আর এখন মানুষের ওপর আধিপত্য করতে শুর করেছে। স্মরণ করেন ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ), টলস্টয়, হেইডেগার, নীজবাস্তনী, ফকনার প্রমূখের সর্তক বাণী। অন্যদিকে মার্ক সবাদী Henri Lefebvre সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন ঃ "স্বাধীনতার সর্বোচ্চ স্তর অর্জিত হবে শুধু সেই সমাজে যেখানে প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার সার্বিক সফূরণ ঘটবে এবং সেটা হল কমিউনিষ্ট সমাজ।"[৩]

মূলত: যে সমাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউটোপিয়াকে আর্দশ মানে সে সমাজ যন্ত্র ও প্রযুক্তিকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু যন্ত্র মানুষকে ব্যবহার করে, তাকে নিরাপত্তা দেয় না; শিক্ষা ও গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তা একই কৌশলকেন্দ্রে সকলকে আনতে চায়, অত:পর ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্বকে ভোতা করে, তার কর্ম, চিন্তা ও বক্তব্যকে পানসে করে তাকে একটি একক সমাজের (কর্তৃত্বের) অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

মানবতাবিরোধী প্রগতি

আমেরিকার হাউড্রোজেন বোমার স্রষ্টা অপেনহেইমারের মতে প্রযুক্তি ও বস্তুগত উন্নয়নের প্রেক্ষিতে মানব জাতি গত চার শ' বছরে যা করেছে, তার চেয়ে বেশি করেছে গত চল্লিশ বছরে। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত মানুষে মানুষে মনোদূরত্ব বেড়েছে $১০^{২৬}$-$১০^{৪০}$, তাপমাত্রা বেড়েছে $১০^{৫}$-$১০^{১১}$। আগামী তিরিশ বছরের মধ্যে পুরনো পিষ্টন ইঞ্জিনের পরিবর্তে আসবে পারমাণবিক শক্তিচালিত নৌকা । সেদিন খুব দূরে নয় যেদিন রাস্তার নীচে শুয়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক যানবাহন চলাচল করবে। জাঁ রসতান্দ বায়োলজির যাদুকরী সম্ভাবনার কথা কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে অত্যন্ত প্রতিভাবান মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নকৃত বংশগত সারবস্তু ব্যবহার করার মাধ্যমে মানব জাতি নিজেকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে। বিজ্ঞানীরা যদি কৃত্রিম ডিএনএ (DNA-ক্রমোজমের মধ্যে পাওয়া বংশগত সারবস্তুর রাসায়নিক ভিত্তি) উৎপাদন করতে সক্ষম হয়, তাহলে নবতর সীমাহীন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। ইচ্ছেমত সন্তান পাওয়া সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, মানুষের মস্তিষ্কে যে দশ বিলিয়ন কোষ থাকে তার সাথে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত আরও কয়েক বিলিয়ন যোগ করে প্রতিভার ফুলঝুরি ঘটানো যাবে। মৃতদেহ থেকে নেয়া অঙ্গ- প্রত্যেঙ্গের সংযোজন হবে একটি সাধারণ ঘটনা এবং মস্তিষ্কের অবসাদও ধ্বস (lag)-এর কারণ আবিস্কৃত হলে জীবনকে দীর্ঘায়িত করার প্রাচীন মানুষের আকাঙ্খা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে। উন্নত দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কর্ম সময় কমিয়ে আনবে সপ্তাহে ৩০ ঘন্টায়, কর্মবছর হ্রাস পাবে ৯ মাসে।

১৯৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৬৯ মিলিয়ন মটর,৬০ মিলিয়ন টেলিভিশন সেট, ৭.৭ মিলিয়ন নৌকা ও ইয়ট ছিল। একই বছরে আমেরিকানরা শুধু ছুটি কাটানো বাবদ খরচ করে ৩০বিলিয়ন ডলার। সে দেশে ব্যক্তিগত ব্যবহার্যের দুই-তৃতীয়াংশ বিলাসদ্রব্য। এক হিসেব মতে ধনী দেশগুলো (মোট দেশের এক তৃতীয়াংশ) বছরে শুধু কসমেটিকস-এ খরচ করে ১৫ বিলিয়ন ডলার। এ সমস্ত দেশে জীবনযাত্রার মান ১৮০০ সালে যা ছিল তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি উন্নত এখন। আগামী ৬০ বছরে আজ যা আছে তার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি উন্নত হবে। এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি, সে সময়ে কি প্রগতির পরাকাষ্ঠার পাশাপাশি মানব জীবন পাঁচ গুণ বেশী সূখী ও মানবিকতাপূর্ণ হবে ? স্বতঃসিদ্ধরূপেই উত্তর আসবে, না। পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৫ সালে পাঁচ মিলিয়ন অপরাধকর্ম সংগঠিত হয়। সেখানে ভীতিকর অপরাধকর্ম বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে চৌদ্দ গুণ বেশি (অনুপাত ১৭৪:১৩)। একই দেশে প্রতি ১২ সেকেন্ডে একটি অপরাধ, প্রতি ঘন্টায় একটি খুন, ২৫ মিনিটে একটি ধর্ষণ, প্রতি ৫ মিনিটে একটি ডাকাতি এবং প্রতি মিনিটে একটি করে গাড়ি চুরির ঘটনা ঘটে। সেদেশের প্রতি ১০০০০০ জনে খুন হয় ১৯৫১ সালে ৩.১ জন, ১৯৬০ সালে ৫ জন, ১৯৬৭-তে ৯ জন। পশ্চিম জার্মানিতে ১৯৬৬ সালে ২ মিলিয়ন অপরাধ কর্মের খবর পাওয়া যায়। ১৯৭০-এ তা এসে দাঁড়ায় ২,৪১৩,০০০ এ। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, কানাডা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশে ব্যতিক্রমহীনভাবে অপরাধপ্রবণতার উর্ধ্বগামী চিত্র সুস্পষ্ট।[১]

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত অপরাধ বিজ্ঞানীদের সপ্তম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে (১৯৭৩, সেপ্টেম্বর) সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করা হয় যে, বর্তমান সময় অপরাধের বিশ্বজনীন আগ্রাসন দ্বারা আক্রান্ত। মার্কিন অপরাধ বিজ্ঞানীরা হতাশভাবে বলেন : 'আমদের গ্রহ এক 'স্খলনের সমুদ্র' অর্থ্যাৎ কম বেশি সকলেই অপরাধপ্রবণ এবং এখান থেকে মুক্তির কোন পথ দেখা যাচ্ছে না। 'বিশ্ব পরিস্থিতি ৭০'–জাতিসংঘের এই রিপোর্টে বলা হয় যে, একটি শিল্পোন্নত দেশে (নাম বলা হয়নি) কিশোর অপরাধীর সংখ্যা ১ মিলিয়ন (১৯৫৫) দশ বছরে বেড়েছে ২.৪ মিলিয়ন (১৯৬৫)। জাতিসংঘ মহাসচিবের এক রিপোর্টে বলা হয়, "বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও মানব জীবন কখনোই এতটা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেনি। বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধ (ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ), চুরি, প্রতারণা, দুর্ণীতি, ডাকাতি, আধুনিক জীবন ও প্রগতির প্রতিনিধিত্ব করছে।"[১]

রুশ মনস্তাত্ত্বিক হোজকভের গবেষণায় দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মাদকাসক্তি তুমূলভাবে বেড়েছে, বিশেষত উন্নত দেশগুলোতে। ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ এ মাদকদ্রব্যের বিক্রয় দিগুণ বেড়েছে; ১৯৬৫ সালে এসে তা বাড়ে ২.৮ গুণ বেশি, ১৯৭০-এ ৪.৩ গুণ এবং ১৯৭৩ সালে ৫.৫ গুণ। মাদকদ্রব্য সেবনজনিত মৃত্যুর হার বার্লিনে ১০০০০০ জনে ৪৪.৩ জন, ফ্রান্সে ৩৫ জন, অষ্ট্রিয়ায় ৩০ জন। আমরা মাদকাসক্তিকে দারিদ্র ও পশ্চাদ্‌পদতার সাথে সম্পর্কিত ভাবতাম, সেক্ষেত্রে সমাধানের সম্ভাবনাও ছিল । কিন্তু উন্নত দেশে মাদকাসক্তি কেন? প্রাচুর্যের সন্তানেরা কিসের থেকে পালায়ন করতে চায়? ইওরোপের অন্যতম ধনী দেশ সুইডেনে প্রতি দশজনে একজন মাতাল (নারী-পুরুষ)। মাদকদ্রব্য সর্বোচ্চ হারে কর আরোপ করেও অবস্থা তথৈবচ। পর্নোগ্রাফীর আগ্রাসনও সুস্পষ্ট। সকল ফরাসি প্রেক্ষাগৃহের অর্ধেক জুড়েই চলে পর্নো ছায়াছবি প্যারিসেই ২৫০টি সিনেমা হল শুধু পর্নো চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে। সেই সাথে যোগ হয়েছে জুয়া। বৃহত্তম জুয়া নগরীগুলো সভ্যতম অঞ্চলে অবস্থিত ঃ দোভিলে, মন্টে কারলো, ম্যাকাও, লাস, ভেগাস । আটলান্টিক সিটির বিশাল নৃত্যশালার একটি ঘরে ৬০০০ জুয়াড়ীর ধারণ ক্ষমতা রয়েছে। পরিসংখ্যান বলে যে, ১৯৬৫ সালে ফরাসিরা জুয়া খেলায় খরচ করে ১১৫ বিলিয়ন ফ্রী, মার্কিনীরা খরচ করে ১৫ বিলিয়ন ডলার।

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে আত্মহত্যা ও মানসিক রোগীর সংখ্যা বাড়ার সম্পর্ক কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? "মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তার জীবনের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য উৎকর্ষের মধ্যেই অতৃপ্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় বেশি"[২]– বলছেন একজন মার্কিন মনস্তাত্ত্বিক। ক্লাসিক সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্ত উন্নততম সমাজের এই চিত্র প্রগতির প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক হাজার জনে চারজন মানসিক ও হাসপাতালের বাসিন্দা, নিউ ইয়র্ক শহরে এই সংখ্যা হাজারে ৫.৫ জন। হলিউডে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানসিক চিকিৎসকের সমাগম। আমেরিকার গণস্বাস্থ্য সার্ভিসের রিপোর্ট অনুযায়ী পাঁচজন মার্কিনীর একজনের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি।

১৯৬৮ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য বছরে যে সমস্ত দেশে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক তাদের তালিকায় প্রথম আটটি দেশ হল

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিম জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরী, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ড। এ সমস্ত দেশে হৃদ্‌রোগ ও ক্যান্সারের পরেই আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর স্থান (১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়স্কদের মধ্যে)। একই সংস্থার'৭০ সালের রিপোর্টে এ ব্যাপারগুলোকে শিল্পায়ন, নগরায়ন ও পারিবারিক ভাঙ্গনের সাথে যুগপৎ হিসেবে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন ও শিক্ষাকেও যুক্ত করা যায়। যুগোস্লাভিয়ার অতি উন্নত অঞ্চল স্লোভেনিয়াতে (যেখানে স্বাক্ষরতার হার ৯৮%) প্রতি ১০,০০০ জনে আত্মহত্যার সংখ্যা ২৫.৮ জন, কিন্তু অনুন্নত কসোভোতে (যেখানে স্বাক্ষরতার হার ৫৬%) মাত্র ৩.৪% (অনুপাত ৭:১) ড. এ্যাস্থনি বেইলের গবেষণা মতে বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা তাদের সমবয়স্ক অন্যদের তুলনায় ছয় গুন বেশি। কেম্ব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের বয়সী অন্যদের তুলনায় দশ গুন বেশি। এটা উদ্বেগজনক কারণ, এখানে অধ্যায়নকারী ছাত্র-ছাত্রীরা ধনাঢ্য পরিবার থেকে আগত, নয়ত সরকারী বৃত্তিধারী।

এটা ধরে নেয়া ভুল যে, উপরোক্ত চিত্রটি শুধু পশ্চিমা সভ্যতাতেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা মাত্রেই এর সংযোগ অনিবার্য। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ইংল্যান্ড বা সুইডেন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, জাপান, সম্পর্কেও তা–ই প্রযোজ্য। তাবে জাপানের ক্ষেত্রে জাপানি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কাঠিন্য ও জাপানি পরিবারের ভূমিকা এ পরিস্থিতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে এসে বলা যেতে পারে যে, সভ্যতা ও স্বাচ্ছন্দ্য মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উনিশ শতকের বিজ্ঞান ও বায়োলজি যে 'বস্তু' দিয়ে মানব সৃষ্ট বলে ধরে নিয়েছিল, মানুষতো তা দিয়ে সৃষ্ট নয়। মানুষ শুধু তার ইন্দ্রিয় সহযোগে বেঁচে থাকে না। "অবাস্তবায়িত আকাঙ্খা বেদনার জন্ম দেয়, বাস্তবায়িত আকাঙ্খা জন্ম দেয় তারল্যের।" বলছেন সোপেনহাওয়ার। প্রাচুর্য ও তার সাথে সংলগ্ন মানসিকতা যে কোন মূল্যবোধক পদ্ধতির প্রতি ভক্তিকে হ্রাস,এমন কি নিশ্চিহ্ন করে দেয়।[১]

সরল সহজ জীবন যাপনের প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতা ধ্বংসের মাধ্যমেও সভ্যতার আগ্রাসী চেহারা বেরিয়ে আসছে। এখানে দ্বন্দ্বটি আসছে মানব জীবনের যান্ত্রিক ও জীবন্ত, কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক নীতির মধ্যে। সভ্যতার আগ্রাসনের কারণেই ব্রাজিলে প্রতি বছর ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে আশি ভাগের বেশি পানি শিল্পবর্জ্য দ্বারা দূষিত। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর কারখানার চিমনি ও মোটর গাড়ি থেকে নির্গত ২৩০ মিলিয়ন টন বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর উপাদান বাতাসে প্রবেশ করে। ফরাসি শক্তিকেন্দ্রগুলো ১৯৬০ সালে ১১৪ হাজার টন সালফার গ্যাস এবং ৮২ মিলিয়ন টন অঙ্গার উৎপাদন করে। অনেক প্রতিরোধক ব্যবস্থা সত্ত্বেও ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যা দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়। জার্মানীর রুর অঞ্চলের প্রতিটি শহরেই প্রতি বছর উৎপাদিত হয় ২৭০০০ টন বর্জ্য। ইংল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডে ফুসফুসে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর সংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে দশ গুন বেড়েছে, যুক্তরাষ্ট্যে বেড়েছে গত কুড়ি বছরে পঞ্চাশ ভাগ। টোকিওর বিশাল ইয়ানাগা ক্রসওয়ে থেকে নেয়া অনুসন্ধান থেকে দেখা যায়, সেখান দিয়ে পার হওয়া ৪৯ জন যাত্রীর মধ্যে ১০ জন যাত্রীর রক্ত চলাচলের গতি স্বাভাবিকের চেয়ে ২ থেকে ৭ গুন বেশি। প্রধান কারণ, যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস। শুধু তাই নয়, মোটর যান আবিস্কৃত হওয়ার পর

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সড়ক দুর্ঘটনায় যত মানুষ মারা গিয়েছে তা এই শতকের সমস্ত যুদ্ধজনিত মৃত্যুর সংখ্যাকেও হার মানায়।

সভ্যতার মধ্যে এমন কোন ধনাত্মক শক্তি নেই যা সভ্যতার সকল আবিলতা ও অসামঞ্জস্য মোকাবেলা করতে পারে। আসলে সভ্যতার অসূখ সভ্যতার ভিতরকার কোন ঔষধ দিয়ে চিকিৎসাযোগ্য নয়, একে সভ্যতার বাইরে থেকে চিকিৎসা করাতে হবে এবং এটা পারে একমাত্র সংস্কৃতি। কারণ সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান কখনো ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না কিংবা সভ্যতা পারে না ক্ল্যাসিকাল কাঠামোতে ফিরে যেতে। The circle is closed.[1]

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদ
সংস্কৃতি ও ইতিহাস

বুদ্ধিবাদী ও বস্তুবাদী-উভয় দলই ইতিহাসের এই ব্যাখ্যায় থিতু হয়ে আছে যে, পৃথিবীর বিকাশ শুরু হয়েছে একেবারে নিম্নতম পর্যায় থেকে এবং গুটিকয় অচলাবস্থা ও ব্যতিক্রম ব্যতীত ইতিহাস অনবরত এগিয়ে চলছে সামনরে দিকে। অন্যকথায় তুলনামূলকভাবে বর্তমান কালটি অতীত কাল থেকে উন্নত এবং ভবিষ্যত থেকে অবনত। এ নিয়মেই ইতিহাস চলছে–তাঁদের মতে।

বস্তুবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক, কারণ তাঁদের নিকট ইতিহাস হল মানুষের বস্তুগত প্রগতি। তাঁদের চিন্তাধারা বস্তু ও সমাজকে ঘিরে, স্বয়ং মানুষকে ঘিরে নয়। ফলত এটা সংস্কৃতির ইতিহাস নয়, বরং সভ্যতার ইতিহাস।

মানুষ ও সংস্কৃতির ইতিহাস শূণ্য থেকে শুরু হতে পারে না, তেমনি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী তা ক্রমঅগ্রগতির ধারাতেও একনিষ্ঠ হতে পারে না। মানুষ ইতিহাসে প্রবেশ করেছে প্রবল নৈতিকতাসহ যা সে তার 'পশুত্বময় পূর্বসূরী'র নিকট থেকে পায়নি। প্রাগৈতিহাসিক কালে পশু ও আদিম মানুষের সহাবস্থানের সময় যে মানবিক গুণাবলী মানুষকে পশু থেকে আলাদা করেছিল বিজ্ঞান তা পর্যবেক্ষণ করেছে এবং স্বীকারও করেছে, কিন্তু কখনোই ব্যাখ্যা করেনি। গোড়াতেই (a priori) ধর্মীয় অনুধাবনাগুলো প্রত্যাখ্যান করার ফলে বিজ্ঞান এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।[১]

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সমাজ জীবনের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন লুইস মরগান তাঁর 'Ancient Society' বইয়ে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এ রকমঃ[২]

১.একটি গোত্রের সকলে মিলে তাদের নেতা পছন্দ করে, আবার সকলে মিলেই তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতাচ্যুত নেতা পুনরায় অপরাপর সদস্য তথা সাধারণ যোদ্ধায় পরিণত হয়।

২.একই গোত্রের মধ্যে দাম্পত্য সর্ম্পক ও যৌন সংসর্গ নিষিদ্ধ করে।

৩.গোত্রের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা এতই প্রবল যে, অনেক ক্ষেত্রে তা আত্মোৎসর্গের পর্যায় অতিক্রম করে।

৪. বন্দীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা হয়।

৫. গোত্রের সকল সদস্যই মুক্ত ও স্বাধীন থাকে।

৬. গোত্রে নতুন সদস্যের অন্তর্ভূক্তি ঘটে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ধর্মীয় রীতিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় নৃত্য ও নাটকের মধ্যে। প্রতিমার অস্তিত্ব নেই।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

২. Morgan তাঁর উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন উত্তর আমেরিকার Iroquois কৌম থেকে যা এ জাতীয় আলোচনার মডেল হিসেবে গৃহীত; উদ্ধৃত, আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক মনোভাব অস্তিত্বশীল থাকে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই চিত্র দেখে এঙ্গেলস পুলকিত হন এবং মন্তব্য করেন, "কী চমৎকার সংবিধান। কী শিশুসূলভ সরলতা। সেনাবাহিনী নেই, পুলিশ, পাদ্রী, রাজা, মন্ত্রী, বিচারক, আইন, জেল, কিছুই নেই–অথচ সব কিছুই সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। নারী-পুরুষ সবাই স্বাধীন; কোন দাসত্ব নেই, এক গোত্রের উপর আরেক গোত্রের আধিপত্য নেই।"[১]

মর্গান বর্ণিত সমাজচিত্রকে শৈল্পিকভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তারই দেশের ঔপন্যাসিক ফেনিমোর কুপার। সন্দেহ নেই, র‍্যালফ ওয়ালডো ইমারসনের মনেও একই প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে যখন তিনি আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে লেখেন, "আমি এদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা দেখেছি এবং যত বেশি হিংস্রতা তাদের মধ্যে, তত বেশি মহত্ত্ব।" টলষ্টয় তাঁর সামাজিক আদর্শের ভিত্তিভূমি খুঁজে পেয়েছেন আদিম রুশ কৃষদের নিষ্কলুষ সরল জীবনধারায়। এখানে এবং সর্বত্রই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধগুলো নীচু স্তরের বস্তুগত ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত থেকেছে।

ইউনেস্কো প্রকাশিত 'General History of Africa'[২] বইয়ে আমরা আদিম আফ্রিকীয় মানুষের সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহোদ্দীপক চিত্র পাই। উদাহরণ স্বরূপ জানা যাচ্ছে যে, প্রাচীন আফ্রিকীয় রাজ্যগুলোতে বিদেশী, সাদা কিংবা কালো, আগন্তুকদের আন্তরিক আতিথ্য দেওয়া হত এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মতই সমস্ত সুযোগ–সুবিধা ভোগ করত তারা। অথচ একই সময়ে প্রাচীন গ্রীস কিংবা রোমে বিদেশী আগন্তুকদেরকে দাস হিসেবে গণ্য করা হত। এগুলো লক্ষ্য করে বিখ্যাত জার্মান জাতিতাত্বিক লিও ফ্রবেনিয়াস বলছেন:

"The Africans are civilized upto their bones, and the idea of their being barbarians is a Europen fiction."[৩]

আমেরিকার ইন্ডিয়ান, আফ্রিকা বা তাহিতির আদিবাসী কিংবা আদিম রুশ কৃষক বা ভারতের ব্রাত্য শ্রেণী–যাদের এই মানবিক মূল্যবোধগুলো জীবন্ত ছিল–এদের উৎপত্তি কোথায়? এবং কেন তারা ইতিহাসের প্রারম্ভে অস্তিত্বশীল থাকলেও ঐতিহাসিক প্রগতির সাথে সাথে সংখ্যালঘুতে পরিণত হল? মর্গান তাঁর সুপরিচিত বইটি শেষ করেন এই কথাগুলো বলে, "রাষ্ট্রে গণতন্ত্র এবং সমাজে সৌভ্রাতৃত্ব, সম্য ও সাধারণ শিক্ষা বয়ে থাকবে অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ব ও বিজ্ঞান এবং সেটা হবে সেই আদিম মানুষের স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের নবতর পুনরাবৃত্তি।"[৪]

অর্থ্যাৎ মর্গানের মতে ভবিষ্যত সভ্য সমাজে স্বাধীনতা, সম্য, ও ভ্রাতৃত্ব আসবে তিনটি ব্যবস্থাপনা দ্বারা ঃ অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞান। কিন্তু মজার ব্যাপার হল

---

১. Engels, *The Origin of The Family, Private Property and the State*, New York, 1928, P. 86. উদ্ধৃত, আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

২. UNESCO কতৃক সম্পাদিত। পরিকল্পিত ৮ খন্ডের ২ খন্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত।

৩. বোঝাই যাচ্ছে, Frobenious এখানে Civilized শব্দটি ব্যবহার করেছেন Cultured এর অর্থেই। উদ্ধৃত, আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

১. আদিম সমাজে সাম্য-স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্ব অভিজ্ঞতা, মন ও বিজ্ঞান থেকে উৎসারিত হয়নি।

২. মর্গানের বইটি লিখিত হওয়ায় (১৮৭৭) পরবর্তী সময়পর্ব পর্যবেক্ষণ করে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি যে, তাঁর ভবিস্যদ্বাণী সত্য হয়েছে।

ইতিহাস তথাকথিত বর্বররা লিখছে না, ইতিহাস লিখছি আমরা। আমরা যত বেশি সভ্য হচ্ছি তাদের প্রতি আমাদের বোধ ততবেশি ঝাপসা হয়ে আসছে। কেউ যখন গণহত্যা চালায় কিংবা কোন সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চায় তখন তাকে আমরা বর্বরতা বলি, অপরদিকে যখন সহমর্মিতা ও মানবিকতার দাবি জানাই তখন বলি, "সভ্য জাতির মত আচরণ কর" অর্থ্যাৎ সকল ভালত্বে অধিকার আমাদের, মন্দত্বে তাদের। অথচ ইতিহাসের ধারা কি সাক্ষ্য দেয়? সুসভ্য স্প্যানিশরা কি নির্মম ও নির্লজ্জভাবে মায়া ও এ্যাজটেক এবং তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেনি? সভ্য ও সাদা চামড়ার বসতি স্থাপনকারীরা কি পরিকল্পনা মাফিক ইন্ডিয়ান উপজাতিদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেনি ? মার্কিন সরকারের অনুদান কি তাদের সংস্কৃতির যৌবনকে ফিরিয়ে দিতে পারবে ? তিন শ' বছর ধরে ইওরো–মার্কিন সভ্যতার ধারকেরা যে দাস ব্যবসা চালিয়ে এসেছে তা কি ইতিহাস থেকে মুছে যাবে কখনো? ঐ সময়ে তের থেকে পনের মিলিয়ন (সঠিক সংখ্যা কোন কালেই জানা যাবে না) মানুষকে ধরা হয়েছিল নিতান্ত পশু শিকারের মতই।

এ প্রেক্ষিতে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের কথা আসে যেখানে পশ্চিমা এবং অনুন্নত, অল্প সভ্য মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু উপায়টি হল ছল-চাতুরি, ভন্ডামি ও অর্থনৈতিক দাসত্ব আরোপ এবং সে সাথে চলছে দুর্বলদের বস্তুগত, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংসের চক্রান্ত।

মধ্যযুগের ব্যাপারে আমাদের সংস্কারও একই প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যাযোগ্য। মধ্যযুগ কি সত্যিই অন্ধকার ও অস্বস্তির যুগ ? সভ্যতার বিচারে হয়ত তাই। ইওরোপীয় বস্তুবাদী দার্শনিক হেলভেটিয়াসের ভাষায় মধ্যযুগে মানুষ পশুতে পরিণত হয়েছিল এবং মানুষের আইন পরিণত হয়েছিল দুর্বোধ্যতার আখড়ায়। কিন্তু বলা বাহুল্য দার্শনিক নিকোলাই বার্দায়েজেভ বা চিত্রকর জী আর্‌প–এর নিকট মধ্যযুগ সেভাবে প্রতিভাত হবে না। সত্যি কথা হল, সচ্ছলতা ও আয়েশের ঘাটতি থাকলেও মধ্যযুগীয় সমাজ সব সময় অন্তর্নিষ্ঠ সারবত্তায় পরিপূর্ণ থেকেছে। সময়টি ছিল আধ্যাত্মিকতা ও মননমন্থনের স্বর্ণযুগ যা ছাড়া পশ্চিমা মানুষের ক্ষমতা ও আকাঙ্খাকে বোঝা যায় না। মধ্যযুগ জন্ম দিয়েছে চমকপ্রদ বিশাল শিল্পকর্ম এবং সুসমন্বয় ঘটিয়েছে একটি মহান ধর্ম (খ্রিষ্ট) ও একটি মহৎ দর্শনের (গ্রীক) মধ্যে। একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সৃষ্টিপ্রকৌশল হিসেবে গথিক রীতির জন্ম এই মধ্যযুগেই। এই যুগ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পরিবর্তে যে অন্যতর উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে তাকে এ এন হোয়াইটহেড বলছেন "qualitative progress."[১]

একদিক থেকে বলতে গেলে, সংস্কৃতি কাল ও ইতিহাসের উর্ধ্বে। সংস্কৃতির উত্থান ও পতন আছে, কিন্তু সাধারণ অর্থে প্রগতি বলতে আমরা যা বুঝি তার সাথে এর কোন আত্মীয়তা নেই। শিল্পে জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নেই, যেমনটি বিজ্ঞানে রয়েছে। প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে

---

১. Whitehead , *The Future of Religion*. উদ্ধৃত, আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

আজ অবধি আমরা শিল্পে প্রকাশ ক্ষমতার কোন বর্ধিত পর্যায় খুঁজে পাইনে, প্রগতির সমান্তরালে। সেই আদিকালের শিল্পের যে অনুভাবনা ও বোধ, আজকের মহৎ শিল্পেরও তাই।

সভ্যতার যেমন প্রস্তর যুগ, ইস্পাত ইত্যাদি আছে, সংস্কৃতির সে ধরনের কোন উর্ধ্বমূখী স্তর নেই। সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে নব্য প্রস্তর যুগ প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে এক ধাপ অগ্রসর, কিন্তু শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে বরং উল্টোটি। সে ব্যাখ্যা শিল্পের মধ্যেই রয়েছে। প্রাচীন প্রস্তর যুগ নব্য প্রস্তর যুগ থেকে কয়েক হাজার বছর পুরনো হলেও সে সময়ের শিল্প পরবর্তী সময়ের শিল্পের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয়, খাঁটি। কবিতা সর্বত্রই গদ্যের পূর্বসূরী, সঙ্গীত মানুষের ভাষা বর্ণনা রীতির পূর্বজ। প্রমাণ রয়েছে যে প্রতিটি ধর্মই শরুতে ছিল খাঁটি ও সরল, শুধু পরবর্তীকালেই এর মধ্যে ব্যবহারিক বিকৃতি এসেছে। এ পর্যায়ে অন্তত এটুকু বলা যায় যে, সংস্কৃতির নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা একটি ধারণাগত বৈপরীত্য; এ ক্ষেত্রে যা সম্ভব তা হল শুধু সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর ধারা লিপিবদ্ধ করা।[১]

জ্যাক রিসলার বলেছেন,"চার পাঁচ হাজার বছরের পুরনো মিশরীয় ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই, সত্যিকারের শৈল্পিক মূল্যমানতা অর্জন করে।"[২] অনেক সমকলীন শিল্পী প্রাচীন মন্দিরগাত্রে খোদাই, কাদা, মার্বেল, সোনা বা আলাবেষ্টারের বিন্যস্ত বিন্যাস থেকে স্বীয় শিল্পকর্মের অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকেন। এই প্রাচীন শিল্পকর্মগুলো কখনো কমনীয় ও সূক্ষ্ম (যেমন, থটমস ২য় ও থটমস ৩য়-এর সময়ে), কখনো কঠিন চেহারার স্মারকচিহ্নরূপে উৎকীর্ণ (যেমন চিওপস–এর সময়ে) এবং কখনো বাস্তবিকতাপূর্ণ ও অল্প প্রতীকী (যেমন আকেনীটেন এর সময়ে)।[৩]

সভ্যতার চোখে আবিষ্কারকালে আমেরিকা প্রাচীন পৃথিবীর চেয়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর পিছিয়ে ছিল, এমন কি এলাকাটি এর লৌহ যুগেও পৌঁছায়নি (এইচ. জি.ওয়েলস জানাচ্ছেন)। কিন্তু সময়ের এই মাপযোগ আমেরিকার শিল্পজগতে আরোপ করা যায় না। বোনামপাক মন্দিরে, যেখানে আমেরিকা মহাদেশের প্রাচীনতম চিত্রকর্ম রক্ষিত আছে, আমরা অসাধারণ সৌন্দর্যময় দেয়ালচিত্র পাই। ১৯৬৬ সালে প্যারিসে প্রদর্শিত মায়া ভাস্কার্যও একই অনুভব জাগ্রত করে।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

২. প্রাগুক্ত

৩. Jacque Risier, *La Civilization Arabe*, উদ্ধৃত, আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৮ম অধ্যায়

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা

১ম পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারণা

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে–এই জীবনটা কতগুলো মৌলিক উপাদানের আপতিক বা দুর্ঘটনামূলক সংমিশ্রণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার মূলে কোন উদ্দেশ্য নেই; তার লক্ষ্য ও পরিণতি বলতেও কিছু নেই। এসব উপাদানের বিশ্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হওয়ারই নাম মৃত্যু। এই মৃত্যুর পর আর কোন জীবন অকল্পনীয়। জীবন একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তাই দুনিয়ায় নেই কোন শাশ্বত মূল্যমান–নেই কোন দায়-দায়িত্ব, কোন প্রতিশোধ বিধান।

এই চিন্তা দর্শনে ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যা কল্যাণকর, তা-ই ভালো। অন্য ব্যক্তি বা জাতির জীবন-শিরা যদি তাতে ছিন্ন-ভিন্নও হয়ে যায়, তবু তা ভালোই। পক্ষান্তরে ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যা-ই ক্ষতিকর, তা-ই মন্দ–তাতে অন্যান্য মানুষের বা জাতিসমূহের যতই কল্যাণ নিহিত থাক না কেন।

এক কথায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বার্থবাদী দর্শনের উপর ভিত্তিশীল। একারণে দুনিয়ায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে কঠিন দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ-বিগ্রহই তার অনিবার্য পরিণতি। পাশ্চাত্য সমাজে ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ই সাধারণ দৃশ্য। সেখানে শাসক ও শাসিত, বিজয়ী, বিজিত, মালিক ও শ্রমিক এবং শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই। বিজিত ও পদানত জাতিসমূহকে সেখানে প্রকৃতি বিজয়ের মূল তত্ত্ব বা রহস্য উন্মোচনে শরীক করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বিরোধী জনমনে দৃঢ়মূল করে দেয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সংস্কৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শন মানবতাবাদী নয়, নয় তা মানুষের জন্য কল্যাণকর। এ দর্শনে আল্লাহ্‌র সেরাসৃষ্টি মানব সন্তানের চেয়ে নিষ্প্রাণ প্রস্তরের মূর্তির মূল্য অনেক বেশি। এ ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করাই যথেষ্ট। একবার পশ্চিমা পত্র-পত্রিকায় নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে একটি শিশু অথবা গ্রীক ভাস্কর্যের একটি দুর্লভ, অদ্বিতীয়, উন্নত মানের নিদর্শনের কোনটিকে বাঁচানোর জন্যে চেষ্টা করা উচিত এই মর্মে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। পাঠক সাধারণের তরফ থেকে এ প্রশ্নের জবাবে একবাক্যে মানব শিশুর পরিবর্তে ভাস্কর্যশিল্পের অতুলনীয় নিদর্শনটিকেই বাঁচাবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টিতে মানুষের চাইতেও অধিক প্রিয়, অধিক মূল্যবান এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটি ভাস্কর্য শিল্প প্রস্তরনির্মিত একটি নিষ্প্রাণ প্রতিমা।

এমনিভাবে নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের যত অনুষ্ঠানই আজ সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নামে মানবসমাজে প্রচলিত রয়েছে, তার সবক'টিতেই যে মনুষ্যত্বের অপমান, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে, তাতে কোন সন্দেহ আছে কি ? বস্তুত মানবতার ধ্বংসই এসবের একমাত্র পরিণতি। আর ইসলামের দৃষ্টিতে যা কিছু মানবতাবিধ্বংসী তথা মানব চরিত্র বিকৃতকারী, তা মানুষের পাশববৃত্তির চরিতার্থতা, চিত্তবিনোদন ও আনন্দ বিধানের যত বড় আয়োজনই হোক না কেন, তা সংস্কৃতি নামে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য নয়। এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠানকে ইসলামী সংস্কৃতি নামে অভিহিত করার মতো ধৃষ্টতাও আর কিছুই হতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো

ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়, বৈশিষ্ট্য ও এর বিভিন্ন ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রতি গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ সংস্কৃতির একটি পূর্ণ কাঠামো আমাদের সামনে ভেসে ওঠে যার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. এ সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মতো। এতে আল্লাহ্‌র মর্যাদা সাধারণ ধর্মীয় মত অনুসারে নিছক একজন উপাস্যের মতো নয়। বরং পার্থিব মত অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ শাসকও। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন এ বিশাল রাজ্যে বাদশা শাহানশাহ ও সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক। রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর প্রতিনিধি। কুর'আন তাঁর আইনগ্রন্থ। যে ব্যক্তি তাঁর বাদশাহীকে স্বীকার করে তাঁর প্রতিনিধির আনুগত্য এবং তাঁর আইন গ্রন্থের অনুসরণ করে, সেই হচ্ছে এ রাজ্যের প্রজা। মুসলিম হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেই বাদশাহ তাঁর প্রতিনিধি ও আইনগ্রন্থের মাধ্যমে যে আইন বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন – তার কার্যকারণ ও যৌক্তিকতা বোধগম্য হোক আর নাই হোক – বিনা বাক্য ব্যয়ে তার স্বীকার করতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এ সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং তাঁর আইন বিধানকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সিদ্ধান্তের উর্ধে স্থান দিতে স্বীকৃত না হবে এবং তাঁর আদেশাবলী মানা বা না মানার অধিকারকে নিজের জন্যে সুরক্ষিত রাখবে, তার জন্যে এ রাজ্যের কোথাও এতটুকু স্থান নেই।[১]

২. এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চুড়ান্ত সাফল্যের (অর্থৎ পরকালীন বিচারে বিশ্ব প্রভুর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়ার) জন্যে প্রস্তুত করা আর তার দৃষ্টিতে এ সাফল্য অর্জনটা বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল অচরণের ওপর নির্ভরশীল। পরন্তু চুড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কেন্ সব কাজ উপকারী, আর কোন্ সব কাজ অপকারী, তা জানা মানুষের সাধ্য নয়, বরং আখেরাতে ফয়সালাকারী অল্লাহ্‌ই তা উত্তমরূপে অবহিত। এ কারণেই এ সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়াদিতে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করার জন্যে মানুষের কাছে দাবী জানায়। অনুরূপভাবে এ সংস্কৃতি হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার মহোত্তম সমন্বয়ক। একে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে 'ধর্ম' নামে আখ্যায়িত করা চলে না। এ হচ্ছে একটি ব্যাপকতর জীবনব্যবস্থা বা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজ-কর্ম, সামাজিক ক্রিয়া-কান্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর ওপরই পরিব্যপ্ত। আর এ সমস্ত বিষয়ে যে পদ্ধতি ও আইন-বিধান মহান আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারই সামষ্টিক নাম হচ্ছে 'দ্বীন ইসলাম' বা 'ইসলামী সংস্কৃতি।"[২]

৩. এ সংস্কৃতি কোন জতীয়, (ভৌগলিক বা ভাষাগত অর্থে) দেশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এটি মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই আহবান জানায়। যে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত, কিতাব ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাকেই সে নিজের চৌহদ্দির মধ্যে গ্রহণ করে। এমনিভাবে এ সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপি এক উদার জাতীয়তা গঠন করে,

---

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হবার মতো অনন্য যোগ্যতা। সমগ্র আদম সন্তানকে একই জাতীয় সূত্রে সম্পৃক্ত করার এবং তাদের সবাইকে একই সংস্কৃতির অনুসারী করে তোলার মতো যোগ্যতারও সে অধিকারী। কিন্তু এ বিশ্বব্যাপী মানবীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা তার আসল লক্ষ্য শুধু নিজ অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই নয়, বরং মানব জাতির রব তার মঙ্গল ও ভালাইর জন্যে যে নির্ভুল জ্ঞান ও কর্মনীতি দান করেছেন, সমগ্র মানুষকে সুফলের অংশীদার করে তোলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কারণেই এ ভ্রাতৃসংঘে শামিল হাবার জন্যে প্রথমত সে ঈমানের শর্ত আরোপ করেছে এবং সেই সাথে যারা আল্লাহ্‌র সর্বোচ্চ ক্ষমতার সামনে মাথানত করতে প্রস্তুত এবং আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর কিতাবের দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা ও আইন-বিধান পলন করতে ইচ্ছুক, কেবল তাদেরকেই এ সংঘের জন্যে মনোনীত করেছে। কারণ এ ধরনের লোকেরাই শুধু (তারা সংখ্যায় যতো অল্পই হোক) এ সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় খাপ খাওয়াতে পারে এবং এদের দ্বারাই একটি নির্ভুল ও সুদৃঢ় জীবনব্যবস্থা কায়েম হতে পারে। এ ব্যবস্থায় অবিশ্বাসী, মুনাফেক বা ক্ষীণ বিশ্বাসী লোকদের স্থান পাওয়া এর শক্তির লক্ষণ নয়, বরং তা দুর্বলতারই লক্ষণ।[১]

৪. সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সাথে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রচন্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী বন্ধন। এর সাহায্যেই সে নিজের অনুসারীদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইনের অনুগত করে তোলে। এর কারণ এই যে, আইন প্রণয়ন ও সীমা নির্ধারণ করার পূর্বে সে আইনের অনুসরণ ও সীমা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করে নেয়। অন্য কথায়, আদেশ দেয়ার পূর্বেই সে আদেশ দ্বারা কার্যকরী হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। এ জন্য সর্বপ্রথমে সে মানুষের আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও কতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। তারপর তাকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, রাসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা আল্লাহ্‌রই বিধান তার আনুগত্য ঠিক আল্লাহ্‌রই আনুগত্য। পরন্তু তার মনের ভেতর সে এক অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে দেয়– সে সর্বদা ও সর্বাবস্থায় তাকে খোদায়ী বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করে, তার বিরুদ্ধাচরণের জন্যে তিরষ্কার করে এবং পরকালীণ শাস্তির ভয় দেখায়। এভাবে যখন প্রতিটি ব্যক্তির মন ও বিবেকের ভেতর এ কার্যকর শক্তিকে বদ্ধমূল করে নিজের অনুসারীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে অইনানুবর্তন, বিধি-নিষেধ পালন ও সদগুণরাজিতে বিভূষিত হওয়ার মতো যেগ্যিতার সৃষ্টি করা হয়, তখনি সে তাদের সামনে নিজস্ব আইন বিধান পেশ করে, তাদের জন্যে কর্মসীমা নির্ধারণ করে, তাদের জন্যে জীবন যাত্রা প্রণালী তৈরী করে এবং নিজস্ব লক্ষ হাসিলের জন্যে তাদের কাছে কঠোরতর ত্যাগ স্বীকারের দাবী জানায়। বস্তুত এটা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা, এর চেয়ে বিচক্ষণ পন্থা আর কিছুই হতে পারে না। এ পন্থায় ইসলামী সংস্কৃতি যে বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করছে, অন্য কোন সংস্কৃতি তা লাভ করতে পারে না।[২]

৫. পার্থিব দৃষ্টিকোন থেকে এ সংস্কৃতি এক নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে এবং এক সৎ ও পবিত্র জনসমাজ (Society) গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা উত্তম চরিত্র সদগুণরাজিতে বিভূষিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ সমাজ গঠণ সম্ভবপর নয়। এ কারণেই এর সভ্যদের ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে করে তারা শুধু অকেজো ও প্রক্ষিপ্ত

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাধারার প্রতিমূর্তি হয়ে না থাকে। তাদের মধ্যে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ মানসিকতা পরিস্ফুট করা প্রয়োজন, যাতে করে অতি স্বাভাবিকভাবে কর্মরাজির অনুশীলন হওয়ার মতো সুদৃঢ় চরিত্র তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত ইসলাম তার সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় এ নিয়মটির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখেছে। লোকদের ট্রেনিং এর জন্যে ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে ঈমান ও প্রত্যয়কে বদ্ধমূল করে দেয়–কারণ তাদের মধ্যে উঁচুমানের মযবুত চরিত্র সৃষ্টি করার এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। এ ঈমানের বলেই সে লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, অত্মানুশীলন, সত্য প্রীতি, আত্মসংজম, সংগঠন, বদান্যতা, উদার দৃষ্টি, আত্মসম্ভ্রম, বিনয়-নম্রতা, উচ্চাভিলাষ, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা, বীর্যবত্তা, আত্মতৃপ্তি, নেতৃ আনুগত্য ও আইনানুবর্তিতা ইত্যাকার উৎকৃষ্ট গুণরাজির সৃষ্টি করে। সেই সাথে তাদের সংঘবদ্ধতার স্বাভাবিক পরিণামে যাতে একটি উৎকৃষ্ট জনসমাজ গড়ে ওঠে, তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে যোগ্য করে তোলে।[১]

৬. এ সংস্কৃতির ঈমান তথা পত্যয়বাদে একদিকে সৎচরিত্র ও গুণরাজির সৃষ্টি করায় তা প্রতিপালন এবং সংরক্ষণের উপযোগী সকল শক্তি বর্তমান রয়েছে। অন্যদিকে পার্থিব উন্নতি ও প্রগতির জন্যে মানুষকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করা এবং তাকে পার্থিব উপায়-উপকরণ উত্তমরূপে ব্যবহার করার ও আল্লাহ্‌র দেয়া শক্তি নিচয়কে সুষমভাবে প্রয়োগ করার জন্যে যোগ্য করে তোলার মতো শক্তিও এর ভেতরেই নিহিত রয়েছে। পরন্তু এ প্রত্যয়বাদই দুনিয়ায় প্রকৃত উন্নতি করার জন্যে প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মনুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মতো প্রচন্ড শক্তি বর্তমান রয়েছে। সেই সাথে এ কর্মশক্তিকে সীমাতিক্রম করতে না দেয়ার শক্তিও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এভাবে যেসব গুণাবলী অন্যান্য ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে পাওয়া যায়, ইসলামী প্রত্যয়বাদে তা সবই একত্রে ও উৎকৃষ্টরূপে বর্তমান রয়েছে। আর যেসব বিকৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ে লক্ষ্য করা যায় সেইসব থেকে এ প্রত্যয়বাদ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।[২]

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনা

এই পর্যায়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মৌল ভাবধারাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এক

ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে মানুষ নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে। এ সীমা ও জীবন-লক্ষ্য শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়; চিরন্তন সত্যের ধারক ও বাহক। অতএব এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে, যা বিশ্বলোকে স্থায়ী মূল্যমানের উৎস, নিজের মাঝে প্রতিফলিত করে নিতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا -

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসাবে আমি ইসলামকেই পছন্দ করলাম।"[১]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল দর্শন হল, এ জীবন কয়েকটি মৌল উপাদানের উদ্দেশ্যহীন সংমিশ্রণের ফলে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর কোন লক্ষ্য নেই, নেই কোন পরিণতি। এসব মৌল উপাদানের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ারই নাম হচ্ছে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কিছুই নেই, আছে শুধু অন্তহীন শূণ্যতা।

দুই

ইসলামী সংস্কৃতি সমাজের ব্যক্তিদের মাঝে এমন শৃংখলা গড়ে তোলে, যাতে করে ব্যক্তি-চরিত্র ও সমাজ-সংস্থায় আল্লাহ্‌র ভারসাম্যপূর্ণ গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটতে পারে।

পক্ষান্তরে পাশ্চ্যাত্য সংস্কৃতিতে জীবন যেহেতু একটা আকস্মিক ঘটনা, একটা accident মাত্র, এজন্যে দুনিয়ায় কোন স্থায়ী মূল্যমান (Permanent Values) নেই, নেই প্রতিফল দানের বা প্রতিফল পাওয়ার কোন ব্যবস্থা।

তিন

ইসলামী সংস্কৃতি ব্যক্তিদের মাঝে এমন যোগ্যতা ও প্রতিভা জাগিয়ে দেয়, যার কারণে প্রকৃতি জয়ের ফলাফল সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে।

---

১. আল-কুর'আন, ০৫: ০৩

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে পাশ্চ্যাত্য সংস্কৃতি-দর্শনে যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির সুবিধা হয়–তা অপর ব্যক্তি বা জাতির জীবন ধ্বংস করেই হোক না কেন–তা-ই ন্যায়, সত্য, ভালো ও কল্যাণকর। আর যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির অসুবিধা বা স্বার্থহানি হয়, তা-ই অন্যায়–তা-ই পাপ।

চার

ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার একত্ব ও মিল্লাতের অভিন্নতার ভিত্তিতে এক ব্যাপকতর ঐক্য ও সম্মিলিত ভাবধারা গড়ে ওঠে। এর ফলে মানব সমাজ থেকে, সবরকমের জোর-জবরদস্তি, স্বেচ্ছারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, জুলুম-শোষণ ও হিংসা-দ্বেষ দূরীভূত হয়ে যায় এবং পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

বিপরীতপক্ষে পাশ্চ্যাত্য সংস্কৃতি যেহেতু ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখবাদী দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে, সেজন্যে এরই ফলে বিশ্বের ব্যক্তি ও জাতিগুলোর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, হিংসাদ্বেষ, রক্তারক্তি ও কোন্দল-কোলাহল অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরই কারণে চারদিকে চরম বিপর্যয় ও অশান্তি বিরাজমান থাকে, শাসক ও শাসিত, বিজয়ী ও বিজিতের বিভিন্ন শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

পাঁচ

ইসলামী সংস্কৃতিবান প্রতিটি ব্যক্তি অন্য মানুষের জন্যে বেঁচে থাকে। এ কারণে শ্রেণী-ভেদ নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবন-জীবিকা ও যাবতীয় প্রয়োজন আপনা থেকেই পূরণ হতে থাকে।

পক্ষান্তরে পাশ্চ্যাত্য সংস্কৃতি বিজিত জাতিগুলোকে প্রকৃতি-জয়ের সব তত্ত্ব, তথ্য ও গোপন রহস্য থেকে সম্পূর্ণ গাফিল বানিয়ে রাখে–বঞ্চিত রাখে সব প্রাকৃতিক কল্যাণ, সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে। এ সংস্কৃতি সব কিছুকে নিজেদের একচেটিয়া ভোগ-দখলে রেখে দেয় এবং বিজয়ী জাতির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের মন-মগজে বদ্ধমূল করে দিতেই সচেষ্ট হয়।

ছয়

ইসলামী সংস্কৃতিতে প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

كل امر ذى بال لم يبدء باسم الله فهو اقطع او ابتر-

"প্রত্যেক ঐ কাজ যা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শুরু করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ ও নিম্নমানের হয়ে থাকে।"[১]

১. অধ্যাপক ড.এ.আর.এম. আলী হায়দার, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে কোন কাজের শুরুতে এমন কিছু উল্লেখের নিয়ম নেই।

সাত

ইসলামী সংস্কৃতিতে পরস্পরের সাক্ষাতে কেউ "আস্ সালামু আলাইকুম" বলে সম্বোধন করলে জবাবে "ওয়ালাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" অথবা "ওয়ালাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু" বলে মুসাফাহার মাধ্যমে কুশল বিনিময় করতে হয়।[১]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :

واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها اوردوها--ان الله كان على كل شيئ حسيبا

"যখন তোমাদের (সালাম বা অন্য কিছু দ্বারা) অভিভাদন জানানে হয়, তখন তোমরা তার চাইতেও উত্তম পন্থায় তার জবাব দাও, কিংবা (কমপক্ষে যতটুকু সে দিয়েছে) ততোটুকুই ফেরত দাও, অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা সব কিছুর (পুংখানুপুংখ) হিসাব রাখেন।"[২]

অপরপক্ষে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বৃদ্ধাংগুল প্রদর্শন করে অথবা 'আদাব' বলা সহ বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে কুশল বিনিময় করা হয়।

আট

ইসলামী সংস্কৃতিতে কেউ যখন জিজ্ঞেস করে "আপনি কেমন আছেন" জবাবে আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে হয়।

ইব্ন উমার (রা.) বলেন:

علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول الحمد لله على كل حال-

"রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে 'আলহামদু লিল্লাহি আ'লা কুল্লি হাল' (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রশংসা) বলতে শিখিয়েছেন।"[৩]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে মহান আল্লাহ্র প্রশংসা সম্বলিত এমন শব্দ ব্যবহারের কোন বালাই নেই।

নয়

---

১. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫ খ্রী.), পৃ. ৩৫

২. *আল কুর'আন*, ০৪: ৮৬

৩. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬৭৫, খন্ড- ০৫, পৃ. ৩০

কোন আনন্দ বা খুশির সংবাদ শুনলে 'আলহামদুলিল্লাহ্' মহান আল্লাহ্র বড়ত্বের কথা শুনলে 'আল্লাহু আকবার' এবং তাঁর মহিমার কথা শুনলে 'সুবহানাল্লাহ্' এবং কারো মৃত্যুর সংবাদ শুনলে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলা ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ বলেন :

الذين اذا اصابتهم مصيبة-قالوا انا لله وانا اليه راجعون

"যখন তাদের (মুমিনদের) ওপর (কোনো) পরীক্ষা এসে হাজির হয় তখন তারা বলে, আমরা তো আল্লাহ্র জন্যেই, আমাদের তো (একদিন) আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে।"[১]

অপরদিকে পশ্চাত্য সংস্কৃতিতে মহান আল্লাহ্র নাম সম্বলিত শব্দ ব্যবহার করে তাঁর বড়ত্ব প্রকাশের কোন সুযোগ থাকলেও সে সংস্কৃতিতে এ সৎ কর্মটির প্রচলন একেবারেই নেই।

দশ

কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোন কাজ করবে বলে সংকল্প বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটি যুক্ত করা ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ্ বলেন :

ولا تقولن لشيئ انى فاعل ذالك غدا -الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربى لاقرب من هذا رشدا

"(হে নবী,) কখনো কোন কাজের ব্যাপারে একথা বলো না, (এ কাজটি) আমি আগামীকাল করবো, (হ্যাঁ) বরং (এভাবে বলো,) আল্লাহ্ তায়ালা যদি চান (তাহলেই আমি আগামীকাল এ কাজটি করতে পারবো) , যদি কখনো (কোনো কিছু) ভুলে যাও তাহলে তোমার মালিককে স্মরণ করো এবং বলো, সম্ভবত আমার মালিক এর (কাহিনীর) চাইতে নিকটতর কোন কল্যাণ দিয়ে আমাকে পথ দেখাবেন।"[২]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে কোন কাজের সংকল্পকালে এমন ধরনের কিছু শব্দ যুক্ত করার কোন বিধানের প্রবর্তন নেই।

এগার

কোন বিপদ কেটে যাবার পর এবং আল্লাহ্র কোন বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করার পর সাজদাহ করে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া অদায় করা ইসলামী সংস্কৃতি।[৩]

---

১. *আল কুর'আন*, ০২: ১৫৬

২. *আল কুর'আন*, ১৮: ২৩,২৪

৩. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

পক্ষান্তরে কোন বিপদ কেটে যাবার পর এবং সৃষ্টিকর্তা কতৃক কোন বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করার পর মহান আল্লাহ্‌র নিকট সাজদায় অবনত হয়ে এমন কিছু করার নিয়ম পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে নেই।

বার

কাউকে বিদ্রুপ না করা, মন্দনামে আখ্যায়িত না করা, আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কারো সম্পর্কে খরাপ ধারণা পোষণ না করা এবং গীবত করা থেকে বিরত থাকা ইসলামী সংস্কৃতি।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন বলেন :

يا ايها الذين امنوا لايسخرقوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن -ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظا لمون

"ওহে মানুষ ! তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের কোন সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে নিয়ে কোনো উপহাস না করে, (কেননা) এমনও তো হতে পারে, (যাদের আজ উপহাস করা হচ্ছে) তারা উপহাসকারীদের চাইতে উত্তম, আবার নারীরাও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে, কারণ, যাদের উপহাস করা হয়, হতে পারে তারা উপহাসকারীদের চাইতে অনেক ভালো। (অরো মনে রাখবে), একজন আরেকজনকে (অযথা) দোষারোপ করবে না, আবার একজন আরেকজনকে খারাপ নাম ধরেও ডাকবে না, (কারণ) ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা একটা বড় ধরনের অপরাধ, যারা এ আচরণ থেকে ফিরে না আসবে তারা হবে (সত্যিকার অর্থে) যালেম।"[১]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করা, কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং মন্দ নামে কাউকে ডাকাতে কোন দোষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

তের

ইসলামী সংস্কৃতিতে ভালো কাজে কাউকে সহযোগিতা করা, কারো প্রয়োজনে সতস্ফুর্ত এগিয়ে আসা এবং বিপদ-আপদে অন্যের সাথে শেয়ার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন :

وتعاونوا على البروالتقوى-ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب

১. *আল কুর'আন*, ৪৯: ১১

"তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে (কখনো) একে অপরের সহযোগিতা করো না, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে ভয় করো, কেননা আল্লাহ্ তায়ালা পাপের দন্ডদানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর।"[১]

অথচ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে কারো বিপদে এগিয়ে আসা এবং অন্যের সমস্যা সমাধান কল্পে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে কোন ধরনের উৎসাহ প্রদান করা হয়নি।

চৌদ্দ

বনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ না করা অথবা প্রবেশের অনুমতি পেলেও 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে অন্যের গৃহে বা স্বীয় গৃহে প্রবেশ করা ইসলামী সংস্কৃতি।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

يااايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غيربيوتكم حتى تستئنسوا وتسلموا على اهلها-ذالكم خيرلكم لعلكم تذكرون

"হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে–সে ঘরের লোকদে অনুমতি না নিয়ে ও তার বাসিন্দাদের প্রতি সালাম না করে কখনো প্রবেশ করো না, (নৈতিকতা ও শালীনতার দিক থেকে) এটা তোমাদের জন্যে উত্তম (পন্থা, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের এসব বলে দিচ্ছেন), যাতে করে তোমরা কথাগুলো মনে রাখতে পারো।"[২]

عن بسربن سعيد قال: سمعت ابا سعيد الخدرى يقول: كنت جالسا بالمدينة فى مجلس الانصار- فاتانا ابوموسى فزعا او مذعورا قلنا: ما شئنك قال: ان عمرارسل الى ان اتيه فاتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد على فرجعت فقال ما منعك ان اتينا فقلت: انى اتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم تردوا على فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استئذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر: اقم عليه البينة والا او جعتك فقال ابى بن كعب: لايقوم معه الا اصغرالقوم قال ابو سعيد: قلت: انا اصغر القوم قال: فاذهب به

বুস্‌র ইব্‌ন সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি মদীনায় আনসারদের মজলিশে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে আবু মূসা আশ'আরী (রা.) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের নিকট দৌড়িয়ে আসলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি হয়েছে ? তিনি বললেন আমাকে 'উমার (রা.) ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তার দরজায় গিয়ে তিনবার সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি কোন জবাব দেননি। তাই আমি ফিরে আসলাম। তিনি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার কাছে আসলেন না কেন ? আমি বললাম, আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম এবং আপনার দরজায় তিনবার সালাম দিয়েছিলাম।

---

১. *আল কুর'আন*, ০৫: ০২

২. *আল কুর'আন*, ২৪: ২৭

কিন্তু আপনি কোন জবাব দেননি। শেষে আমি ফিরে আসলাম। কেননা রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "যখন তোমাদের কেউ পরপর তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর যদি তাকে অনুমতি না দেয়া হয়, তাহলে সে ফিরে যাবে। উমার (রা.) বলেন, আপনার দাবীর সমর্থনে প্রমাণ পেশ করুন। অন্যথায় আমি আপনার কৈফিয়াত তলব করব। উবাই ইব্ন কা'ব বলেন, আবু মূসার দলের সবচেয়ে ছোট ব্যক্তি তার পক্ষে সাক্ষী দেবে। উবাই (রা.) বলেন, আচ্ছা তুমিই তার সাথে যাও।[১]

عن يزيد بن خصيفة بهذا الاسناد وزاد ابن ابى عمر فى حديثه: قال ابو سعيد: فقمت معه فذهبت الى عمر فشهدت-

ইয়াযীদ ইব্ন খুসাইফা থেকে উল্লিখিত সনদ সূত্রে (অনুরূপ) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন আবী উমার তার বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেছেন, "আবু সাঈদ (রা.) বলেন, আমি মূসার সাথে দাঁড়ালাম এবং উমার (রা.) এর কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দিলাম।"[২]

পক্ষান্তরে অনুমতি নিয়ে অন্যের গৃহে প্রবেশের সুযোগ পেলেও 'অস্সালামু আলাইকুম' বলে প্রবেশ করার কোন রীতি-নীতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে নেই।

পনের

'বিসমিল্লাহ' বলে খাদ্য গ্রহণ করা কিংবা পানীয় পান শুরু করা, ডান হাতে খাওয়া, ডান হাতে গ্লাস ধরা, পাত্রের নিজের দিক থেকে খাবার খেতে থাকা, বরতনে তুলে নেয়া খাবার পুরোপুরি খেয়ে নেয়া, বরতনে লেগে থাকা ঝোল আংগুল দিয়ে ভালোভাবে চেটে খাওয়া এবং খাওয়া শেষে 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত আ'মানা ওয়া সাকানা ওয়াজাআ'লানা মিনাল মুসলিমীন' বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

عن عمربن ابى سلمة يقول كنت غلاما فى حجررسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدى تطيش فى الصحفة فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فمازالت تلك طعمتى بعد -

'উমার ইব্ন আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি বালক হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার পাত্রে আমার হাত এক জায়গায় স্থির থাকত না। তাই রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে বললেন : "হে বলক ! আল্লাহ্র নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) ডান

১. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৪৬৩, খন্ড- ০৭, পৃ. ২২৩

২. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৪৬৪, খন্ড- ০৭, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

হাত দিয়ে নিজের সামনে থেকে খাও। সুতরাং তখন থেকে আমি ঐ নীতি অনুসারে খেয়ে থাকি।"[১]

রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন :

ادن منى فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك -

"আমার কাছে এসো, আল্লাহ্‌র নাম লও, ডান হাতে খাও এবং নিকটস্থ খানা খাও।"[২]

عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذى اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين -

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) আহার শেষ করে বলতেন : "সেই আল্লাহ্‌র জন্য সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত করলেন।"[৩]

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا اكل احدكم فليلعق اصابعه فانه لا يدرى فى ايتهن البركة -

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "তোমাদের যে কোন ব্যক্তি আহারশেষে যেন তার আঙ্গুল চাটে। কেননা তার জানা নেই যে, আহারের কোন অংশে বরকত নিহিত রয়েছে।"[৪]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে খাদ্য গ্রহণকালে 'বিসমিল্লাহ' না বলা, ডান হাতে খাবার গ্রহণ না করা এবং ডান হাতের পরিবর্তে বাম হাতে গ্লাস ধরে পানি পান করার প্রচলন রয়েছে।

ষোল

ইসলামী সংস্কৃতিতে অশালীন পোষাক পরিধান করা, জিনা-ব্যাভচার করা, মদ, জুয়া ইত্যাদিকে হারাম তথা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

يبنى ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا-ولباس التقوى ذالك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون

"হে আদম সন্তানরা, আমি তোমাদের ওপর পোষাক (সংক্রান্ত বিধান) পাঠিয়েছি, যাতে করে (এর দ্বারা) তোমরা তোমাদের গোপন স্থানসমূহ ঢেকে রাখতে পারো এবং (নিজেদের) সৌন্দর্যও

---

১. *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৯৭৫, খন্ড- ০৫, পৃ. ১৭৩

২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৭৭৭, খন্ড- ০৫, পৃ. ২৩৪; *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮০৫, খন্ড- ০৩, পৃ. ৩৪০

৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৮৫০, খন্ড-০৫, পৃ. ২৬৫

৪. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৪৮, খন্ড- ০৩, পৃ. ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

ফুটিয়ে তুলতে পারো, (তবে আসল) পোষাক হচ্ছে (কিন্তু) তাকওয়ার পোষাক, আর এটাই হচ্ছে উত্তম (পোষাক) এবং এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহেরও একটি (অংশ, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে), যাতে করে মানুষরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"[১]

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة -وساء سبيلا

"তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না, নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।"[২]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন :

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون -

"হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো (তোমরা জেনে রেখো), মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ, আতএব তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করো।"[৩]

অপরদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অশালীন পোষাক পরিধান, অশ্লীলতা, জিনা-ব্যভিচার, সমকামিতা, লওয়াতাত যা ইসলামী সংস্কৃতিতে চরমভাবে ঘৃনিত অথচ পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে এ দুটি কর্ম চমৎকারভাবে সমাদৃত এবং মদ, জুয়া, লটারী ইত্যাদি বৈধ বলে তথায় এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। বিশেষ করে যে লাওয়াতাত ইসলামী সংস্কৃতিতে চরমভাবে ঘৃনিত, অথচ তা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে মারাত্মকভাবে সমাদৃত। পবিত্র কুর'আনে এ কাজটিকে অত্যন্ত ঘৃনা কারা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين -

"আর (আমি) লূতকে (তাঁর লোকদের কাছে) পাঠিয়েছিলাম, যখন সে তার জাতিকে বললো, তোমরা এমন এক অশ্লীল কাজ করে ফেলেছো, যা ইতিপূর্বে সৃষ্টিকুলের কোন মানুষ করেনি।"[৪]

সতের

কোন সম্মানিত মেহমানকে বিদায় জানানোর সময় "অসতাওদিউল্লাহা দ্বীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতীমা আ'মালিকা"[৫] বলা এবং "মাআ'স্‌সালামাহ্" এর মাধ্যমে শেষ বাক্য উচ্চারণ করা ইসলামী সংস্কৃতি।

---

১. *আল কুর'আন*, ০৭: ২৬

২. *আল কুর'আন*, ১৭: ৩২

৩. *আল কুর'আন*, ০৫: ৯০

৪. *আল কুর'আন*, ২৯; ২৮

৫. সাইদ বিন আলী বিন ওহাব আল কাহতানী, *হিসনুল মুসলিম*, অনুবাদ: মুহাম্মদ এনামুল হক (সৌদী আরব: দাওয়াত, পথনির্দেশ, ওয়াকফ ও ধর্ম-বিষয়ক মনত্রণালয়, ১৪২৪ হিঃ), পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অতিথিকে বিদায় দান কালে এমন ধরনের দোয়া পড়ার বিধান কখনোই পরিলক্ষিত হয় না।

অঠার

কোথাও ভ্রমনের উদ্দেশ্যে যে কোন যান-বাহনে আরোহন করার সময় "বিসমিল্লাহ্"[১] বলা, বাহনে বসে "আলহামদুলিল্লাহ"[২] বলা এবং "সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন"[৩] বলা আর চলার পথে উঁচুস্থানে ওঠারকালে "আল্লাহু আকবার"[৪] এবং নীচের দিকে নামার সময় "সুবহানাল্লাহ্"[৫] বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

পক্ষান্তরে সফরে কোন যান-বাহনে আরোহনের সময় কিংবা পথ চলায় উঁচুতে ওঠার এবং নীচের দিকে নামার সময় নির্ধারিত এমন ধরনের কোন দোয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে স্থান পায়নি।

ঊনিশ

ঢোল বাজিয়ে নয়, বিউগল ফুঁকে নয়, ঘন্টা বাজিয়ে নয় কিংবা অন্য কোন পন্থা অবলম্বন না করে "আল্লাহু আকবার", "আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্", আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্" প্রভৃতি বাক্য উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে বুলন্দ ও দরাজ কণ্ঠে উচ্চারণ করে লোকদেরকে সালাতের জন্য ডাকা ইসলামী সংস্কৃতি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

عن عبدالله بن عمر انه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادى بها احد فتكلموا يوما فى ذالك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال قم فناد بالصلاة-

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিমরা মদীনায় আসার পর একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত পড়ে নিত। এজন্য কেউ আযান দিত না। একদিন তারা ব্যাপারটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। তাদের একজন বলল, নাসারাদের নাকূসের অনুরূপ একটা নাকূস ব্যবহার কর। তাদের অপরজন বলল, ইয়াহুদীদের শিংগার অনুরূপ একটি সিংগা ব্যবহার কর। 'উমার (রা.) বললেন, তোমরা সালাতের জন্য আহবান করতে একটি লোক পাঠাওনা কেন ? রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : "হে বেলাল ! উঠো এবং সালাতের জন্য ডাক।"[৬]

---

১. সাইদ বিন আলী বিন ওহাব আল কাহতানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৫. প্রাগুক্ত

৬. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭৩৬, খন্ড- ০২, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করে আযান দেয়া তো দূরের কথা বরং সেখানে সালাতেরই কোন স্থান নেই।

বিশ

সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে "বিসমিল্লাহ" বলে শুরু করে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে, কুলি করে, নাক সাফ করে, মুখমন্ডল ধুয়ে, দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধুয়ে, মাথা মাসেহ করে এবং দুই পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে অযু সম্পন্ন করা ইসলামী সংস্কৃতি।

মহান আল্লাহ্ বলেন :

يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الى الكعبين -

"হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যখন সালাতের জন্যে দাঁড়াবে, তখন তোমরা তোমাদের (পুরো) মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত দুটো ধুয়ে নেবে, অতপর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা দুটো গোড়ালী পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।"[১]

অপরপক্ষে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে যেখানে সালাতেরই কোন স্থান নেই, সেখানে শরীরের বিভিন্ন অংগ-প্রতঙ্গ ধৌত করে অযু করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

একুশ

ভালোভাবে অযু করে পাক-সাফ পোষাক পরিধান করে, মাসজিদে গিয়ে, মহান আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিতির অনুভূতি মনে জাগ্রত রেখে, গভীর মনোযোগের সাথে, ধীরে সুস্থে সালাত আদায় করা ইসলামী সংস্কৃতি। মহান আল্লাহ্ বলেন :

واقيموا الصلواة واتوا الزكواة واركعوا مع الراكعين -

"তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো, যারা আমার সামনে অবনত হয় তাদের সাথে মিলে তোমরাও আমার আনুগত্য স্বীকার করো।"[২]
মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

واستعينوا بالصبر والصلواة -وانها لكبيرة الا على الخاشعين

"(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) তোমরা সবর এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাও; (যাবতীয় হক আদায় করে) সালাত প্রতিষ্ঠা করা (অবশ্যই একটা) কঠিন কাজ, কিন্তু যারা বিনয়ী তাদের জন্যে এটি তেমন একটি কঠিন কাজ নয়।"[১]

---

১. *আল কুর'আন*, ০৫: ০৬

২. *আল-কুর'আন*, ০২: ৪৩

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে মহান আল্লাহ্‌কে ইলাহ তথা উপাসনার যোগ্য মনেই করা হয় না। অতএব সেখানে গভীর মনোযোগ সহকারে সালাত আদায়ের কথা বলা একেবারেই অবান্তর।

বাইশ

মাস্‌জিদে প্রবেশের সময় "আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিক"[২] ও মাস্‌জিদ থেকে বেরুবার সময় "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিক"[৩] পড়া এবং তথায় প্রবেশকালে প্রথমে ডান পা রাখা ও মস্‌জিদ থেকে বেরুবার সময় প্রথমে বাম পা রাখা ইসলামী সংস্কৃতি। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো,

عن عبدالله بن الحسين عن امه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك واذاخرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلك -

ফাতিমা আল-কুবরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন মাস্‌জিদে প্রবেশ করতেন তখন মুহাম্মাদের (স্বয়ং নিজের) প্রতি দরূদ ও সালাম পড়তেন এবং বলতেন : "প্রভু ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করো এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বারসমূহ উম্মুক্ত করে দাও।" যখন তিনি মাস্‌জিদ থেকে বের হতেন তখনও মুহাম্মাদের (নিজের) প্রতি দরূদ ও সালাম পড়তেন এবং বলতেন : "প্রভু হে ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করো এবং তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও।"[৪]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে সালাত আদায়ের যেহেতু কোন বিধানই নেই। অতএব তারা মাস্‌জিদ নির্মাণ করবে কেন আর মাসজিদ না থাকলে ডান পা দিয়ে সেখানে প্রবেশ এবং বাম পা দিয়ে বের হওয়ার প্রচলন থাকারই কথা না।

তেইশ

রমজান মাসে শেষ রাতে সাহ্‌রী খেয়ে পরদিন সাওম পালনের নিয়ত করে, সুবহে সাদিক থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থেকে, দিনের শেষে সূর্য ডোবার সাথে সাথে খেজুর কিংবা পানি দ্বারা ইফতার করে সাওমের সমাপ্তি ঘটানো ইসলামী সংস্কৃতি। মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون -

---

১. *আল-কুর'আন*, ০২: ৪৫

২. সাইদ বিন আলী বিন ওহাব আল কাহতানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৩. প্রাগুক্ত

৪. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯৬, খন্ড- ০১, পৃ. ২৪৯

"হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করে দেয়া হয়েছে, যেমনি করে ফরজ করে দেয়া হয়েছিলো তেমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা (এর মাধ্যমে) তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"[১]

এ সম্পর্কে তিনি অন্যত্র আরো বলেন :

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر-ثم اتموا الصيام الى الليل

"তোমরা পানাহার অব্যাহত রাখতে পারো যতোক্ষণ পর্যন্ত রাতের অন্ধকার রেখার ভেতর থেকে ভোরের শুভ্র আলোক রেখা তোমাদের জন্যে পরিষ্কার প্রতিভাত না হয়, অত:পর তোমরা রাতের আগমন পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করে নাও।"[২]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشيطان ومردة الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادى مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذالك كل ليلة -

"রমজান মাসের প্রথম রাতেই শয়তান ও দুষ্ট জিন্দের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং একটি দরজাও তখন আর খোলা হয় না, অপরদিকে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং এর একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। (এ মাসে) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেন : "হে কল্যাণ অন্বেষণকারী ! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত ! বিরত হও।" আর এ মাসে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বহু সংখ্যক জাহান্নামীকে মুক্তি দেয়া হয় এবং প্রতি রাতেই এরূপ হতে থাকে।"[৩]

তিনি অন্যত্র আরো বলেন :

من صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه -

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় রমজান মাসের রোজা রাখলো এবং (ইবাদাতের জন্য) রাত জাগরণ করলো, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদ্রের (ইবাদাতের জন্য) রাত জাগরণ করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।"[৪]

---

১. *আল-কুর'আন*, ০২: ১৮৩

২. *আল-কুর'আন*, ০২: ১৮৭

৩. জামে আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬৩৪, খন্ড- ০২, পৃ. ৪১

৪. জামে আত-তিরমিযী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬৩৫, খন্ড- ০২, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে নির্ধারিত সময়ে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঐকান্তিকতার সাথে যথাযথ ভাবে পবিত্র রমজানুল মুবারকে সিয়াম সাধনার কোন বিধি-বিধানের প্রচলন ঘটানো হয়নি।

চব্বিশ

বিস্তৃত এলাকার লোকেরা বড়ো কোন ময়দানে সমবেত হয়ে পহেলা শাওয়াল ঈদুল ফিত্‌র এর সালাত, দশই যিলহজ ঈদুল আযহার সালাত আদায় করা এবং মনোযোগ সহকারে ইমামের খুতবা শ্রবণ করা ইসলামী সংস্কৃতি। রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণী :

عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار والعواتق وذوات الخدور والحيض فى العيدين فاما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين قالت احداهن يا رسول الله ان لم يكن لها جلباب فلتعرها اختها من جلبا بها -

উম্মে 'আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন কুমারী, তরুণী, প্রাপ্তবয়স্কা, পর্দানশিন এবং ঋতুবর্তী সব মহিলাদের (সালাতের জন্য) বের হওয়ার (ঈদের মাঠে যাওয়ার) নির্দেশ দিতেন। ঋতুবর্তী মহিলারা নামাজের জামা'আত থেকে এক পাশে সরে থাকত, তবে তারা মুসলমানদের দোয়ায় শরীক হতো। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! যদি কোন নারীর কাছে (শরীর ঢাকার মত) চাদর না থাকে ? জবাবে তিনি বললেন : "তার (মুসলিম) বোন তার অতিরিক্ত চাদর তাকে ধার দিবে।"[১]

অপরদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ঈদ তথা আনন্দ উৎসব গুলোতে একাগ্র চিত্তে সালাত আদায়ের পরিবর্তে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎফুল্ল মন নিয়ে নগ্নতার সাথে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতার সয়লাব পরিলক্ষিত হয়।

পঁচিশ

ঈদের দিনে কিংবা বিয়ে উপলক্ষে, অন্যান্য বদ্যযন্ত্র পরিহার কে, শুধুমাত্র দফ (এক মুখ খোলা ঢোলক) বাজিয়ে, ইসলামী আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক শব্দাবলী বিবর্জিত, অশ্লীলতা মুক্ত শব্দ সম্বলিত (নারী ও পুরুষের পৃথক অংগনে) গান গাওয়া ইসলামী সংস্কৃতি।[২]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ঈদ উৎসব ও বিবাহ অনুষ্ঠানে অশালীন পোষাক পরিধান করে বিভিন্ন ধরনের বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়ে অশ্লীল গান সহ নাচ প্রদার্শিত হয়ে থাকে।

ছাব্বিশ

১. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫০৬, খন্ড- ০১, পৃ. ৩৮১

২. এ.কে.এম.নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

বছর পূর্ণ হলেই নগদ টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা, ব্যবসায়ের মূলধন, গরু, ছাগল, ভেড়া, উট ইত্যাদির যাকাত পুংখানুপুংখরূপে হিসাব করে বের করে বাইতুল মালে জমা দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :

واقيموا الصلواة واتوا الزكواة -وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عندالله ان الله بما تعملون بصير

"তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত আদায় করো; (এর মাধ্যমে) যে সব নেকী তোমরা আল্লাহ্র কাছে অগ্রীম পাঠাবে তাঁর কাছে (এর সবই) তোমরা (মাওজূদ) পাবে; তোমরা যা কিছুই করো আল্লাহ তা'আলা এর সব কিছু দেখতে পান।"[১]

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

عن ابى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك -

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন : "তুমি যখন তোমার মালের যাকাত পরিশোধ করলে, তখন অবশ্যই তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করলে।"[২]

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন :

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما وليس فى تسعين ومائة شيئ فاذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم -

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন : আমি ঘোড়া ও গোলামের সদকা (যাকাত) মা'ফ করে দিয়েছি, কিন্তু রূপার প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম (সদকা) যাকাত আদায় কর। তবে একশত নব্বই দিরহামে কোন সদকা (যাকাত) নেই। যখন তা দু'শো দিরহামে পৌঁছবে, তখন তাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে।"[৩]

অপরদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে সবকিছুর ওপরে ব্যক্তি স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়। অতএব সেখানে বছরান্তে সম্পদ পুংখানুপুংখরূপে হিসাব করে যাকাতের টাকা বের করে অভাবিদের মাঝে বিতরণ কল্পনাতীত।

সাতাশ

বিত্তবান মুমিনদের মাক্কার পথে নির্দিষ্ট মিকাতে পৌঁছে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ শুরু করা, মাক্কায় পৌঁছে কা'বার তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাঈ করা, ৮ই যিলহজ

---

১. *আল-কুর'আন* : ০২: ১১০

২. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৭৫, খন্ড- ০২, পৃ. ০২

৩. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৭৭, খন্ড- ০২, পৃ. ০৫

Dhaka University Institutional Repository

মিনাতে অবস্থান করা, ৯ই যিলহজ আরাফার ময়দানে উপস্থিত হয়ে অবস্থান করা এবং সন্ধ্যার পর রওয়ানা হয়ে মুজদালিফায় এসে রাত্রি যাপন করা, ১০ যিলহজ সকালে মিনাতে পৌঁছে তিনটি জামারাতে পাথর মারা, কুরবানী করা, মাথা মুড়িয়ে ফেলা কিংবা মাথার চুল খাট করা, পুনরায় ১১ ও ১২ই যিলহজ মিনাতে অবস্থান করে জামারাগুলোতে পাথর মেরে সর্বশেষ মক্কায় এসে তাওয়াফে যিয়ারার মাধ্যমে হজ্জ কার্য সমাপন করা ইসলামী সংস্কৃতি। মহান আল্লাহ্ বলেন :

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا--ومن كفرفان الله غنى عن العالمين

"আর মানব জাতির ওপর আল্লাহ্র জন্যে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিরই এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ থাকবে, সে যেন এই ঘরের হজ্জ আদায় করে, আর যদি কেউ (এ বিধান) অস্বীকার করে (তার যেনে রাখা উচিৎ), আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলের মোটেই মুখাপেক্ষী নন।"[১]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

عن على بن ابى طالب قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قالوا يا رسول الله افى كل عام فسكت فقالوا يا رسول الله افى كل عام قال لا ولوقلت نعم لوجبت فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تسئلوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم انفسكم

আলী ইব্ন 'আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। যখন এই আয়াত নাযিল হলো : "মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।" তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! প্রতি বছরই কি ? তিনি চুপ রইলেন। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! প্রতি বছরই কি ? এবার তিনি উত্তর দিলেন : "না। আমি যদি বলতাম হাঁ, তবে তোমাদের ওপর তা (প্রতি বছর) ফরজ হয়ে যেত।"[২] অত:পর আল্লাহ্ নাযিল করেন : "হে মু'মিনগণ ! তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা নিজেরাই দু:খত হবে।"[৩]

মিনায় গমন প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন :

عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدى الى عرفة

ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদের নিয়ে মিনায় যুহর, আসর, মাগরীব, এশা ও ফজরের সালাত পড়লেন, অত:পর ভোরে আরাফার দিকে যাত্রা করলেন।[৪]

---

১. *আল-কুর'আন* : ০৩ : ৯৭

২. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭৬১, খন্ড- ০২, পৃ. ১১৯

৩. *আল-কুর'আন, ০৫* : ১০১

৪. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮২৪, খন্ড-০২, পৃ. ১৫৪

মিনায় অবস্থান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله الا نبنى لك بناء يظلك بمنى قال لا منى مناخ من سبق -

'আ'য়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা মিনায় আপনার জন্য কি একটা ডেরা বানিয়ে দিব যা আপনাকে ছায়া দিবে ? তিনি বললেন : "না। যে ব্যক্তি মিনায় যে স্থানে আগে পৌঁছবে সেটাই হবে তার অবস্থানস্থল।"[১]

জামারা সমূহে কংকর নিক্ষেপ সংক্রান্ত হদীস,

عن جابرقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمى يوم النحر ضحى واما بعد ذالك فبعد زوال الشمس -

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স.) কুরবানীর দিন (১০ই যিলহজ্জ) প্রত্যুষে কংকর নিক্ষেপ করেছেন এবং পরবর্তী দিনগুলোতে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর কংকর নিক্ষেপ করেছেন।[২]

মাথা মুন্ডন ও চুল খাট করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস,

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة او مرتين ثم قال والمقصرين -

ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, যে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "আল্লাহ্ তা'আলা মাথা মুন্ডনকারীদের ওপর অনুগ্রহ করুন। এ কথাটি তিনি একবার কি দুইবার বললেন, অত:পর বললেন, চুল ছোট করে কর্তনকারীদের ওপরও।"[৩]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে "ইসলাম পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধান" বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হয় বিধায়, যাবতীয় বিধি-বিধান সহ হজ্জ পালন পরিত্যাজ্য একটি বিষয়েরই নাম মাত্র।

আটাস

ইসলামী শরীয়ার সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে, বলিষ্ঠ যুক্তি উপস্থাপন করে আকর্ষণীয় বাক্য বিন্যাস সহকারে আদর্শিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধ রচনা করা ও পাকাশ করা ইসলামী সংস্কৃতি।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮২৬, খন্ড- ০২, পৃ. ১৫৫

২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮৩৭, খন্ড- ০২, পৃ. ১৬৪

৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮৫৬, খন্ড- ০২, পৃ. ১৭৪

৪. এ.কে.এম.নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ইসলামী আইন-কানূন এর প্রচলন না থাকায় বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে আকর্ষণীয় বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে আদর্শিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধ রচনা করা ও প্রকাশ করার বিষয়টি তাদের সংস্কৃতিতে চন্তাও করা যায় না।

ঊনত্রিশ

পরিবার সদস্যদের সংকুলান হওয়ার মতো প্রসশস্থ, মহিলা ও পুরুষদের প্রাইভেসি নিশ্চিত করার উপযোগী, সুপরিকল্পিত ও স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ নির্মাণ এবং প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন কিছু দিয়ে গৃহ না সাজানো ইসলামী সংস্কৃতি।[১]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ইসলামী বিধি-বিধানকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য ও অমান্য করার কারণে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সহাবস্থান এবং বিভিন্ন প্রাণীর ছবি দিয়ে গৃহ নির্মাণ তাদের নিত্তনৈমিত্তিক আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

ত্রিশ

লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য, শীত কিংবা গরম থেকে শরীরকে বাঁচনোর জন্য, শোভা বর্ধনের জন্য, যথেষ্ঠ ঢিলা, নারী ও পুরুষের পার্থক্য বজায় রেখে, পুরুষের টাখনুর উপরিভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত পোষাক পরিধান করা ইসলামী সংস্কৃতি। মহান আল্লাহ্ বলেন :

يبنى ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التقوى خير ذالك من ءايت الله لعلهم يذكرون

"হে আদম সন্তানরা, আমি তোমাদের ওপর পোষাক (সংক্রান্ত বিধান) পাঠিয়েছি, যাতে করে (এর দ্বারা) তোমরা তোমাদের গোপন স্থানসমূহ ঢেকে রাখতে পারো এবং (নিজেদের) সৌন্দর্যও ফুটিয়ে তুলতে পারো, (তবে আসল) পোষাক হচ্ছে তাকওয়ার পোষাক, আর এটাই হচ্ছে উত্তম (পোষাক) এবং এটা আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহেরর একটি (অংশ, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে), যাতে করে মানুষরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহন করতে পারে।"[২]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অশালীন ও অমার্জিত পোষাক পরিধান করে লজ্জাহীনতার সাথে অবাধে বিচরণ সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত।

একত্রিশ

কনে পক্ষ ও বর পক্ষের মাঝে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর দুইজন পুরুষ সাক্ষীর সম্মুখে কনের বাবা কতৃক কনের সম্মতি গ্রহণ করে ঐ সাক্ষীদেরই উপস্থিতিতে বরের সম্মতি গ্রহন পূর্বক

---

১. প্রাগুক্ত

২. *আল-কুর'আন*, ০৭: ২৬

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয়-স্বজনের সামনে একজন যোগ্য ব্যক্তি কতৃক খুতবা প্রদান করে বিবাহের কাজ সম্পন্ন করা ইসলামী সংস্কৃতি। বিবাহে সাক্ষী প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস,

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتى ينكحن انفسهن بغير بينة

ইব্ন 'আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) বলেন : "যে সব নারী সাক্ষী ব্যতীত নিজেদেরকে বিবাহ দেয় তারা ব্যভিচারিনী, যেনাকারিনী।"[১]

বিবাহের খুতবা সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীস,

عن عبدالله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد فى الصلاة والتشهد فى الحاجة -

আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আমাদেরকে সালাতের তাশাহ্হুদ এবং (বিবাহ ইত্যাদি) প্রয়োজনের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন।[২]

অপরদিরক পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে শুধুমাত্র ছেলে ও মেয়ের সম্মতিতে তথাকথিত বিয়ে অর্থাৎ, ছেলে বলবে "আমি তোমাকে বিয়ে করলাম আর মেয়ে বলবে আমি বিয়ে বসলাম" এই নীতিতে উভয়ে একত্রে বসবাস আরম্ভ করে এবং যে কোন সময় তাদের সম্পর্ক আবার ছিন্নও হয়ে যায়।

বত্রিশ

বিয়ের সময় শোভন পরিমান মোহ্র নির্ধারণ করা, সন্তুষ্টচিত্তে মোহর আদায় করা, স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করা, সুন্দরভাবে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা, তার সহযোগিতার জন্য কাজের লোক রাখা এবং স্ত্রী যাতে সুন্দরভাবে সাংসারিক কর্তব্য পালন করতে পারে সেই জন্য স্বীয় সামর্থ অনুযায়ী তাকে টাকা-পয়সা সরবরাহ করা ইসলামী সংস্কৃতি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন :

واتوا النساء صدقاتهن نحلة-فان طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هنئيئا مريئا

"আর নারীদের তাদেররে মোহরানার অংক একান্ত খুশী মনে তাদের (মালিকানায়) দিয়ে দাও; অত:পর তারা যদি নিজেদের মনের খুশীতে এর কিছু অংশ তোমাদের (ছেড়ে) দেয়, তাহলে আনন্দ চিত্তে তোমরা তা ভোগ করতে পারো।"[৩]

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র আরো বলেন :

وعاشروهن بالمعروف -فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

---

১. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১০৪০, খন্ড- ০২, পৃ. ২৮৪

২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১০৪১, খন্ড- ০২, পৃ. ২৮৫

৩. *আল কুর'আন*, ০৪: ০৪

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো, এমনকি তোমরা যদি তাদেরকে পছন্দ নাও করো, এমনও তো হতে পারে, যা কিছু তোমরা পছন্দ করো না তার মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখে দিয়েছেন।"[১]

দেনমোহর সংক্রান্ত হাদীস,

عن ابى سلمة قالت سالت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ثنتا عشرة اوقية ونش فقلت وما نش قالت نصف اوقية -

আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আ'য়েশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর মোহরানা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'বারো ঊকিয়া ও এক নাস্স।' আমি বললাম, 'নাস্স' কি ? তিনি বললেন, এক ঊকিয়ার অর্ধেক।[২]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে তথাকথিত বিয়েতে মোহর নির্ধরিণের কোন বিধান নেই। বরং স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছেমত টাকা উপার্জন করতে পারে এবং যথেচ্ছা ব্যয়ও করতে পারে । এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোন নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে তারা বাধ্য নয়।

তেত্রিশ

গৃহ থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে মহিলাদের সারা শরীর জিলবাব কিংবা বোরকা দ্বারা ঢেকে নেয়া এবং নাকের ওপর দিয়ে নিকাব জড়িয়ে গাল ও ঠোঁট (যা দারুনভাবে পুরুষকে আকৃষ্ট করে) ঢেকে নেয়া ইসলামী সংস্কৃতি। মহান আল্লাহ্ বলেন :

يايها النبى قل لازواجك وبنتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن--ذالك ادنى ان يعرفن فلايؤذين وكان الله غفورا رحيما

"হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রী, মেয়ে ও সাধারণ মো'মেন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের চাদর (থেকে কিয়দাংশ) নিজেদের ওপর টেনে দেয়, এতে করে তাদের চেনা (অনেকটা) সহজ হবে এবং তাদের কোন রকম উত্তাক্ত করা হবে না, (জেনে রেখো), আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[৩]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষদের অবাধে মেলামেশা আইনগত ভাবেই সিদ্ধ। অতএব সেখানে জিলবাব অথবা বোরকা দিয়ে নারীদের পুরো শরীর ঢেকে রাখার প্রশ্নই ওঠে না।

---

১. *আল কুর'আন*, ০৪: ১৯

২. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১০৫, খন্ড- ০৩, পৃ. ২০৮

৩. *আল কুর'আন*, ৩৩: ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

চৌত্রিশ

মহিলারা মাস্‌জিদে গেলে পেছনের সারিতে দাঁড়ানো, ঈদের ময়দানে পৃথক স্থানে অবস্থান গ্রহণ এবং পথ চলার সময় রাস্তার একপাশ ধরে পথ চলা ইসলামী সংস্কৃতি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন:

قوموا فلنصل بكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه انا واليتيم وراءه والعجوزمن وراءنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف -

"ওঠো তোমাদের সাথে নামায পড়ব। অনাস (রা.) বলেন, নামায পড়ার জন্য আমি কালো একটি পুরানো চটাই নিলাম। এটাকে পরিষ্কার ও নরম করার জন্য আমি পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ (স.) তার ওপর দাঁড়ালেন। আমি এবং ইয়াতীম (ছেলে) ও তার ওপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। বুড়ো নানী আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের নিয়ে এভাবে দুই রাকাত সালাত পড়ার পর চলে গেলেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ (স.) অন্যত্র আরো বলেন :

خيرصفوف النساء اخرها وشرها اولها وخيرصفوف الرجال اولها وشرها اخرها-

"মহিলাদের কাতারগুলোর মধ্যে (সওয়াবের দিক থেকে) উত্তম হলো শেষ কাতার এবং তাদের জন্য মন্দ কাতার (কম সওয়াবের) হলো তাদের প্রথম কাতার। পুরুষদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো প্রথম কাতার এবং তাদের জন্য মন্দ হলো তাদেরে শেষ কাতার।"[২]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে সালাতের প্রচলন না থাকায় মহিলাদের মাস্‌জিদে কিংবা ঈদগাহে যাওয়ার বিধান থাকা অবান্তর। আর নারী-পুরুষদের অবাধ বিচরণ সিদ্ধ থাকায় মহিলাদের রাস্তায় একপাশ ধরে চলাচল করা অত্যাবশ্যক নয়।

পঁয়ত্রিশ

ইসলামী সংস্কৃতিতে মুসলিম সন্তানকে পিতা-মাতা কতৃক সাত বছর বয়সে সালাতের তাকীদ দেয়া এবং দশ বছর বয়সে প্রয়োজনে শাস্তি দিয়ে সালাতে অভ্যস্ত করে তোলার বিধান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

علموا الصبى الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشرة -

"সাত বছর বয়সে বালকদের সালাত শিখাও এবং দশ বছর বয়সে পদার্পণ করলে সালাত পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাকে দৈহিক শাস্তি দাও।"[৩]

---

১. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২২২, খন্ড- ০১, পৃ. ১৯৬

২. *সুনান ইব্‌ন মাযা*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১০০০, খন্ড- ০১, পৃ. ৪৪১

৩. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৮২, খন্ড-০১, পৃ. ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে সালাতের বিধান না থাকায় পিতা-মাতা কতৃক সন্তানদেরকে সালাতের তাকীদ দেয়া এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে সাস্তি দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

ছত্রিশ

কাজের লোককে গালি না দেয়া, মারধোর না করা, নিজে যা খাবে তাকে তাই খাওয়ানো, নিজে যেমন কাপড় পরবে তাকে তেমন কাপড়ই পরানো এবং সাধ্যাতীত কোন কাজ তার ওপর না চাপানো ইসলামী সংস্কৃতি।[১]

অপরদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে কাজের লোক রাখুক আর নাই রাখুক, তবে নিজে যা খাবে এবং পরিধান করবে তাদেরকেও তাই খাওয়ানো এবং পরিধান করানোর বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় না।

সাঁইত্রিশ.

ইসলামী সংস্কৃতিতে পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর মহান আল্লাহ্ কতৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী অনতিবিলম্বে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানদের মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি বন্টন করে দেয়ার বিধান সুসংবদ্ধ।
আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا -

"তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের রেখে যাওয়া ধন-সম্পদে পুরুষদের (যেমন) অংশ রয়েছে, (একইভাবে) নারীদের জন্যেও (সে সম্পদে) অংশ রয়েছে, যা তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছে, (পরিমাণ) অল্প হোক কিংবা বেশী; (উভয়ের জন্যে এর) অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।"[২]

ঔরসজাতক সন্তানের ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কিত হাদীস,

عن جابربن عبدالله قال جاءت امراة سعد بن الربيع بابنتى سعد الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم احد وان عمتهما اخذ جميع ماترك ابوهما وان المراة لا تنكح الا على مالها فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انزلت اية الميراث فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد بن الربيع فقال اعط ابنتى سعد ثلثى ماله واعط امراته الثمن وخذ انت ما بقى -

জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনুর রাবী (রা.)-এর স্ত্রী সা'দের দুই কন্যা সহ নবী (স.) এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) ! এরা দু'জন

---

১. এ.কে.এম.নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪,

২. *আল কুর'আন*, ০৪: ০৭

সা'দ (রা.)-এর কন্যা, যিনি আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছেন। এদের পিতার পরিত্যাক্ত সমস্ত মাল এদের চাচা দখল করে নিয়েছে। মেয়েদের সম্পদ না থাকলে তাদের বিবাহ দেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (স.) চুপ করে রইলেন। শেষে উত্তরাধিকার স্বত্ব সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) সা'দ ইবনুর রাবীর ভাইকে ডেকে এনে বললেন : "সা'দের কন্যাদ্বয়কে তার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দাও, তার স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ দাও অবশিষ্ট যা থাকে তা তুমি নাও।"[১]

অপরদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানদের মাঝে সম্পদের সুষম বন্টন নীতি প্রবর্তন হয়নি।

আটত্রিশ.

মৃত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে না ফেলে, নদীতে ভাসিয়ে না দিয়ে কিংবা পাহাড়ের ওপর ফেলে না রেখে অযু-গোসল দিয়ে, সাদা কাপড়ের কাফন পরিয়ে, সালাতুল জানাযা আদায় করে কবরে নামিয়ে "বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ"[২] বলে কিবলার দিকে কাত করে শুইয়ে দাফন করা ইসলামী সংস্কৃতি। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت فى القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظ مسلم -

ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (স.) যখন লাশ কবরে রাখতেন তখন বলতেন : "আল্লাহ্র নামে এবং রাসূলুল্লাহ (স.) এর তরীকার (দ্বীনের) ওপর রাখা হলো।"[৩]

অপর এক বর্ণনায় বিধৃত হয়েছে,

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت القبر وقال ابو خالد مرة اذا وضع الميت فى لحده قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله -

ইব্ন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। যখন মৃতকে কবরে রাখা হয়; অবু খালিদের বর্ণনায় আছে, যখন মৃতকে তার কবরে রাখা হত তখন নবী (স.) বলতেন : "বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ", অপর বর্ণনায় আছে : "বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ।"[৪]

---

১. *সুনান ইব্ন মাযা*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৭২০,২৭২১, খন্ড- ০৩, পৃ. ২৮৯

২. এ.কে.এম.নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৩. *সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩২১৩, খন্ড- ০৪, পৃ. ৪৫৩

৪. *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৯৮৫, খন্ড- ০২পৃ. ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ব্যক্তির মৃত্যুর পর উল্লেখিত চমৎকার নীতিতে দাফন-কাফনের কাজ সম্পন্ন করার বিষয়টি অনুসরণ করা হয় না। বরং সেখানে মৃত ব্যক্তিকে আগুনে পুড়িয়ে এবং শেষ কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

ঊনচল্লিশ.

কবর পাকা না করা, কবরে বাতি না দেয়া এবং কবরের নিকটে গেলে "আস্সালামু অলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরি ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন"[১] বলা ইসলামী সংস্কৃতি।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে কবর পাকা করে মাজার নির্মাণ করা এবং সেখানে বাতি তথা আলোক সজ্জা করে পূজা, অর্চনা ও অরাধণা করা সে সংস্কৃতির অন্যতম দিক।

চল্লিশ.

কারো দ্বারা কোন অন্যায় অথবা কোন গর্হিত কাজ হয়ে গেলে "অসতাগফিরুল্লাহাল 'আজিমাল্লাযী লা'ইলাহা 'ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউম ও'আতূবু ইলাইহি"[২] পড়ে তাওবা করা, এই অন্যায় কাজের পূনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা এবং এই সংকল্পের ওপর টিকে থাকার জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট তাওফিক চাওয়া ইসলামী সংস্কৃতি। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

والذين اذا فعلوا فاحشة اوظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم -ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

"(ভালো মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা–যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা (এর দ্বারা) নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করে ফেলে (সাথে সাথেই) তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং গুনাহের জন্যে (আল্লাহর) ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কে আছে যে (তাদের) গুনাহ মাফ করে দিতে পারে ? (তদুপরি) এরা জেনে বুঝে নিজেদের গুনাহের ওপর কখনো অটল হয়ে বসে থাকে না।"[৩]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عن ابي بردة قال : سمعت الاغر وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ايها الناس ! توبوا الى الله فانى اتوب الى الله فى اليوم مائة مرة

১. সাইদ বিন আলী বিন ওহাব আল কাহতানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৩. *আল কুর'আন*, ০৩: ১৩৫

আবু বুরদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আগার (রা.) থেকে শুনেছি যিনি নবী কারীম (স.) এর একজন সাহাবী ছিলেন, হযরত ইব্ন 'উমার (রা.) হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন : "হে লোক সকল ! তোমরা মহান আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর। আমি নিজেও দৈনিক আল্লাহ্র নিকট একশ' বার তাওবা করি।"[১]

অপরদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অন্যায়, অশালীন ও গর্হিত কাজ যেগুলোকে ইসলাম হারাম ও অবৈধ মনে করে তার সবটাই সেখানে বৈধ এবং বিভিন্ন ধরনের কু সংস্কার সে সংস্কৃতির অন্যতম হাতিয়ার।

একচল্লিশ.

চলার পথে উঁচুস্থনে উঠার সময় "আল্লাহুআকবার" এবং নীচের দিকে নামার সময় "সুবহানাল্লাহ" বলা ইসলামী সংস্কৃতি। যেমন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের (রা.) বিশ্বনবী (স.) থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন :

كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا -

"আমরা যখন ওপরের দিকে আরোহন করতাম, তখন 'আল্লাহুআকবার' বলতাম এবং যখন নীচের দিকে অবতরণ করতাম তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতাম।"[২]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে চলার পথে ওপরের দিকে ওঠার সময় অথবা নীচের দিকে অবতরণের সময় নির্ধারিত কোন দোয়া পড়ার সিস্টেম চালু নেই।

বিয়াল্লিশ.

সফরের সময় কখনো কোথায়ও যত্রা বিরতির প্রয়োজন দেখা দিলে, যথেষ্ট সময় বিরতি গ্রহণ করার পর তিনবার "আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তা-ম্মাহ মিন্ শাররি মা খালাক" বলা ইসলামী সংস্কৃতি। যেমন রাসূলের (স.) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق -

"আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁর সৃষ্টি বস্তুর সমুদয় অনিষ্ট হতে।"[৩]

---

১. *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬৬৬৭, খন্ড- ০৮, পৃ. ২৩৪

২. সাইদ বিন আলী বিন ওহাব আল কাহতানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ভ্রমনে কিংবা সফরে কোথায়ও কখনো যত্রা বিরতির প্রয়েজন দেখা দিলে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যাত্রা বিরতির পর এমন ধরনের কোন দু'আ পাঠের বিষয়টি আদৌ পরিলক্ষিত হয়নি।

তেতাল্লিশ.

বাহির থেকে এসে বাহন থেকে নেমে স্বীয় গৃহের প্রবেশ পথে পৌঁছে ঘরে অবস্থানরত লোকদেরকে "আস্সালামু 'আলাইকুম" বলে সম্বোধন করে ঘরে প্রবেশ করে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করা ইসলামী সংস্কৃতি। মহান আল্লাহ্ বলেন :

فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة -كذالك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون

"যখনি তোমরা (এসব) ঘরে প্রবেশ করবে তখন একে অপরের প্রতি সালাম করবে, এটা হচ্ছে আল্লাহ্র কাছ থেকে (তাঁরই নির্ধরিত) কল্যাণময় এক পবিত্র অভিবাদন; এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো।"[১]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বাহিরে থেকে এসে বাহন থেকে নেমে নিজ ঘরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে ঘরে অবস্থানরত অধিবাসীদেরকে সালাম-সম্ভাষণের মাধ্যমে কুশল বিনিময়ের বিষয়টি অকল্পনীয় একটি শিষ্টাচার মাত্র।

চুয়াল্লিশ

বিশ্বনবী জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) কতৃক শেখানো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের শেষে এবং দিন-রাতের বিভিন্ন সময়ে পঠিতব্য দু'আগুলো নিয়মিতভাবে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়তে থাকা ইসলামী সংস্কৃতি। যেমন সালাত শেষে যে দু'আগুলো পড়তে হয়, তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে এই–

لا اله الا الله وحده لا شريك له -له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد

"আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ ! তুমি যা প্রদান কর তা বাঁধা দেয়ার কেহই নেই, আর তুমি যা দিবে না তা দেয়ার মত কেহই নেই। তোমার গযব হতে কোন বিত্তশালী বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষ করতে পরে না।"[২]

---

১. *আল কুর'আন*, ২৪: ৬১

২. সাইদ বিন আলী বিন ওহাব আল কাহতানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে যেখানে মহন আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলমীনের উদ্দেশ্যে সালাতের কোন বিধান বা ব্যবস্থা নেই, সেখানে সালাত শেষে দু'আ পড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না । তাছাড়া দিবা-রাতেও কুর'আন সুন্নাহ্ কতৃক নির্ধারিত দু'আ পড়ার ব্যবস্থা সেখানে নেই।

পঁয়তাল্লিশ

প্রতিদিন যথেষ্ট সময় নিয়ে প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে অর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে তারতীলের সাথে তাজবীদ সহকারে মধুর কণ্ঠে আল কুর'আন অধ্যয়ন করা ইসলামী সংস্কৃতি। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : ما اذن الله لشئ ماذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به -

হযরত আবু হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : "মহান আল্লাহ্ নবীর সুললিত কণ্ঠে ও সুউচ্চ স্বরে কুর'আন পড়ার প্রতি যত বেশী মনোযোগী হন আর কোন বিষয় শোনার প্রতি তিনি এর চাইতে বেশী মনোযোগী হন না।"[১]

বিশ্বনবী আরো বলেন :

وعن عبد الله بن عمروبن العاص رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القران : اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فان منزلتك عند اخراية تقرؤها

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনে বলেছেন : "(কিয়ামতের দিন) কুর'আন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, কুর'আন পড় ও জান্নাতের মানযিল সমূহে আরোহণ কর এবং থেমেথেমে ও ধীরেধীরে কুর'আন পড়তে থাক যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। কারণ জান্নাতে তোমার স্থান হবে সেই শেষ আয়াতটি শেষ করা পর্যন্ত যা তুমি পড়ছ।"[২]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে পবিত্র কুর'আনুল কারীমকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ায় দৈনিক যথেষ্ট সময় নিয়ে তাজবীদ সহকারে মধুর কণ্ঠে মহাগ্রন্থ আল কুর'আন অর্থ বুঝে গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করার প্রশ্নই ওঠে না। বরং তাদের সংস্কৃতিতে কুর'আনের বিধি-বিধানকে চৈতান্যতার সাথে মারত্মকভাবে উপেক্ষা করা হয়।

---

১. আল্লামা ইমাম নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, হাদীস নং-১০০৪, অনুবাদ: মাওলানা এ.এম. এম. সিরাজুল ইসলাম (ঢাকা: ইসলামিয়া কুর'আন মহল, ২০০১ খ্রী.), খন্ড- ০৩, পৃ. ৪৭

২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১০০১, খন্ড- ০৩, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ছেচল্লিশ

কোন সভা, সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে বক্তৃতা বা ভাষণ দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তখন তা মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁর রাসূলের প্রতি দরূদ-সালাম পেশের মাধ্যমে আরম্ভ করা এবং পবিত্র কুর'আন-সুন্নাহ্‌র নিরিখে শ্রোতাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।[১]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে কোন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বক্তব্যের শুরুতে অল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (স.)- এর প্রতি দরূদ পাঠ করা এবং কুর'আন ও হাদীসের আলোকে শ্রোতাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায় না।

সাতচল্লিশ

আল্লাহ্‌র সার্বভৌত্ব মেনে নেয়াই যে মানুষের কর্তব্য এবং আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণই যে মানুষের কল্যাণ লাভের একমাত্র পথ, তা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে চিঠি লিখে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون با لمعروف وينهون عن المنكر--واولئك هم المفلحون

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষদের) কল্যাণের দিকে ডাকবে, (সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দেবে, আর (অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সফল।"[২]

অপরদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে মহান আল্লাহ্‌র সর্বভৌমত্বকে স্বীকারই করা হয় না। তাই সেখানে আল্লাহ্‌র সিকট আত্মসমর্পণ করে মানুষকে একমাত্র তাঁরই দিকে আহবান করার বিষয়টি একেবারেই অবান্তর।

আটচল্লিশ

প্রতিবেশীর খুশির ব্যাপার ঘটলে তাঁকে অভিনন্দন জানানো, কোনো ধরনের বিপদের সংবাদ শুনলে তাঁকে সান্তনা দেয়া এবং মাঝে মধ্যে তাঁদেরকে ফলমূল, খাদ্যদ্রব্য, সুগন্ধি দ্রব্য কিংবা অন্য কোনো সামগ্রী উপহার দেয়া ইসলামী সংস্কৃতি।[৩]

---

১. এ.কে.এম.নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

২. *আল কুর'আন*, ০৩: ১০৪

৩. এ.কে.এম. নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে পরকালে সাওয়াবের আশায় ইসলামী শরী'আহ সম্মত পদ্ধতিতে আনন্দ ও বিপদে প্রতিবেশীর পাশে থেকে সহযোগিতা করা এবং মাঝে মধ্যে উপহার উপঢৌকন নিয়ে তাঁদের নিকট যওয়ার বিধান নেই, বরং সেখানে ব্যক্তি স্বার্থই চরিতার্থ হয় বেশি।

ঊনপঞ্চাশ

কোনো পশু যবাই করতে হলে পশুটিকে কিবলামুখী করে শুইয়ে "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলে ধারালো ছুরি দিয়ে যবাই করা ইসলামী সংস্কৃতি। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق-

"(যবাইর সময়) যার ওপর আল্লাহ্ তা'আলার নাম নেয়া হয়নি, সে (জন্তুর গোশ্ত) তোমরা কখনো খাবে না, (কেননা) তা হচ্ছে যঘন্য গুনাহের কাজ।"[১]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে কোনে পশু যবাই করার সময় আল্লাহ্র নাম উল্লেখ না করে যথেচ্ছা যবেহ করা হয় এবং সেখানে পশুকে কিবলামূখী করে শোয়ানো ও গলায় ছুরি চালনার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণের বিধান নেই।

পঞ্চাশ

ঝড়-তুফানের সময় প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলে "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ খইরি মা আরসালতা বিহী ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ শাররি মা অরসালতা বিহী" পড়তে থাকা ইসলামী সংস্কৃতি। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

اللهم انى اسئلك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به -

"হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট উহার (ঝড় ও বাতাসের) কল্যাণটুকু চাই এবং আমি চাচ্ছি উহার ভিতরে নিহিত কল্যাণটুকু, আর সেই কল্যাণ যা উহার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি উহার অনিষ্ট হতে, উহার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হতে এবং যে ক্ষতি উহার সাথে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে।"[২]

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ঝড়-তুফানের সময় প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হতে থাকলে এবং সুনামী বা এধরণের কোনো বিপর্যয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (স.) কতৃক নির্ধারিত দু'আ না পড়ে বরং হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

---

১. *আল কুর'আন*, ০৬: ১২১

২. সাইদ বিন আলী বিন ওহাব আল কাহতানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

সংস্কৃতির মূল্যায়ন

মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মধ্যেই নিহিত আছে মানব জীবনের পরম কল্যাণ। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যখন কামনা-বাসনা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ইত্যাদি নিম্নতর বৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই তার আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি মাবন জীবনের পরম কল্যাণ লাভের পক্ষে সহায়ক। যে ব্যক্তি সংস্কৃতিবান সে তার প্রকৃতি বা স্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য যত্নবান হয়। জ্ঞানের অধিকারী হওয়া বা সুন্দর গুণের অধিকারী হওয়াই সংস্কৃতি নয়; সত্য মহান ও সুন্দরের প্রতি যে ব্যক্তি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ অর্জন করেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে যা কিছু সুন্দর, তার প্রকৃত তাৎপর্য বা মূল্য উপলব্ধি করতে তিনিই সক্ষম। কাজেই পার্থিব জগতের মাপকাঠিতে তিনি যদি দীন ও নিঃস্বও হন, তবু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক মহান সম্পদের, এক অতুল বৈভবের অধিকারী। বস্তুত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর উৎপত্তি ঘটে থাকে। বৃদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কীয় মূল্যগুলোর সমন্বয় থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর উদ্ভব হয়। অবশ্য সমাজ ও সমাজ-আদর্শ ভেদে এই মূল্যেরও যে পাথর্ক্য ঘটে, সংস্কৃতির মূল্যায়নে একথা স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে।

সংস্কৃতির সামাজিক মূল্যায়নে মানুষ ও সমাজের পারস্পারিক সম্পর্ক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে মানুষের তুলনায় সমাজকেই বড় করে দেখেন। কিন্তু এ সত্য কোনক্রমেই ভুলে যাওয়া চলে না যে, মানুষ নিয়েই সমাজ, মানুষকে বাদ দিয়ে সমাজের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। মানুষের প্রকৃতিকে উন্নত করাই সমাজের লক্ষ্য। ম্যাকেঞ্জী (Mackenzie) Culture বলতে এই ব্যষ্টিগত ব্যক্তিত্বের (Individul Personality) অনুশীলনকেই বুঝেছেন। শিক্ষার ব্যাপকতর এবং সংকীর্ণতর দু'ধরনের তাৎপর্য আছে। ব্যাপকতর অর্থে শিক্ষা বলতে যা বুঝায়, তা-ই হল সংস্কৃতি। ম্যাকেঞ্জী বলেন: সংকীর্ণ অর্থে এ হল জন-সমাজের জীবনে দীক্ষা লাভ করা আর ব্যাপকতর অর্থে এ হল মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে উন্নত করা, যার জন্য সমাজ জীবন হল একটি উপায় মাত্র।[১]

বস্তুত সংস্কৃতি এমন একটা কর্মোপযোগী সত্য যা মানুষের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট সাহায্য করে। সংস্কৃতি মানুষকে এক আপেক্ষিক দৈহিক প্রশস্ততা দান করে। তার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগে। ব্যক্তিত্বের একটা সাম্প্রসারণতা–যাতে রয়েছে চাঞ্চল্য ও গতিশীলতা–মানুষকে এমন অবস্থায় সাহায্যে করে, যখন নিছক একটা রক্ত-মাংসের দেহ কোন কাজেই আসে না।

সংস্কৃতি সমাজবদ্ধ মানুষের ফসল। মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা ও কর্মশক্তিকে তা ব্যাপক, গভীর ও প্রশস্ত করে দেয়। তা চিন্তার ক্ষেত্রে এনে দেয় গাম্ভীর্য, শালীনতা ও সুসংবদ্ধতা; দৃষ্টিকে বানিয়ে

---

১. *Outlines of Social Philosophy*, P. 228; উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

দেয় উদার, বিশাল ও সুদূরপ্রসারী। অন্যান্য জীবজন্তু এ গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত। মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতা-ক্ষমতা-প্রতিভার সামাজিক ও সামষ্টিক রূপ এবং পারস্পরিক চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তিই হয় এসব অবস্থার উৎসমূল।

সংস্কৃতি ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সুসংগঠিত সমাজ গড়ে তোলে আর সে সমাজগুলোকে এক অন্তহীন জীবন-ধারাবাহিকতা প্রদান করে। সংগঠন ও সুসংবদ্ধ সমাজ-কর্ম হচ্ছে ক্রমিক ও ধারাবাহিক ঐতিহ্যের ফসল আর তা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। সংস্কৃতি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতেও বহু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে। তা মানুষের প্রতি কেবল দয়াই করে না, সেই সঙ্গে তার উপর অনেক বড় বড় দায়িত্বও চাপিয়ে দেয়। এসব দায়িত্ব পালনের জন্যে ব্যক্তিগত তার নিজের অনেক স্বাধীনতা ও কুরবানী দিতে হয়; সে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দেয় নিজের ভিতর থেকে পাওয়া প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আর তারই ফলে সম্পাদিত হতে পারে সমাগ্রিক কল্যাণ। মানুষকে নিয়ম-শৃংখলা, আইন-কানূন ও ঐতিহ্যের প্রতি অবশ্যই সম্মান দেখাতে হয়; নিজের স্বভাব-চরিত্র ও কথাবার্তা ধরন-ধারণ এক বিশেষ ছাঁচে ঢেলে গড়ে নিতে হয়। তাকে এমন অনেক কাজই আঞ্জাম দিতে হয় যা থেকে সে নিজে নয়–পুরোপুরি অন্যরাই ফায়দা লাভ করে আর তাকে নিজের প্রয়োজনের জন্যে হতে হয় অন্যের দারস্থ।

মানুষের দূরদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষন শক্তি তার মনের মাঝে অনেক প্রকার কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্খা জাগিয়ে দেয়। ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং সাহিত্য ও শিল্পকলা তাকে করে প্রশমিত–পরিতৃপ্ত।সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে মানব আত্মারই পরিতৃপ্তির উপকরণ আর তারই দরুন মানুষ পশুর স্তর থেকে অনেক উর্ধ্বে উঠে এক উন্নত মানের বিশিষ্ট সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করে।

মানবীয় ব্যক্তিত্বের অনেকগুলো দিক। একদিকে সে এক ব্যক্তি, একটা সমাজের অঙ্গ বা অংশ আর সমাজ গড়ে ওঠে মানুষের পারস্পারিক মেলা-মেশা, আদান-প্রদান ও সম্পর্ক-সম্বন্ধের বন্ধনের ফলে। এরূপ একটি পারস্পরিক সহযোগিতা-ভিত্তিক সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের জন্যে দায়ী হয়, অতীতের স্মৃতি তার মনে-মগজে ও হাড়ে মজ্জায় মিশে একাকার হয়ে থাকে। সে স্মৃতির প্রতি তার হৃদয়ে থাকে অটুট মমতা। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ভবিষ্যতকে ভুলে যেতে পারে না। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোই তার মনে আশা-আকাঙ্খার বিচ্ছুরণ ঘটায়। শ্রমের বন্টন ও ভবিষ্যতের অপরিসীম সম্ভাবনা তার সামনে এমন সব সুযোগ এনে দেয়, যার দরুন সে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ,গন্ধ, সুর, ও ধ্বনি থেকে আনন্দ লাভ করতে ও পরিতৃপ্ত হতে পারে।

মোটকথা, মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে কোন সংস্কৃতির ধারণা করা যায় না আর ধর্ম ও সংস্কৃতি দুটিই জীবন-কেন্দ্রিক। জীবন-নিরপেক্ষ সংস্কৃতি অচিন্তনীয় অন্যদিকে সমাজ-জীবনকে জড়িয়ে নিয়েই ঘটে সংস্কৃতির বিকাশ ও রূপান্তর। তাই সামাজিক আদর্শ ভিন্ন হলে সমাজ-সংস্কৃতিও ভিন্ন হতে বাধ্য।

সংস্কৃতির সংজ্ঞাদান যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন তার মৌল উপাদান নির্ধারণ। কেননা কোন জিনিসের মৌল উপাদান নির্ধারণ তার মৌলিক ধারণা ও তাৎপর্যের ওপর নির্ভরশীল। সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

বলতে যদি মানব জীবনের যাবতীয় কাজ বুঝায়, তা হলে শিল্প-কলা, সমাজ-সংস্থা, আদত-অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ এবং ধর্মচর্চা প্রভৃতি সবই তার মৌল উপাদানের মধ্যে শামিল মনে করতে হবে। আর তার অর্থ যদি বিবেক-বুদ্ধি ও মানসিকতার পরিচ্ছন্নতা বিধান এবং তার লালন ও বিকাশদান হয়, তাহলে তার মৌল উপাদান হবে মতাদর্শিক ও চিন্তামূলক। উপরে সংস্কৃতির তাৎপর্য প্রসঙ্গে আমরা এই শেষোক্ত দৃষ্টিকোণকে গুরুত্ব দিয়েছি। একারণে আমাদের মতে সংস্কৃতির মৌল উপাদান হবে মানসিক ও বিবেক-বুদ্ধি সংক্রান্ত। এক কথায় বলা যায়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলোই সংস্কৃতির মৌল উপাদান হতে পারে:

১. মানুষের জীবন ও জগত সম্পর্কিত ধারণা। দুনিয়া কি, মানুষ কি এবং এ দুয়ের মাঝে সম্পর্ক কি ? দুনিয়ার জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে ?
২. মানব জীবনের লক্ষ্য কি, কোন্ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষ চেষ্টা-সাধনা করবে, কি তার কর্তব্য ?
৩. মানুষের জীবন ও চরিত্র কোন্ সব বিশ্বাস ও চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠবে ? মানুষের মানসিকতাকে কোন্ ছাচে ঢেলে গড়তে হবে ? উদ্দেশ্য লাভের জন্যে মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা করবে কোন্ কারণে, কে তাকে উদ্বুদ্ধ করবে এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ?

৪. মানুষকে কোন্ সব গুণ-বৈশিষ্ট্যের ধারক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে ? মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণ-গরিমা কিরূপ হওয়া উচিত ?

৫. মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক কিরূপ হবে ? পারস্পরিক এ সম্পর্ককে বিভিন্ন দিক দিয়ে কিভাবে রক্ষা করতে হবে ?

এ ক'টি মৌল উপাদানের দৃষ্টিতে আমরা এক-একটি সংস্কৃতির ভাল-মন্দ বিচার করতে পারি, বুঝতে পারি তা সুসংবদ্ধ, না অবক্ষয়মান। আর এ ক'টি মৌল উপাদানই হচ্ছে সংস্কৃতির চিন্তাগত ভিত্তি, মৌল নীতি-ভঙ্গি এবং চিন্তার উপকরণ। এ ক'টির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেই সংস্কৃতির কাঠামো গড়ে ওঠে এবং এ ক'টির ভিত্তিতে যে বাস্তব রূপ গড়ে ওঠে, তা-ই হল সভ্যতা বা তামাদ্দুন (Civilization) ।

মানুষের জীবনের দুটি প্রধান। একটি চিন্তা, অপরটি বাস্তব কাজ। চিন্তা হল তার সংস্কৃতি আর তার বাস্তব প্রকাশ হল তার তামাদ্দুন। পরন্তু চিন্তা যেমন ভালোও হতে পারে মন্দও হতে পারে, তেমনি সংস্কৃতিও হতে পারে ভালো এবং মন্দ, বরং আরেকটু স্পষ্টভাবে বলতে পারি, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি যেমন স্থূল হতে পারে, তেমনি হতে পরে গভীরতাপূর্ণ। অনুরূপভাবে সংস্কৃতিও হতে পারে স্থূল ও গভীরতাপূর্ণ। ইতিহাসবিদ ইব্নে খালদুনের ভাষায় বলা যায়, মানুসের প্রকৃতির সাথে মানবীয় সংস্কৃতির সেই সম্পর্ক, যা মানুষের আদত-অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ ও সৃজনশীল গুণপনার রয়েছে মানুষের প্রকৃতির সাথে। এ কারণে সংস্কৃতি যেমন স্বভাবসিদ্ধ হতে পারে, তেমনি হতে পারে কৃত্রিম।[১]

১. Mohsin Mehdi, *Ibn Khaldun's Philosophy*, P.181; উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদ

বিকাশমান দুনিয়ার সংস্কৃতি

এতক্ষণ যা কিছু বলা হল, তা দ্বারা সংস্কৃতি সম্পর্কিত ধারণাকে স্পষ্টতর করে তুলতেই চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্কৃতি যে আমাদের জীবনের জন্যে অপরিহার্য, আমাদের জীবন গঠনে তার ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীরভাবে প্রভাবশালী ও কার্যকর তা এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আশা করি। বস্তুত সংস্কৃতি মৌল ভাবধারার দিক দিয়ে যেন একটি প্রবাহমান নদী। এ নদী যেখানে থেকেই প্রবাহিত হয়, জীবনের অস্তিত্ব, অবয়ব ও চৈতন্যের ওপর তার গভীর স্বাক্ষর রেখে যায়। কিন্তুতা সত্ত্বেও এ সংস্কৃতি-নদীর প্রবাহ সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। তারা হয় তা দেখতেই পায় না কিংবা দেখেও ঠিক অনুভব করতে সক্ষম হয় না। তাকে দেখবার ও অনুভব করার জন্যে চাই অনুভূতিশীল মন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ। কথাটি এভাবেও বলা যায় এবং তা বলা যুক্তিযুক্তই হবে যে, অনুভুতিশীল মন এবং দৃষ্টিসম্পন্ন চোখই সংস্কৃতির প্রয়োজন অনুভব করতে পারে–স্পষ্টত অবলোকন করতে পারে তার ভালো ও মন্দ রূপ। আর নদীর ঘোলা-পানির পরিবর্তে পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ পানি গ্রহণের ন্যায় পংকিল সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে পবিত্র ও নির্মল ভাবসম্পন্ন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারে কেবলমাত্র সচেতন লোকেরাই। যাদের মন চেতনাহীন, মগজ বুদ্ধিহীন ও চোখ আলোশুন্য, সংস্কৃতির প্রবাহমান দরিয়া থেকে তারাও আকণ্ঠ পানি পান করে বটে; কিন্তু সে পানি হয় ঘোলাটে ময়লাযুক্ত, পুঁতিগন্ধময় ও অপরিচ্ছন্ন।

এজন্য সংস্কৃতির শালীন, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র এবং অশালীন ও অপরিচ্ছন্ন তথা পংকিল ও কদর্য–এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার–ঠিক যেমন প্রবাহমান নদী-নালায় এ দু ধরণেরই পানিস্রোত পাশাপাশি প্রবাহিত হতে থাকে চিরন্তনভাবে। যেসব লোক অন্ধ ও অচেতনভাবে স্বীয় সংস্কৃতির চতুঃসীমার মধ্যে থাকে অথচ তার প্রয়োজন ও দাবি-দাওয়ার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে না, সেজন্যে তারা কোন সচেতন ও সজাগ চেষ্টায় নিয়োজিত হয় না–সেজন্যে তাদের ভেতর জেগে ওঠে না কোন আত্মানুভূতি, তারা এই শোষোক্ত পর্যায়ের সংস্কৃতিরই ধারক হয়ে থাকে। কেননা তাদের মতে সংস্কৃতি কখনো ভাল বা মন্দ কিংবা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হতে পারে না–হতে পারেনা তা পবিত্র ও শালীনতাপূর্ণ। আমাদের কর্মনীতি, কার্যপদ্ধতি ও মূল্যমান বরং আমাদের চিন্তা-ভাবনা সবকিছুই আমাদের সংস্কৃতির ফসল। সংস্কৃতিই এসব গড়ে তোলে পরিচ্ছন্ন ও শালীনতাপূর্ণ করে। মানবীয় চেতনায় ও বোধিতে যা কিছু বিশ্লিষ্টতা থাকে স্বাভাবিকভাবে, সাংস্কৃতিক অনুভুতি ও নিজস্ব মূল্যবোধই তাকে উৎকর্ষ দান করে, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রূপে গড়ে তোলে। এটাই মানুষকে অবচেতনার অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর থেকে চেতনার আলোকোজ্জল পরিবেশ তথা বাইরের দুনিয়ায় নিয়ে আসে এবং তাকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। কিন্তু তাই বলে তার মৌল সাংস্কৃতিক চেতনায় কোন ব্যতিক্রম ঘটে না–ঘটে না কোনরূপ পরিবর্তন।

অবশ্য একথা ঠিক যে, সংস্কৃতি মানুষের মানসকি যোগ্যতা প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মাধ্যম। অন্য কথায়, কোন জাতির সংস্কৃতি সে জাতির তাবৎ লোকদের মানসিক যোগ্যতা-প্রতিভারই প্রতিবিম্ব। এজন্যে একদিকে যেমন বলা যায় যে, অসভ্য জাতিগুলোর সংস্কৃতিবোধ ও সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশ নিম্নমানের হয় এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারও বিকাশ ঘটে, তেমনি অপরদিকেও বলা যায় এক-এক ধরনের আকীদা বিশ্বাস ও জীবন-দর্শন বিশিষ্ট জাতির সংস্কৃতি ও তার প্রকাশ হয় এক-এক ধরনের। অর্থাৎ বিভিন্ন রূপ আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন-দর্শন-বিশিষ্ট জাতির সংস্কৃতি ও তার প্রকাশ বিভিন্ন রূপ হতে বাধ্য। কেননা সংস্কৃতির মৌল উৎস জীববোধ, চিন্তা-বিশ্বাস ও মানসিকতা। অতএব জীবন-দর্শনের পার্থক্যের কারণে সাংস্কৃতিক বোধ ও প্রকাশের অনুরূপ পার্থক্য হওয়া অনিবার্য ব্যাপার।

সংস্কৃতির ও পার্থক্যের প্রতিফলন ঘটে লোকদের মননে ও জীবনে এবং মৌল অনুভূতিতে যেমন, তার প্রকাশ মাধ্যমেও তেমন। তাই ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, এক ব্যক্তির এক প্রকারের জীবন-দর্শন থাকাকালে তার মানসিক অবস্থা ও জীবন-চরিত্র ছিল এক ধরনের; কিন্তু পরবর্তীকালে তার সে জীবন-দর্শনে যখন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হল, তখন তার মানসিকতা, জীবনবোধ ও চরিত্রে ও আমূল পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল–তার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশ মাধ্যমও গেল সমূলে বদলে। এ পরিবর্তনের মূলে জীবন-দর্শনের পরিবর্তন ছাড়া আর কোন কারণই পরিদৃষ্ট হয় না। আরব জাতির ইতিহাসই এ পর্যায়ের বড় দৃষ্টান্ত। যে আরব জনগণ ছিল সভ্যতা-ভব্যতা ও শালীনতা-শিষ্টাচার বিমুখ,অনুন্নত সামাজিক সংস্থা ও ব্যবস্থাসম্পন্ন, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রতীক, লুঠতরাজ ও মারামারি-কাটাকাটিতে অভ্যস্ত–যাদের নিকট মানুষের জীবনের মূল্য ছিল অতি তুচ্ছ, মাত্র দশ বছরের মধ্যেই তারা এক নবতর জীবন দর্শনের ধারক লোক-সমষ্টি হিসেবে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠল এবং আঠারো বছরের মধ্যেই সেই আরব জাতির মন-মানস জীবন-চরিত্র মূল্যমান ও জীবনবোধ আমূল পাল্টে গেল এবং সম্পূর্ন নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। পূর্বের অন্ধকার জীবন নবীন আলোকচ্ছটায় ঝলমল করে উঠল, মনের সংকীর্ণতা ও নীচতা-হীনতা ঘুচে গিয়ে পারস্পরিক ঔদার্য, প্রেম-প্রীতি, সহনশীলতা ও মার্জিত রুচিশীলতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটল মনন ও জীবনের সর্বত্র। পূর্বে যা ছিল ন্যায়,এক্ষণে তা চরম অন্যায় এবং পূর্বে যা ছিল অন্যায়, এক্ষণে তা-ই অপরিহার্য কর্তব্য বিবেচিত হতে লাগল।

মানুষের মূল্য ও মর্যাদা হল প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনস্বীকৃত। আশালীনতা ও অশ্লীলতা দূর হয়ে সেখানে স্থান নিল লজ্জাশীলতা ও সুরুচিশীলতা। যে সমাজে মানুষের মর্যাদা ছিল কুকুর-বিড়ালে চাইতেও নিকৃষ্ট, সেখানে তা এমন অভুতপূর্ব উন্নতি লাভ করল যে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তার পর আসমান ও জমিনের সবকিছুর ঊর্ধ্বে নির্ধারিত হল তার স্থান। উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহারা মানুষের সামনে এক মহোত্তম জীবন লক্ষ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অন্ধকার যবনিকার অবসান ঘটল নতুন এক আলোকোজ্জল দিবসের সূর্যোদয়। একই ব্যক্তি ও একই জাতির জীবনে রাত্রির অবসানে দিনের সূর্যোদয়ের এ ঘটনা সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে আমাদের সামনে। জীবন-দর্শনের পরিবর্তনে সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশের পরিবর্তন হওয়ার এ ঘটনা এক শাশ্বত ও চিরন্তন ব্যাপার এবং একে অস্বীকার করার উপায় নেই। পূর্বেই বলেছি, মানবসমাজে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। লক্ষ লক্ষ বছরের দীর্ঘ এক প্রস্তরযুগ অতীত হয়ে গেছে মানব সমাজের উপর দিয়ে। তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার সময়-কালও আমাদের সমগ্র ঐতিহাসিক যুগের তুলনায় অনেক দীর্ঘ। তা সত্তেও লক্ষ লক্ষ বছরে বিস্তীর্ণ এ দীর্ঘ যুগে মানুষ পাথরের অসমান ও অমসৃণ হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। প্রস্তর যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজ ও পশু পালনের

রেওয়াজ শুরু হয়েছে। এতে করে মানুষের খাদ্য সংগ্রহের পন্থা ও অর্থনৈতিক মান বদলে যায়। অতঃপর তাম্র ও লৌহ যুগে এ পরিবর্তনের গতি অধিকতর তীব্র হয়ে ওঠে।[১]

আর বর্তমানের এ পারমাণবিক যুগে মানুষের সমাজ-জীবনে পরিবর্তনের ধারা আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এ পরিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ বদলে গেছে অনেক। কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার মৌল চেতনায় যেমন পরিবর্তন আসেনি–কোন পরিবর্তনই সূচিত হয়নি মানুষের মানসিকতায়, মূল্যমানে, চরিত্র-নীতিতে, তেমনি পরিবর্তন সূচিত হয়নি সংস্কৃতিতে, সাংস্কৃতিক ধারণায় ও জীবনবোধে। যদি বলা হয় যে,সমাজ বিবর্তনের এ অমোঘ ধারায় মানুষের সংস্কৃতিও বদলে গেছে, তাহলে বলতে হবে, সংস্কৃতি যতটা বদলেছে ততটাই তা রয়ে গেছে অপরিবর্তিত–যেমনটি ছিল মানবতার প্রথম সূচনাকালে। বস্তুত সমাজ-বিবর্তন এবং মানুষের বাহ্যিক পরিবর্তনে মৌল মানব-প্রকৃতি আদৌ বদলে যায়নি। স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষ আজো তেমনি মানুষই রয়ে গেছে, যেমন ছিল সে পার্থিব জীবনের প্রথম সূচনায়।

১. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আকাশ ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করে ক্ষান্ত হননি বরং তাদেরকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী এবং রাসূল পাঠিয়েছেন। আল-কুর'আনের ভাষায় :

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت۔

"আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি, যাতে করে (তাদের কাছে বলতে পারে,) তোমরা এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করো এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিরোধি শক্তিসমূহকে বর্জন করো।"(আল কুর'আন, ১৬: ৩৬)

নবী-রাসূলগণ এসে নিজের তৈরী করা কোন নির্দেশ জনতার ওপর চাপিয়ে দেননি বরং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর কতৃক প্রণিত যে আসমানী কিতাব তাঁদেরকে দিয়েছেন সে অনুযায়ীই তাঁরা স্বীয় উম্মত তথা মানুষদেরকে দিক নির্দেশনা দিতেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

لقد ارسلنا رسلنا با لبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط -

"আমি অবশ্যই আমার রাসূলদের কতিপয় সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ (মানুষের কাছে) পাঠিয়েছি এবং আমি তাঁদের সাথে কিতাব পাঠিয়েছি, আরো পাঠিয়েছি (আমার পক্ষ থেকে এক) ন্যায়দন্ড, যাতে করে মানুষ (এর মাধ্যমে) ইনসাফের ওপর কায়েম থাকতে পারে।"(আল কুর'আন, ৫৭: ২৫)

আসমানী কিতাব সহ নবী-রাসূল প্রেরণের এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) যাঁকে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন সঠিক পথের দিক নির্দেশক গ্রন্থ আল-কুর'আনুল কারীম এবং সত্য একটি দ্বীন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন :

هوالذى ارسل رسوله با لهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون -

"তিনি তাঁর রাসূলকে একটি স্পষ্ট পথনির্দেশ ও সঠিক জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি (রাসূল) একে দুনিয়ার (প্রচলিত) সব কয়টি জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন, তা মোশরেকদের কাছে যতোই অপছন্দনীয় হোক না কেন।"(আল কুর'আন, ৬১: ০৯)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (স.) কে যে কিতাব বা গ্রন্থ দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে মানুষের জন্য যা প্রয়োজন তার কোনটাই বাদ দেয়া হয়নি। অর্থাৎ মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল কিছুর বর্ণনা তাতে (আল-কুর'আনুল কারীমে) রয়েছে। অল্লাহ তা'আলা বলেন :

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين -

"আমি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছি, মুসলিমদের জন্যে এ কিতাব হচ্ছে (দ্বীন সম্পর্কিত) সব কিছুর ব্যাখ্যা, (আল্লাহ্‌র) হেদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্যে (জান্নাতের) সুসংবাদ স্বরূপ।"(আল কুর'আন, ১৬: ৮৯)

তাই কুর'আনুল কারীম হচ্ছে সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ আর ইসলাম হচ্ছে সর্বশেষ ঐশী জীবন বিধান। এটি পরিপূর্ণ এমন একটি জীবন বিধান যাতে কোন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন নেই এবং বিয়োজনেরও প্রয়োজন নেই। এটি হচ্ছে Complete code of life. মহান আল্লাহ্‌ বলেন :

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا -

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসেবে আমি ইসলামকেই পছন্দ করলাম।"(আল কুর'আন, ০৫: ০৩)

আল্লাহ্‌র মনোনিত এ জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে এক উন্নত ও অনন্য সংস্কৃতি যা পৃথিবীতে প্রচলিত সংস্কৃতির সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যশীল নয়। এ সংস্কৃতি কুর'আন-হাদীস সম্মত, বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তিনির্ভর। মানব জীবনের উপকারী ও কল্যাণকর সকল কার্যক্রমই এ সংস্কৃতির আওতাভুক্ত। এটি স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে সকল গোষ্ঠির ও জাতির মানুষের জন্যে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও ভূখন্ডের কৃত্রিম ভেদরেখার উর্ধ্বে এ বিশ্বজনীন চেতনা। যা মানুষের অভ্যন্তরীণ বৃত্তিসমূহের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠে। মূলত ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির মূল ভিত্তিই হচ্ছে কুর'আন ও হাদীস। কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক কোন সংস্কৃতিই ইসলমী সংস্কৃতি হতে পারে না। এক কথায় মানবতার কল্যাণকামী নয় অর্থাৎ মানবতাবিরোধী সকল সংস্কৃতিই হচ্ছে অপসংস্কৃতি। আর এ অপসংস্কৃতির সয়লাব বিশ্বব্যাপী। যার বিষক্রিয়ার প্রভাবে বিশ্ব মানবতা চারিত্রিক দিক থেকে অধপতনের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি কোন জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়, বরং এটি এক সার্বজনীন মানবীয় ও উদার সংস্কৃতি যা নির্দিষ্ট কোন ভৌগলিক সীমারেখায় পরিবেষ্টিত নয়। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের মাঝে এমন এক উদার জাতীয়তাবোধের উম্মেষ ঘটায় যার মাধ্যমে বিশ্বের সকলই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও ভাষা নির্বিশেষে এর ছায়াতলে আবদ্ধ হতে সুযোগ পায়।

সাধারণ কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, সংস্কৃতি হচ্ছে সুন্দরের অন্বেষক। জীবন চর্চায় মানুষের জীবিকা, তার আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি এ সবকিছুই সংস্কৃতি হিসেবে পরিগনিত। এ সংস্কৃতির পরিধি ব্যাপক যার কোন সীমারেখা নেই। কিভাবে মানুষের সামগ্রিক কর্মকান্ড পরিচালিত হবে এবং পরিশীলিত ও রুচিসম্মত হবে তা এ সংস্কৃতিতে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণিত হয়নি। তবে ইসলামী সংস্কৃতি এমনটি নয়। ইসলামী সংস্কৃতি বিধিসম্মতভাবে মানুষের জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের পর যে সমস্ত আচার-আচরণ,

Dhaka University Institutional Repository

ক্রীড়াকলা ও রুচিবোধ মানব জীবনকে সুন্দর করে এবং জীবনে নিয়ে আসে অনাবিল সুখ-শান্তি সে সমস্ত আচার-আচরণকেই ইসলামী সংস্কৃতি সমর্থন করে। এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার সুখ-শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। এর সর্বোত্তম প্রতীক হচ্ছেন বিশ্ব মানবতার অগ্রদূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)। যিনি মানবতার কল্যাণে ও উত্তম মানব চরিত্র গঠনের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। বস্তুত নবীজীর অদর্শই হচ্ছে এ সংস্কৃতির বাস্তব প্রতিকৃতি ও প্রতিচ্ছবি।

পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবী হযরত আদম (আ.) এবং হাওয়া (আ.) থেকেই এ সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে। পরবর্তিতে যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর যুগে পূর্ণতা লাভ করেছে। যার বাস্তবতা উপরোল্লিখিত সূরা মায়েদার তিন নং আয়াতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনার পর যে নির্যাস বেরিয়ে এসেছে তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

ইসলাম তথা ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে মানুষকে নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ গুণাবলী অর্জন করার জন্যে আপ্রান প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ মহান আল্লাহ্‌র নিকট বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের চেষ্টা ও সাধনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মানুষ ততোটুকুই পাবে যতোটুকু সে চেষ্টা করবে।"(আল কুর'আন, ৫৩: ৩৯) তাই তাকে অবিরাম চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী হতে হবে। তার মন হবে যেমন পবিত্র অনাবিল, তেমনি চরিত্রও হবে নিষ্কলুষ পুতপবিত্র। সত্য, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, অনুগ্রহ, ক্ষমা, মহানুভবতা, মানবতাবোধ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সাহস, বীরত্ব, বীর্যবত্তা, প্রেম, ভালোবাসা, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি মহান গুণাবলী অর্জন করার জন্যে সে চালিয়ে যাবে অবিরাম প্রচেষ্টা। সে নিজেকে সংস্কার, সংশোধন, মার্জিত ও পরিশুদ্ধ করে নিবে যাবতীয় পাপ, পংকিলতা, অন্যায়, অসততা, দুর্বলতা, ভীরুতা, নিষ্ঠুরতা ও অসৎ গুণাবলী থেকে। এভাবে সে ইসলামী সংস্কৃতিকে বুকে ধারণ করে নিজেকে উন্নত, পরিশীলিত, পরিমার্যিত, উৎকর্ষ ও বিকশিত করার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে আজীবন।

এ সংস্কৃতি এমন এক সংস্কৃতি, এমন এক কালচার, যেখানে শুধু মনের আনন্দই নয়, আত্মার প্রশান্তিও রয়েছে। এখানে হৃদয়মনের প্রশস্ততা কেবল ইহ জাগতিক নয়, পরকাল পরিব্যাপ্ত। এখানে মন সেচ্ছাচারী নয়, সহস্রগামী নয়, মন তার মনিবের অনুগত। এখানে মন শত মনিবের অনুশাসন মানে না, একক স্রষ্টাই কেবল তার মনিব। এখানে মনের স্রষ্টা কেবল স্রষ্টাই নন, তিনি সার্বভৌম হুকুমকর্তা, সকল ক্ষমতার উৎস। তিনি শুধু কঠোর শাস্তিদাতাই নন, তিনি আইনদাতা, বিধানদাতা, দয়াময়, করুণাসিক্ত ও ক্ষমাশীল। অনুগতদের সাহায্যকারী তিনি, পুরষ্কার দানে প্রতিশ্রুত তিনি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বহুগামী নয়, রব্বুল'আলামীনের অনুগামী। শুধু মন নয়, আত্মারও উদ্বোধক। এ কারণে ইসলামী সংস্কৃতির সৌন্দর্য অনুপম। এর মহিমা বললে ফুরায়না। এর সুফলের শেষ নেই। এর বাহকরা সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই কেবল তাদের জীবনের লক্ষ্য। আল কুর'আনে তাদের জীবন লক্ষ্যের ছবি আঁকা হয়েছে এভাবে, "আল্লাহই মু'মিনদের থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাঁদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে।"(আল কুর'আন, ০৯: ১১১)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সংস্কৃতি অন্যান্য সংস্কৃতি তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পূতধর্মীতা, অনাবিলতা, প্রশস্ততা ও নির্মলতা। এক আল্লাহ্‌মূখী হবার কারণে ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের মন ও মননশীলতা সৃষ্টি করে, তা হয়ে থাকে সব রকমের কলুষতা, আবিলতা, পংকিলতা, সংকীর্ণতা, হঠকারিতা, কপটতা, ধোঁকা, প্রতারণা, বকধার্মিকতা, অশ্লীলতা, উলংগতা, নির্লজ্জতা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পাষন্ডতা, হিংস্রতা, অমানবিকতা, যুলুম, নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, অসুন্দর, বেহুদা, বেমানান, বে-তমিজি, বেআদবি, পাপাচার ও নোংরামী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এ সংস্কৃতি মানুষের চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করে, মনকে পবিত্র করে, চরিত্র, আচার-আচরণ ও কথাবার্তাকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত, ভদ্র ও সুন্দর করে। সর্বোপরি দেহ এবং পোষাক পরিচ্ছদকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল করে।

ইসলামী সংস্কৃতি আনন্দ-উল্লাসমুক্ত অসার কোন সংস্কৃতির নাম নয়। বরং ইসলামের গন্ডির মধ্যে অবস্থান করে আনন্দ-উল্লাস ও চিত্তবিনোদনের যথেষ্ট সুযোগ এতে রয়েছে। ইসলাম যেহেতু জলে ও স্থলে যাবতীয় অশ্লীলতাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, তাই সবরকমের অশালীনতা, অশ্লীলতা বর্জন করত: সংস্কৃতিমনা মননশীল, রুচিশীল, দায়িত্বশীল, সভ্য ব্যক্তি গঠনে ইসলামী সংস্কৃতির বিকল্প কোন সংস্কৃতি পৃথিবীতে কল্পনাতীত। আল্লাহ্ বলেন:

قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهرمنها وما بطن والاثم والبغى بغيرالحق وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون-

"(হে মুহাম্মদ !) তুমি (ওদের) বলো, আমার প্রভু অবশ্যই যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লিলতা, পাপ ও অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করাকে হারাম করেছেন, (তিনি আরো হারাম করেছেন) তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে (অন্য কাউকে) এমনভাবে শরীক করবে, যার ব্যাপারে তিনি কখনো সনদ নাযিল করেন নি এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে তোমাদের এমন সব (বাজে) কথা বলা, যার ব্যাপারে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।" (আল কুর'আন, ০৭: ৩৩)

চিত্তবিনোদনের জন্যে এ সংস্কৃতি বৈধ ও রুচিশীল যাবতীয় উপাত্ত ও মাধ্যমকে সাধুবাদ জানায় এবং এর প্রতি মানুষকে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী : *পবিত্র কোরআনুল করীম*, অনুবাদ: মাওলানা মুহি-উদ্দীন খান, মাদীনা মুনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হিঃ

২. হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ : *কুর'আন শরীফ*, লন্ডন: আল-কোরআন একাডেমী, ২০১০

৩. সাইয়েদ কুতুব শহীদ : *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, অনুবাদ: হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ, লন্ডন: আল-কোরআন একাডেমী, ১৯৯৯

৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *তাফহীমুল কুর'আন*, অনুবাদ: আবদুল মান্নান তালিব ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯১

৫. সম্পাদনা পরিষদ : *আল-কুর'আনুল করীম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬

৬. আবদুর রহমান ইব্ন নাসের আস্ সা'দী : *তাফসীরুল কারীমির রহমান*, (আরবী) বয়রূত, লেবানন: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২২ হি. ২০০১

৭. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল বুখারী : *সহীহ আল বুখারী*, অনুবাদ: অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী গং, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০১২

৮. ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী : *জামে' আত-তিরমিযী*, অনুবাদ: মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৪

৯. আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্নুল আশ'আস সাজিসতানী : *সুনান আবূ দাউদ*, অনুবাদ: ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫

১০. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী : *সহীহ মুসলিম*, অনুবাদ: মাওলানা আফলাতুন কায়সার, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯২

১১. ইমাম আবু আদুর রহমান আহমাদ আন-নাসাঈ : *সুনান আন-নাসাঈ*, অনুবাদ: আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫

১২. আবু অবদুল্লাহ ইব্ন মাজা : *সুনান ইবনে মাজা*, অনুবাদ: মুহাম্মদ মূসা, ঢাকা: আধু-নিক প্রকাশনী, ২০০০

১৩. ইমাম মালেক ইব্ন আনাস : *মুয়াত্তা*, (আরবী) কায়রো: আল-মাকতাবাতুর রশীদি-য়্যাহ, ১৯৫১

১৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা*, অনুবাদ: মুহাম্মদ হাবিবুর-রহমান, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৬

১৫. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০

১৬. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৮

১৭. অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান : *কুর'আন ও হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন*, ঢাকা: প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

১৮. আলীয়া আলী ইজেতবেগোভিচ : *প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম*,রুপান্তর: ইফতেখার ইকবাল, ঢাকা: আমান পাবলিশার্স, ১৯৯৬

১৯. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *তাওহীদ রিসালাত আখিরাত*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৮

২০. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল : *আল-মুসনাদ*, মিসর: আল-মাকতাবাহ আশ-শামিলাহ, তা.বি.

২১. ড. ইউসুফ আল-কারযাবী : *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৪

২২. ড. আহমদ শরীফ : *সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: উত্তরণ, তা.বি.

২৩. জুহুরী : *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, ঢাকা: উত্লু প্রকাশন, ১৯৮৫

২৪. আবদুস শহীদ নাসিম : *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭

২৫. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ : *সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে রাসূলুল্লাহ (স.)*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২০ হি.

২৬. ড. খন্দকার আবদুল্লাহ : *ইসলামী আকীদা*,বাংলাদেশ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭

২৭. এ.কে.এম. নাজির আহমদ : *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫

২৮. এ. জেড. এম. শামসুল ইসলাম : *মুসলিম সংস্কৃতি*, ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২

২৯ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *আল-কুর'আনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮

৩০. ইমাম আয্ যাহাবী : *কবীরা গুনাহ*, অনুবাদ: মাওলানা আকরাম ফারুক,ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫

৩১. মুহাম্মদ মতিউর রহমান : *ইসলামী সংস্কৃতি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৬ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী, ২০০৭

৩২. ড.সা'দ বিন 'আলী বিন ওয়াহাফ আল কাহতানী : *হিসনুল মুসলিম*, অনুবাদ: মোহাম্মদ এনামুল হক, রিয়াদ: ওয়াকফ, দাওয়াত, পথনির্দেশ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪২৪ হিঃ

৩৩. অধ্যাপক ড.এ.আর.এম. আলী হায়দার : *ইসলাম শিক্ষা*, ঢাকা: পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স, ২০০৭

৩৪. ডক্টর শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *ইসলাম শিক্ষা*, ঢাকা: সোনালী সোপান প্রকাশন, ২০১২

৩৫. অধ্যাপক এ.এফ. ছাদুল হক ফারুক : *পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম*, ঢাকা: আল-ফুরকান পাবলিকেশন, ২০০৫

৩৬. আবদুল মান্নান তালিব : *ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনরগঠন*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪

৩৭. খান মোসলেহ উদ্দিন আহমদ : *মহানবী (স.) এর সীরাত কোষ*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪

৩৮. ইমরান নযর হোসেন *পবিত্র কুর'আনে জেরুজালেম*, অনুবাদ: মোঃ এনামুল হক, ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন্স, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. অধ্যাপক মফিজুর রহমান : *কোরআনের আয়নায় বিম্বিত রাসূল (স.)*, চট্টগ্রাম: মদীনা একাডেমী, ২০০৪

৪০. মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী : *মৃত্যুর অন্তরালে*, অনুবাদ: মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬

৪১. ইমাম শায়বানী : *আস-সিয়ার আল-কাবীর*, বৈরূত: মাওকা'উ ইয়া'সূব, তা.বি.

৪২. ইমাম আবু বকর আস-সারাখসী : *শারহু আস-সিয়ারিল কাবীর*, কায়রো: মাওকা'উল ইসলাম, তা.বি.

৪৩. আল্লামা ইমাম নববী : *রিয়াদুস সালেহীন*, অনুবাদ: মাওলানা এ.এম.এম.সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা: ইসলামিয়া কুর'আন মহল, ২০০১

৪৪. ড.ইব্রাহীম মাদকূর : *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, দীওবন্দ: কুতুবখানাহ হুসাইনিয়াহ, ১৯৯৭

৪৫. লুইস মা'লূফ : *আল-মুনজিদ ফীল-লুগাহ*, বৈরূত: দারুল মাশরিক, ১৯৯৭

৪৬. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন : *আল কুর'আনের অভিধান*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৬

৪৭. আল্লামা জলীল আহসান নদভী : *রাহে আমল*, অনুবাদ: হাফেয আকরাম ফারুক, ঢাকা: মক্কা পাবলিকেশন্স, ২০০৩

৪৮. নঈম সিদ্দিকী : *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম*, অনুবাদ: আকরাম ফারুক, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৮

৪৯. E.B Taylor : *Primitive Culture*, London: 1871

৫০. Philip Bagby : *Culture and History*, American Trust Publication, 1993